প্রেম-ভক্তির রসঘনবিগ্রহ, সর্বযুগসমন্বয়ের দীপস্তম্ভ

অখণ্ড অমিয় শ্রী গৌরাঙ্গ



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রজ্ঞম্, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৬৩ (শ্রাবণ, ১৩৭০)

প্রকাশক
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য : আট টাকা



অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥



'তৃণ হইতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎ´সনে-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিতবৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইব॥
সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ॥'

ভূমিকা

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' আর কিছুই করবার নেই কলিকালে, শুধু নাম শোনবার জন্যে একটু কান পেতে থাকা। সেটুকু ঔৎসুক্যও যখন নেই তখন ভগবান নিজেই কাঙাল সেজে জীবের দ্বারে-দ্বারে নাম বিলোতে বেরিয়েছেন। আমরা তাঁকে চাই না, কিন্তু তাঁর ভীষণ দায়, তিনি আমাদের চান। নিজে শুনবেন বলে আমাদের নাম শোনাচ্ছেন, নাম শেখাচ্ছেন। যদি আভাসেও আমাদের নাম আসে। তাই গৌরাঙ্গজীবনী লিখব এমন স্পর্ধা নেই—শুধু আভাসে নাম করবার জন্যে কিঞ্চিৎ লিখন-পঠন। শুধু সন্তরণে সিন্ধুগমনের চেষ্টা। 'পড়িলাম শুনিলাম এতদিন ধরি। কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি॥'

অচিন্ত্যকুমার



৩৯

সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়াতেই রাত্রি যাপন করলেন গৌরহরি। মুকুন্দকে বললেন, কীর্তন লাগাও।

প্রভুও নৃত্য করতে সুরু করলেন। শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার—প্রেমের সমস্ত বিকার আবির্ভূত হল। দণ্ড-কমণ্ডলু কোন দিকে গেল খেয়াল করলেন না। নাচতে নাচতে গুরুকে, কেশব ভারতীকে, আলিঙ্গন করলেন। সুকৃতি ভারতীও হরি-হরি বলে নাচতে লাগল। তাঁরও দণ্ড-কমণ্ডলু কোথায় গেল কে জানে।

ভারতীকে বললেন, 'আমাকে এবার বিদায় দিন। যেখানে গেলে আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পাব আমি চললাম তার সন্ধানে।'

ভারতী বললেন, 'আমিও তোমার সঙ্গী হব।'

তখন চন্দ্রশেখরকে ধরে কাঁদতে লাগলেন গৌরহরি। বললেন, 'আপনি নবদ্বীপে ফিরে যান। সকলকে গিয়ে বলুন, আমি চলেছি বৃন্দাবন।'

যে বটগাছের তলায় বসে বিশ্রাম করলেন প্রভু, তার নাম হল বিশ্রামতলা।

প্রভু গোপীভাব ধরেছেন। আবিষ্ট হয়েছেন রাধাভাবে। কৃষ্ণকেই কান্ত বলে মেনেছেন। 'গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত।' সে কৃষ্ণ কী রকম? সে কৃষ্ণ শ্যামসুন্দর। সে কৃষ্ণের চূড়ায় শিখিপাখা, বুকে গুঞ্জামালা। সে কৃষ্ণ গোপবেশ, ত্রিভঙ্গিম, সে কৃষ্ণ মুরলীবদন। কৃষ্ণ যদি অন্য রূপ ধরে, এমন কি চতুর্ভুজ হয়েও দাঁড়ায়, গোপীভাব স্ফূর্তি পায় না, গোপীর রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয়।

বসন্তকালে গোবর্ধনে রাসলীলা করছে কৃষ্ণ। হঠাৎ রাধাকে সঙ্কেত করল, চলো দুজনে পালিয়ে যাই নিকুঞ্জে, নিভৃত হই। রাসস্থলী থেকে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হল, নিকুঞ্জে গিয়ে রাধার অপেক্ষা করতে লাগল। কোথায় কৃষ্ণ! গোপাঙ্গনারা চারদিকে খুঁজতে লাগল কৃষ্ণকে। দূর থেকে দেখল কৃষ্ণ নিকুঞ্জে গিয়ে বসেছে। কৃষ্ণও দেখল গোপীদের। কী হবে, ধরা পড়ে যাব। যদি, হায়, আমার এখন চার হাত হত! মনে ইচ্ছা করা মাত্র কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হয়ে উঠল। গোপীরা এসে দেখল, এ কে? এ তো নারায়ণ। এ তো আমাদের প্রাণকান্ত কৃষ্ণ নয়। তাদের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হল। নারায়ণকে নতিস্তুতি করে তারা কৃষ্ণের খোঁজে অন্য দিকে চলে গেল।

এমন সময় দেখা গেল রাধাকে। কৃষ্ণের ইচ্ছা হল চার হাতই মেলা থাক, রাধার সঙ্গে একটু কৌতুক হোক। কিন্তু সাধ্য কি, কৃষ্ণ সেই ঐশ্বর্যকে ধরে রাখতে পারে। রাধা যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই অতিরিক্ত দুই হাত সঙ্কুচিত হতে লাগল। শত চেষ্টা করে রাধার সামনে চতুর্ভুজ থাকতে পারল না। যে দ্বিভুজ সেই দ্বিভুজই হয়ে গেল। 'রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব। যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব॥'

রাধিকাতেই প্রেমের পূর্ণতম স্ফূর্তি। ঐশ্বর্যলেশশূন্য মাধুর্যতরঙ্গিণী। তাই তাকে চমৎকৃত বা অপ্রতিভ করার জন্যে ঐশ্বর্যের বিকাশ সম্ভব নয়। শুদ্ধ মাধুর্যের প্রতিমূর্তি রাধার কাছে ঐশ্বর্য বিড়ম্বিত। সুতরাং স্বরূপসিদ্ধ দ্বিভুজ রূপ ধরো। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।'

'গোপী, গোপী,' বলতে লাগলেন গৌরহরি।

সেই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আপত্তি করেছিল, গোপীনাম জপা অশাস্ত্রীয়, বরং কৃষ্ণনাম জপলে ফল পেতে পারো, আর এই তান্ত্রিক আচার্যকে লাঠি হাতে মারতে গিয়েছিলেন গৌরচন্দ্র।

গোপীরা কী রকম ? 'স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোনো দাগ।' মূর্তিমতী নির্মলতা। তাদের স্বসুখবাসনা নেই, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করে শুধু কৃষ্ণ সুখী হবে বলে। 'অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥' তাদের আত্ম-সুখ-দুঃখের বিচার নেই, তাদের সমস্ত কষ্ট, সমস্ত মননচিন্তন কৃষ্ণসুখের উদ্দেশে। 'আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা, মনোব্যবহার॥' কৃষ্ণের জন্যে তারা বেদধর্ম লোকধর্ম আর্যপথ সব ছেড়েছে, শুধু সেবায়-ভালোবাসায় কৃষ্ণকে সুখী করার জন্যে। কৃষ্ণের বাইরে আর তাদের তৃষ্ণা নেই।

গোপীদের কাছেই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হল। কী প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণের ? কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যে ভাবে কৃষ্ণকে ভজন করবে, কৃষ্ণ তাকে সেই ভাবে কৃতার্থ করবে। অর্থাৎ ভজনকারী যা প্রার্থনা করবে কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণ তাই তাকে দিয়ে দেবে। বাসনার অনুরূপ ফল দেবে কৃষ্ণ। কিন্তু, গোপীদের যে কণামাত্র বাসনা নেই। তাদের কৃষ্ণভজনের উত্তরে কৃষ্ণ তাদের আর কী ফল দিতে পারে ? কিছুই দিতে পারে না। তাই কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা মিথ্যে হয়ে যায়।

গোপীদের তাই বলছে কৃষ্ণ, দুর্জন গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে তোমরা আমার ভজনা করেছ। নির্মলভজনপরায়ণা, তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার আমি কী করে করি ? অনন্ত আয়ুষ্কালেও তা আমি পারব না শোধ করতে। সুতরাং তোমাদের স্বীয় সাধুকৃত্যই তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হোক।

সেই গোপীভাব, রাধাভাব শ্রীচৈতন্যের। 'অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি। ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি॥' আবার সেই শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসীই গৌর, যিনি কখনো দ্বিজ, কখনো সন্ন্যাসী।

এখন পশ্চিম দিকে চলেছেন মহাপ্রভু। আগে আগে কেশব ভারতী, পিছনে গোবিন্দ, দুই পাশে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আর গদাধর। 'ভিক্ষুগীতা' আবৃত্তি করতে-করতে চলেছেন।

মালবদেশে ধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ ছিল। বাণিজ্য করে বিপুল ধন সঞ্চয় করেছিল, কিন্তু কৃপণ ছিল বলে অর্থ তার সুখের কারণ হত না। আপন পরিজনকে তো বটেই, নিজেকেও পর্যন্ত অর্থ সঞ্চয়ের লালসায় ভোগবঞ্চিত করে রাখত। তার পুত্র দুঃশীল, স্ত্রী-কন্যা বিষণ্ণ। কর্তব্যকর্মের অনাদরে সে পুণ্যভ্রষ্ট। দেবতারা তার প্রতি রুষ্ট হলেন। ফলে তার সমস্ত অর্থ ক্ষয় হয়ে গেল। তখন সন্তপ্ত ব্রাহ্মণ অনুতাপ করতে বসল। সেই অনুশোচনাই ভাগবতে 'ভিক্ষুগীতা' নামে আখ্যাত।

আমি বৃথাই আত্মাকে ক্লিষ্ট করেছি। আমার আত্মা না-ধর্মের নিমিত্ত না-কর্মের নিমিত্ত হল। বৃথা অর্থের নিমিত্তই এত কষ্ট স্বীকার করলাম। কুষ্ঠ যেমন বাঞ্ছিত রূপ নষ্ট করে, লোভ তেমনি সর্ব-যশোগুণনাশী হয়ে ওঠে। অর্থের উপার্জনে-উৎকর্ষে সঞ্চয়ে-রক্ষণে ব্যয়ে-নাশে মানুষের আয়াস ও ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম জন্মায়। আর এই অর্থ থেকেই চৌর্য হিংসা মিথ্যা শঠতা কাম ক্রোধ গর্ব মোহ ভেদ বৈর অবিশ্বাস ও স্পর্ধা—যাবতীয় অনর্থের আবির্ভাব। সুতরাং যে মঙ্গলকে চায় সে অর্থ নামক অনর্থকে পরিত্যাগ করে।

কি জন, কি দেবতা, কি আত্মা, কি গ্রহ, কি কর্ম, কি কাল, কিছুই আমার দুঃখের কারণ নয়, মনই একমাত্র দুঃখের কারণ। মন দ্বারাই সংসারচক্র পরিবর্তিত হচ্ছে। মনের দমনই পরম যোগ। মনঃসংযমই চিরসুখ ও চিরশান্তির মূল। যে মনকে বশে আনতে পারে সেই দেবদেব। মনঃপ্রসূত কর্ম আর সেই কর্মের ফলই আমরা ভোগ করছি।

নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কামড়ালে কার প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ হবে? কাকে তুমি দোষী করবে? তেমনি তুমি তোমার নিজের মনোযন্ত্রণায় জর্জর হচ্ছ। সুতরাং কাকে তুমি দায়ী করবে? তোমার সুখ-দুঃখ-প্রদাতা আর কেউ নয়, তুমি নিজে।

ব্রাহ্মণের নির্বেদ উপস্থিত হল। স্থির করল, প্রাচীনতম মহর্ষি-

গণের সেবিত পরমাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করে মুকুন্দের চরণ সেবা দ্বারাই দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হব!

দ্বিজসত্তম হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করল, মনঃসংযম করে ভিক্ষুব্রত নিয়ে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগল। নষ্টধন গতশ্রম বৈরাগ্যাশ্রিত মুনি আর বিচলিত হল না।

কৃষ্ণ তাই বললে উদ্ধবকে, তুমি সর্বপ্রযত্নে একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার প্রতি বুদ্ধি সংন্যস্ত করে মনঃসংযম করো। আর যে এই ভিক্ষুগীতা শুনবে বা শোনাবে বা অনুধাবন করবে, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে সে আর অভিভূত হবে না।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি অনিদ্রা কিছুই মানছেন না গৌরাঙ্গ, বৃন্দাবনের ভাবে বিভোর হয়ে পথ চলেছেন। কোথায় পথ, কত দূরে বৃন্দাবন তা কে জানে। যে দিকেই যান না কেন নিত্যানন্দ সঙ্গ ছাড়ছে না। গোবিন্দ মুকুন্দ গদাধরও চলেছে পিছে পিছে।

গ্রামের লোকও এসে দলে জুটছে। প্রভু তাদের ঘরে ফিরে যেতে বলছেন। বলছেন, ঘরে গিয়ে সকলে হরিনাম করো। কৃষ্ণচন্দ্র সকলের ধন-প্রাণ হোক। যে রস শিব-শুকেরা আকাঙ্ক্ষা করে তোমাদের শরীরে সে রসের উদ্ভব হোক।

রাঢ়ে প্রবেশ করলেন গৌরহরি। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিন দিন রাঢ়েই ঘুরে বেড়ালেন,বৃন্দাবনের দিকে এক পা-ও এগোতে পারলেন না। দুক্রোশ যদি সামনে হাঁটেন, দুক্রোশ আবার পিছু হটেন। বললেন, বক্রেশ্বর যাব। অথচ পৌঁছুতে পারলেন না বক্রেশ্বর। তিন দিন তিন রাত হাঁটছেন অবিশ্রাম অথচ এগোতে পারছেন না, নবদ্বীপের কাছাকাছিই আছেন। নবদ্বীপের লোকেরাই বুঝি তাঁকে টানছে, যেতে দিচ্ছে না।

প্রীতিতে আবদ্ধ করে রাখছে ভগবানকে।

দিক-বিদিকের জ্ঞান নেই, দিবা-রাত্রির জ্ঞান নেই, জ্ঞান নেই পথ-বিপথের। শুধু একমাত্র জ্ঞান হরিনাম। পশ্চিম মুখে গিয়ে

আবার পূর্বমুখ হচ্ছেন, পূর্বমুখ থেকে আবার পশ্চিমমুখ, কিন্তু, কই, কারু মুখে তো কৃষ্ণ নাম শুনছি না। রাঢ়ে কোথায় ভক্তি, কোথায় কীর্তন, কোথায় প্রেমাবেশ !

'প্রভু বোলে, হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ প্রয়াণ।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥'

মাঠে কতগুলি রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছিল, তারা হঠাৎ হরি-হরি বলে উঠল।

আচম্বিতে শিশুকণ্ঠে হরিনাম শুনে উৎফুল্ল হলেন গৌরহরি। ভাবলেন, তবে এরাই বুঝি সেই ব্রজের রাখাল। বৃন্দাবন তবে আর দূরে নয়।

গৌরহরি বালকগুলির মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'হরিনাম শুনিয়ে আমার বড় উপকার করলে। তোমরা খুব ভালো, দয়া করে আমার আরেকটা উপকার করবে ?'

'বলুন, কী উপকার ?'

'বৃন্দাবনের পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে ?'

অদূরে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ বালকদের ইসারা করল যেন গঙ্গার দিকের পথ দেখিয়ে দেয়।

সরলস্বভাব বালকেরা তাই করলে। শান্তিপুরের পথ দেখিয়ে দিল।

নামের আবেশে প্রভু চললেন শান্তিপুরের দিকে।

ওরে আমার ব্রজের রাখাল বন্ধুরা, তোরা কোথায় পেলি এ হরিনাম ? এ নাম তোদের কে শেখাল ? আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছিলাম, ছুটে এলাম তোদের নাম শুনে। আমি মরে ছিলাম, নাম শুনে প্রাণ পেলাম। আমার কান উপবাসী ছিল, রসায়নে জীবন পেল এতক্ষণে।

চন্দ্রশেখর এখনো সঙ্গ ছাড়েন নি বুঝি। নিত্যানন্দ তাকে বললে, 'তুমি শিগগির শান্তিপুরে চলে যাও, অদ্বৈত আচার্যকে খবর দাও। অদ্বৈত যেন এ পারে নৌকো নিয়ে প্রস্তুত থাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে যাচ্ছিল, তাকে আবার ডাকল নিত্যানন্দ। বললে, 'শোনো, তারপর তুমি নবদ্বীপে যাবে। খবর দেবে শচীমাতাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে গেলে নিত্যানন্দ পিছন থেকে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বললে, 'প্রভু, আমি নিত্যানন্দ।'

প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতি নেই, গৌরহরি বুঝতেও পারেন নি নিত্যানন্দ তাঁর পিছনে-পিছনে আসছে।

চমক ভাঙল গৌরহরির। বললেন, 'শ্রীপাদ, তুমি কোত্থেকে আসছ?'

নিত্যানন্দ বললে, 'আমিও যে তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন চলেছি।'

'কোথায়, কোথায় আমার বৃন্দাবন? আর কতদূর?'

বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি দিয়ে তৈরি। চিন্তামণি কী? চিন্তামণি একরকম বহুমূল্য পাথর, তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই মেলে। 'ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী।' আর বৃন্দাবনের সমস্ত গাছই কল্পতরু। যদি চর্মচক্ষে দেখ, তোমার কাছে তা প্রাকৃত রূপেই প্রতিভাত হবে। তাকে সাধারণ মাটি সাধারণ গাছ বলেই চিনবে। কিন্তু যদি প্রেমনেত্রে তাকাও দেখবে এখানেই কৃষ্ণ গোপ-গোপীর সঙ্গে বিলাস করছেন, গো-পালন করছেন। বিরাজ করছেন গোবিন্দ রূপে।

বলো, আর কতদূর বৃন্দাবন? আমাকে কি দর্শন দেবেন কৃষ্ণ? আমি বৃন্দাবনে গিয়ে মাধুকরী করে খাব। জয় রাধে বলে রাধাকুণ্ডের ধুলোয় গড়াগড়ি দেব। আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

'এই তো এসে গেলাম বৃন্দাবন।'

'শ্রীপাদ, এই নদী কী?'

'এই নদীই তো যমুনা।'

আবার পূর্বমুখ হচ্ছেন, পূর্বমুখ থেকে আবার পশ্চিমমুখ, কিন্তু, কই, কারু মুখে তো কৃষ্ণ নাম শুনছি না। রাঢ়ে কোথায় ভক্তি, কোথায় কীর্তন, কোথায় প্রেমাবেশ!

'প্রভু বোলে, হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ প্রয়াণ।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥'

মাঠে কতগুলি রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছিল, তারা হঠাৎ হরি-হরি বলে উঠল।

আচম্বিতে শিশুকণ্ঠে হরিনাম শুনে উৎফুল্ল হলেন গৌরহরি। ভাবলেন, তবে এরাই বুঝি সেই ব্রজের রাখাল। বৃন্দাবন তবে আর দূরে নয়।

গৌরহরি বালকগুলির মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'হরিনাম শুনিয়ে আমার বড় উপকার করলে। তোমরা খুব ভালো, দয়া করে আমার আরেকটা উপকার করবে?'

'বলুন, কী উপকার?'

'বৃন্দাবনের পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে?'

অদূরে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ বালকদের ইসারা করল যেন গঙ্গার দিকের পথ দেখিয়ে দেয়।

সরলস্বভাব বালকেরা তাই করলে। শান্তিপুরের পথ দেখিয়ে দিল।

নামের আবেশে প্রভু চললেন শান্তিপুরের দিকে।

ওরে আমার ব্রজের রাখাল বন্ধুরা, তোরা কোথায় পেলি এ হরিনাম? এ নাম তোদের কে শেখাল? আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছিলাম, ছুটে এলাম তোদের নাম শুনে। আমি মরে ছিলাম, নাম শুনে প্রাণ পেলাম। আমার কান উপবাসী ছিল, রসায়নে জীবন পেল এতক্ষণে।

চন্দ্রশেখর এখনো সঙ্গ ছাড়েন নি বুঝি। নিত্যানন্দ তাকে বললে, 'তুমি শিগগির শান্তিপুরে চলে যাও, অদ্বৈত আচার্যকে খবর দাও। অদ্বৈত যেন এ পারে নৌকো নিয়ে প্রস্তুত থাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে যাচ্ছিল, তাকে আবার ডাকল নিত্যানন্দ। বললে, 'শোনো, তারপর তুমি নবদ্বীপে যাবে। খবর দেবে শচীমাতাকে।'

চন্দ্রশেখর চলে গেলে নিত্যানন্দ পিছন থেকে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বললে, 'প্রভু, আমি নিত্যানন্দ।'

প্রেমাবেশে বাহ্যস্মৃতি নেই, গৌরহরি বুঝতেও পারেন নি নিত্যানন্দ তাঁর পিছনে-পিছনে আসছে।

চমক ভাঙল গৌরহরির। বললেন, 'শ্রীপাদ, তুমি কোত্থেকে আসছ?'

নিত্যানন্দ বললে, 'আমিও যে তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন চলেছি।'

'কোথায়, কোথায় আমার বৃন্দাবন? আর কতদূর?'

বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি দিয়ে তৈরি। চিন্তামণি কী? চিন্তামণি একরকম বহুমূল্য পাথর, তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই মেলে। 'ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী।' আর বৃন্দাবনের সমস্ত গাছই কল্পতরু। যদি চর্মচক্ষে দেখ, তোমার কাছে তা প্রাকৃত রূপেই প্রতিভাত হবে। তাকে সাধারণ মাটি সাধারণ গাছ বলেই চিনবে। কিন্তু যদি প্রেমনেত্রে তাকাও দেখবে এখানেই কৃষ্ণ গোপ-গোপীর সঙ্গে বিলাস করছেন, গো-পালন করছেন। বিরাজ করছেন গোবিন্দ রূপে।

বলো, আর কতদূর বৃন্দাবন? আমাকে কি দর্শন দেবেন কৃষ্ণ? আমি বৃন্দাবনে গিয়ে মাধুকরী করে খাব। জয় রাধে বলে রাধাকুণ্ডের ধুলোয় গড়াগড়ি দেব। আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

'এই তো এসে গেলাম বৃন্দাবন।'

'শ্রীপাদ, এই নদী কী?'

'এই নদীই তো যমুনা।'

গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞান হল গৌরহরির। যমুনার স্তব করতে লাগলেন।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম তোমার অঙ্গকান্তি, তুমি নন্দ-নন্দন কৃষ্ণের পর-প্রেমপাত্রী, তুমি দ্রবব্রহ্মগাত্রী, সর্বপাপবিনাশিনী, জগৎকল্যাণ-কারিণী, তুমি সূর্যকন্যা, তুমি আমাদের দেহ পবিত্র করো। তোমাকে নমস্কার করি।

'অহো ভাগ্য, যমুনার দর্শন পেলাম।' বলে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন মহাপ্রভু।

একখানি কৌপীন মাত্র পরিধানে, প্রভু স্নানান্তে তীরে উঠে সিক্ত গাত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরিধানের দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। তবে এখন উপায় কী!

নৌকোয় করে অদ্বৈত ততক্ষণ পৌঁছে গেছে এপারে। সে নতুন কৌপীন ও বহির্বাস নিয়ে এসেছে।

অদ্বৈতকে দেখে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফুটে উঠতে চাইল। 'এ কী, অদ্বৈত আচার্যকে দেখছি না?' প্রভু এগোলেন দু'-পা। 'হ্যাঁ, অদ্বৈতই তো। তুমি বৃন্দাবনে কী করে এলে? আমি বৃন্দাবনে আছি এ তুমি কী করে জানলে?'

অদ্বৈত বললে, 'যেখানে তুমি সেখানেই বৃন্দাবন।'

যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই তাঁর নিজ-ধাম।

'এ আমি তবে কোথায় এলাম?' প্রভু তাকাতে লাগলেন চার দিক।

'আমার পরম ভাগ্য।' বললে অদ্বৈত, 'তুমি গঙ্গাতীরে এসেছ।'

এই সেই সকলকলুষভঙ্গা জাহ্নবী। শঙ্করমৌলিবিহারিণী নরক-নিবারিণী অলকানন্দা।

'এ কী, নিত্যানন্দ আমাকে ঠকিয়ে গঙ্গাতীরে নিয়ে এসেছে।' প্রভুর বাহ্য সম্বিৎ ফিরে এল।

'প্রভু কহে—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গায় আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥'

আচার্য বললে, 'নিত্যানন্দের কথা মিথ্যা নয়। তুমি এখন যমুনাতেই স্নান করলে।'

প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে যমুনার মিলন হয়েছে, পশ্চিমে যমুনা, পুবে গঙ্গা। যমুনাধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে গঙ্গাধারা। আর তুমিও গঙ্গার পশ্চিমেই স্নান করলে। সুতরাং এই গঙ্গাস্নানই তোমার যমুনাস্নান।

নিত্যানন্দের প্রতি অভিমান প্রকাশ করলেন গৌরহরি। 'তুমি আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এলে। তুমি জাহ্নবীকে দেখিয়ে বললে ঐ যমুনা। মধুবনচারিণী কলিন্দনন্দিনী। তুমি ভাই হয়ে এ কী করলে? আমাকে ব্রজে যেতে দিলে না। আমার খেলার সাথিরা সব সেখানে চলে গিয়েছে, শুধু আমারই যাওয়া হল না। আমি কার জন্যে তবে সন্ন্যাসী হলাম। যার জন্যে সন্ন্যাসী হলাম তাকে আর তবে পেলাম কই?'

অদ্বৈত বললে, 'নিতাই তোমাকে ভোলায় তার সাধ্য কী! তুমি কত বড় ভক্তবৎসল তাই সে প্রমাণ করল।'

'সে প্রমাণ করল আমি তার হাতের পুতুল। সে নাচালেই আমি নাচি।'

'যারা তোমার নিজ জন তাদের তুমি করুণা করবে না?' প্রকাশ্যে এগিয়ে এল নিতাই। 'জীবে করুণা করতে উদয় হলে অথচ তোমার নিজ জন তা পাবে না আস্বাদ করতে?'

'প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও।' মিনতিভরা স্বরে বললে অদ্বৈত, 'শুষ্ক বাস পরিধান করো। আমার নৌকোয় ওঠো। তিন দিন তুমি উপবাসে আছ। আমার ঘরে গিয়ে ভিক্ষে নাও। প্রাণটুকু রাখো শরীরে।'

গৌরহরি তখন শুষ্ক বাস পরিধান করে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো এসে লাগল।

নিতাই বললে, 'তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো। ভগবানের আকর্ষণে এত লোক এসে জুটবে ভিড় সামলাতে পারবে না।' ঘরে এসে পৌঁছুলে আবার বললে, 'দরজায় দ্বারী বসাও, নইলে ভক্তের চাপে তোমার বাড়ি-ঘর চূর্ণ হয়ে যাবে।'

অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা দেবী ভোগ সাজালেন। ভোগ তিন জনের জন্যে, তিন পাত্রে। কৃষ্ণের জন্যে ধাতু-পাত্রে আর নিমাই ও নিতাইয়ের জন্যে দুই কলা-পাতায়।

অনেক রকম ব্যঞ্জন রেঁধেছেন সীতা দেবী। পিঠে পায়েস দধি ক্ষীর—কী নয়! অন্ন-ব্যঞ্জনের উপর তুলসী-মঞ্জরী রাখল। সুবাসিত জল ভরল তিন পাত্রে। তিন শুভ্রপীঠ স্থাপন করল। প্রথমে কৃষ্ণকে ভোগ দিল। আরতি করল। আরতির সময় দাঁড়াল এসে নিমাই-নিতাই। নির্নিমেষে দেখল আরতি। আরতি-অন্তে শয়ন দিল কৃষ্ণকে।

প্রভু বললেন, 'মুকুন্দ কই? হরিদাস কই? ওদের ডাকো।'

মুকুন্দ কাছে এল। বললে, 'আমার নিত্যকৃত্য এখনো কিছু করা হয়নি। আমি পরে প্রসাদ নেব।'

হরিদাসও সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আমি অধম পাপিষ্ঠ, আমি বাইরে বসে এক মুঠ খেয়ে নেব।'

নিমাই-নিতাই অন্তঃপুরে গেল। কৃষ্ণভোগের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখে আনন্দিত গৌরহরি, নিজে খাবেন বলে নয়। বললেন, 'এমন করে যে কৃষ্ণকে খাওয়ায় আমি তার পদবন্দনা করি।' 'ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন। জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ॥' অদ্বৈতকে বললেন, 'তুমিও বসে পড়ো, তিন জনে খাই।'

অদ্বৈত বললে, 'না, আমি পরিবেশন করব।'

হাতে ধরে নিমাই-নিতাইকে দুই শুভ্র পীঠে—শাদা কাপড় দিয়ে মোড়া কাঠের পিঁড়িতে বসিয়ে দিল।

প্রভু বললেন, 'অল্প-অল্প দাও। এত সব উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ন্যেসীর ভক্ষ্য নয়। এত সব সুস্বাদু দ্রব্য খেলে ইন্দ্রিয়দমন হবে কী করে?'

'প্রভু কহে—সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ॥'

আচার্য বললে, 'তোমার চাতুরী রাখো। তোমার আসল কথা আমি সব টের পেয়েছি।' 'আচার্য কহেন—ছাড় তুমি আপনার চুরি। আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥'

ভগবানের আবার সন্ন্যাসের প্রয়োজন কী? যিনি মায়াধীশ তাঁর কি আবার সংসারবন্ধন আছে? তাঁর আবার কিসের ইন্দ্রিয়-সংযম? নিন্দুক ও তার্কিকদের উদ্ধারের জন্যেই তিনি সন্ন্যাসবেশ ধরেছেন। হয়তো বা আত্মগোপনের চেষ্টায়। নইলে যিনি নিজে সাধন-ভজনের লক্ষ্য তিনিই কিনা সাধারণ সাধক সন্ন্যাসী সেজেছেন! এ লীলার তাৎপর্য বুঝতে অদ্বৈতের আর বাকি নেই!

অদ্বৈত বললে, 'ও সব বচনচাতুরী ছাড়ো। সামান্য জিনিস, খেলে কিছু দোষ হবে না।'

'এত খাব কী করে?' তবু আপত্তি করলেন প্রভু।

'যা পারবে না পাতে থাকবে!'

'উচ্ছিষ্ট রাখা সন্ন্যেসীর ধর্ম নয়।'

'রাখো। নীলাচলে যে চুয়ান্ন বার ভোগ খাও। সেখানে তোমার এক গ্রাস এখানকার তিনজনের আহার্য। রাখো, চাতুরী ছাড়ো, হাত লাগাও।' অদ্বৈত দুই অতিথির হাতে জল ঢেলে দিল।

নিত্যানন্দ অন্য সুর ধরল। বললে, 'তিন দিন উপবাসের পর ভেবেছিলাম পেট পুরে খেতে পাব। এখন যা আয়োজন দেখছি তাতে মনে হচ্ছে পেটের আদ্ধেকও ভরবে না।'

অদ্বৈত বললে, 'তুমি তো তীর্থবাসী সন্ন্যাসী, সকল সময়ে আহারও জোটে না। তোমার আবার পেট ভরবে কী! তুমি তো

ফলমূল খেয়ে থাকো। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে যা এক মুঠো ভাত পেয়েছ তাই খাও তৃপ্তি করে। লোভ করা ভালো নয়।'

'বা, বেশ বলেছ।' পরিহাস করল নিমাই। 'নিমন্ত্রণ করে এনে বলছ, এক মুঠো খাও। মোটেই তা চলবে না। যত চাই তত দিতে হবে। পেট ভরাতে হবে।'

'তুমি তো এক ভ্রষ্ট অবধূত।' ক্রুদ্ধ হল অদ্বৈত, 'তুমি বুঝি সন্ন্যাস করেছ গৃহস্থকে দণ্ড দিতে। তুমি যেমন ঔদরিক, তুমি একাই দশ-বিশ মণ ভাত সাবাড় করতে পারো, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমি অত পাব কোথায়? যা পেয়েছ তাই খেয়ে তৃপ্ত হও। আর দয়া করো, উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ো না।'

নানা যত্নে-দৈন্যে খাওয়াতে লাগল অদ্বৈত। বললে, 'যা দিয়েছি কিছু ফেলতে পারবে না।'

আচার্যের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন প্রভু। কিন্তু নিতাই বললে, 'আমার পেট ভরল না। যা সামান্য দিয়েছ তা নিয়ে যাও ফিরিয়ে।' বলে এক গ্রাস ভাত নিয়ে অদ্বৈতের গায়ে ছুঁড়ে মারল।

আশ্চর্য, অদ্বৈত আচার্য নাচতে লাগল। বললে, 'অবধূতের উচ্ছিষ্ট আমার গায়ে লাগল, আমি পবিত্র হলাম।'

নিত্যানন্দ বললে, 'তুমি একে উচ্ছিষ্ট বলো কোন্ হিসেবে? এ তো কৃষ্ণের প্রসাদ। কৃষ্ণের প্রসাদকে উচ্ছিষ্ট বলে তুমি অপরাধী হলে। আমার মত এক-শো সন্ন্যাসীকে পেট পুরে খাওয়ালেই তবে এ অপরাধের খণ্ডন হবে।'

'আবার সন্নেসীকে খাওয়াব? রক্ষে করো। সন্নেসীর সঙ্গ করে আমার ধর্ম-কর্ম সব গেল। আর নয়।'

হাসতে লাগল নিতাই। হাসতে লাগল নিমাই।

তারপর দু'জনে আচমন করল। তুলসীমঞ্জরীসহ লবঙ্গ এলাচি কবাবচিনি মুখশুদ্ধি দিল অদ্বৈত। এবার তবে শয়ন করো।

প্রভুকে শয্যায় আনা হল। অদ্বৈত প্রভুর গায়ে চন্দন মেখে

দিল। বুকের উপর দুলিয়ে দিল ফুলমালা। তারপর পদতলে বসে চাইল পা টিপে দিতে।

সঙ্কুচিত হলেন প্রভু। বললেন, 'মা, এবার ছাড়ো। অনেক নাচিয়েছ আমাকে, আর নাচে কাজ নেই। এখন মুকুন্দ হরিদাসকে নিয়ে খেতে বোস।'

কতক্ষণ পরেই দলে-দলে লোক আসতে লাগল। এ কী দেখছি চোখ মেলে! এখন চমৎকার সৌন্দর্য তো আর দেখিনি।

'গৌর দেহকান্তি—সূর্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্রকান্তি তাতে করে ঝলমল॥'

লোক-সমাগমে অদ্বৈতপুরী তীর্থেরও অধিক হয়ে উঠল। সন্ধ্যায় কীর্তন ধরল আচার্য।

'কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।
আর হাম প্রিয় দূরদেশে না পাঠাও।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাও॥'

আঁচল ভরে যখন টাকা পেয়েছি তখন কী কারণে কিসের উপার্জনে প্রিয়কে পাঠাব দূর দেশে! আমার প্রিয়তমের চেয়ে কি টাকা প্রিয়তর?



৪৫

গান গাইছে আর নাচছে অদ্বৈত। ভাবাবেশে প্রভু বাহ্যস্মৃতিহীন। সেই সাহসে অদ্বৈত বারে বারে তাঁর পা স্পর্শ করছে। আর বলছে, 'এত দিন এই দীর্ঘ চব্বিশ বছর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপন

করে ছিলে, এবার তোমাকে আমার ঘরের মধ্যে পেয়েছি, এবার বেঁধে রাখব আষ্টেপিষ্টে।'

যত গান শুনছেন তত কৃষ্ণসঙ্গের জন্যে ব্যাকুল হচ্ছেন প্রভু, ততই বাড়ছে বিরহকষ্ট। শেষ পর্যন্ত পড়লেন ভূতলে। তখন অদ্বৈত তার নাচ বন্ধ করল। কিন্তু মুকুন্দ জানে প্রভুর অন্তরের ভাব কী। সেই অনুসারে সে গান ধরল :

'হাহা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাহাঁ উড়ি যাঙ॥'

কিন্তু ফল কী হল? প্রভুর চিত্ত বিদীর্ণ হল। দেখা দিল বহু বিচিত্র ভাব। নির্বেদ আর বিষাদ, অমর্ষ আর চাপল্য, গর্ব আর দীনতা। ভাবের প্রহারে জর্জর প্রভু আবার লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। শরীরে শ্বাস নেই।

নির্বেদ কী? দুঃখে, বিরহে ও ঈর্ষায় নিজের প্রতি যে অবমাননা-জ্ঞান, তাই নির্বেদ। বিষাদ কী? ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি বা অপরাধ থেকে যে অনুতাপ, তাই বিষাদ। অমর্ষ কী? তিরস্কার বা অপমানের ফলে যে অসহিষ্ণুতা, তার নাম অমর্ষ। আর চাপল্য? রাগদ্বেষের ফলে চিত্তের লঘুতা বা গাম্ভীর্য-হীনতার নাম চাপল্য। গর্ব কী? সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ বা ইষ্টলাভহেতু অন্যের প্রতি যে অবজ্ঞা, তাই গর্ব। আর দৈন্য কাকে বলে? দুঃখে ও ত্রাসে বা অপরাধীবোধে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করাই দৈন্য।

প্রভুর এ অবস্থা দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আচম্বিতে প্রভু হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন : বলো, বলো, আরো বলো। যেখানে গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, সেখানে উড়ে যাব পাখা মেলে। কোথায় কৃষ্ণ!

'শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥'

দরিদ্র যেমন ধনের অভাবে তার পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, আমারও তেমনি প্রেমের অভাবে আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয় রইল নিষ্ফল অনশনে। যদি তাদের দিয়ে কৃষ্ণসেবাই করতে না পারি তাহলে তারা তো নিরর্থক। আর প্রেম বিনা শুধু দেহে শুধু ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা হয় কী করে?

আবার প্রবল ভাবতরঙ্গ উপস্থিত হল। কখনো হর্ষে কখনো বিষাদে উদ্দণ্ড নাচতে লাগলেন প্রভু। তিন দিন উপোসের পর আজ প্রথম আহার করেছেন, তারপর এই দীর্ঘ নৃত্য, প্রভু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু প্রেমাবেশে ক্লান্তির অনুভব কোথায়? নিত্যানন্দ ধরে রইল নিমাইকে আর অদ্বৈত তাকে শয্যায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

কতক্ষণ পরে নিতাই জিগগেস করল নিমাইকে: 'একবার নবদ্বীপ যাব?'

'কেন?' চোখ তুলে তাকালেন গৌরহরি।

'মা এখনো বেঁচে আছেন কিনা একবার খোঁজ নিয়ে আসি।' নিতাই বললে, 'আমরা তো আজ মুখে অন্নজল দিলাম, কিন্তু মা বোধ হয় এখনো কিছু খাননি। তোমার শ্রীবাস মুরারিও হয়তো উপবাসে আছে।'

'যাও, দেখে এস।'

'যদি তারা কেউ আসতে চায়, নিয়ে আসব সঙ্গে করে?'

'যে-যে আসতে চায় নিয়ে এস।'

'হ্যাঁ, জানি, শুধু মা আসবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আসবে না। সে চাইবেই না আসতে।'

সে শুধু আমার পাদুকা নিয়ে জীবনযাপন করবে। তার সর্বাঙ্গ

সে প্রভুকে অর্পণ করেছে, এই অঙ্গ প্রভুর বস্তু, সুতরাং একে পালন-পোষণ করতে হবে। বিষ্ণুপ্রিয়াই তো আমার অনপায়িনী শ্রী, মনুষ্যনাট্যে ভক্তিস্বরূপা। ও কেন বিচলিত হবে? ওর তো নিজের সুখের জন্যে আকিঞ্চন নেই। ও বিশুদ্ধ প্রেমোল্লাস। গৌরশূন্য গৌরগৃহের মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে ও মূর্তিমতী নীরবতা।

পরদিন সকালে দোলায় চড়ে এলেন শচীমাতা। সঙ্গে চন্দ্রশেখর আচার্য।

না, বিষ্ণুপ্রিয়া আসেনি। সে আসবে কেন? সে যে সর্বত্যাগিনী পরাভক্তি। তার দুঃখেই সে যে আমার শিক্ষাকে মহনীয় করতে এসেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া। স্থানে-কালে ব্যবধান নেই। সর্বাঙ্গ অবিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশক্তি। সেই সর্বশক্তি-গরীয়সীর প্রাণবল্লভ বলেই গৌরহরি পূর্ণশক্তিমান।

আঙিনায় দোলা থেকে নামলেন শচীমাতা। আর তক্ষুনি প্রভু ছুটে এসে মার চরণে দণ্ডবৎ হলেন।

এ কি, সন্ন্যেসী হয়ে মাকে প্রণাম করল? সন্ন্যেসীর তো সন্ন্যেসী ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করা বারণ। তবে নিমাই ও করল কী?

মার সামনে কোনো নিয়মকানুন নেই। পুত্র সন্ন্যেসী হলেও মা—মা।

শচীদেবী নিমাইকে কোলে তুলে নিলেন। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। মাথার চুল নেই দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বাৎসল্যভরে নিমাইয়ের গা মুছে দিলেন, মুখে চুমু খেলেন, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কিছুই আর দেখতে পেলেন না, দু'চোখ যে অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

'শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া॥

'দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়—অশ্রু ভরিল নয়ন॥'

শচী দেবী বললেন, 'নিমাই, বাবা, বিশ্বরূপের মত নিষ্ঠুর হয়ো না। সন্নেসী হয়ে আর সে আমায় দর্শন দিল না। তুমিও যদি তেমনি করো, আমাকে আর দেখা না দাও, তা হলে আমি বাঁচব না কিছুতেই।'

'মা গো, শোনো,' গৌরহরি বললেন, 'এই শরীর দেখছ, এ তো তোমারই। তোমার থেকেই এর জন্ম, তোমার হাতেই এর লালন-পালন। কোটি জন্মেও ঋণ শোধ করতে পারব না। সন্ন্যাস নিলে কী হবে, তোমার প্রতি উদাসীন থাকব না। যেখানে থাকতে বলো সেখানেই বসবাস করব, তোমার কথার অন্যথা করব না।'

'জানি বা না কৈল যত্তপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ, সেই তো করিব॥'

দলে দলে লোক এসেছে নবদ্বীপ থেকে, তাদের প্রাণধন নিমাইকে দেখতে। এসেছে শ্রীবাস, এসেছে রামাই, এসেছে বিত্তানিধি। কে নয়? এসেছে গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, শুক্লাম্বর, মুরারি। নন্দন আচার্য, বুদ্ধিমন্ত খান, দামোদর, বাসুদেব। শ্রীধর, বিজয়, সঞ্জয়, মুকুন্দ। কত আর নাম করব? সে এক বিপুল সমাবেশ।

আহা, নিমাইয়ের মাথায় চুল নেই, কিন্তু দেখ দেখ কী অপার সুন্দর! এত রূপ কি মানুষের হয়, না, আর কারো? 'কেশ না দেখিয়া ভক্ত যত্তপি পায় দুখ। সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥' সত্যি, এ কী আনন্দসাগর! এ সাগরের তল নেই, পার নেই, অন্ত নেই কোনোখানে।

কিন্তু এ কী বলল শচীমাতাকে? বলল, মা যেখানে থাকতে বলবেন সেখানেই সে বাস করবে। তা হলে শচীমাতা তাকে নবদ্বীপেই থাকতে বলুন না কেন? নিমাই সর্বক্ষণ থাকবে আমাদের চোখের উপর।

কিন্তু শচীমাতা কি তাই বলবেন? যদি নবদ্বীপে থাকলে সন্ন্যাসী নিমাইয়ের নিন্দে হয়? মা হয়ে ছেলের নিন্দে সইব কী করে?

শুনি না নিমাই কী বলে?

ভক্তদের একত্র করে প্রভু বললেন, 'তোমাদের না জানিয়েই যাচ্ছিলাম বৃন্দাবন, কিন্তু যাওয়া হল না, বিঘ্ন আমাকে ফিরিয়ে আনল। আমি সন্ন্যাস নিলে হবে কী, তোমাদের আমি ছাড়ব না, ছাড়ব না মাকে। কিন্তু বলো, যাই কোথা, থাকি কোথা? নিজ জন্মস্থানে আত্মীয়দের নিয়ে থাকা তো সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়।'

'তোমা সভা না ছাড়িব—যাবৎ আমি জীবো।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥'

ভক্তদের মুখ শুকিয়ে গেল। এখন শচীমাতা কী বলবেন?

শচীমাতা বললেন, 'ও যদি এখানে থাকে তা হলে তো আমার সুখের অন্ত নেই, কিন্তু এখানে থাকলে যদি ওর ধর্মচ্যুতি হয়, লোকে যদি ওকে নিন্দে করে, তা হলে আমার তা সহ্য হবে না।'

তবে উপায়?

'এমন উপায় করো, যাতে দুই ধর্মই বজায় থাকে।' বললেন গৌরহরি, 'আমার জন্মস্থানেও থাকা হয় না, তোমাদেরও ত্যাগ করতে হয় না।'

সে উপায়ও শচীমাতাই বলে দিলেন।

বলে দিলেন, 'নীলাচলে গিয়ে থাকো।'

নীলাচলে? সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শচীমাতার দিকে।

'হ্যাঁ, নীলাচলে থাকলেই সমস্তার সমাধান হয়।' বললেন শচীমাতা, 'নিমাইকে জন্মস্থানেও থাকতে হয় না আর আমরাও তার সংবাদ পেতে পারি। তোমরাও তার কাছে যেতে পারো নীলাচলে, আর নিমাইও নবদ্বীপে আসতে পারে গঙ্গাস্নানে।' 'নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর। লোক-গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥'

এমন মা না হলে কি এমন পুত্র হয়?

'নিজের দুঃখ গণনার মধ্যেও আনি না', বললেন শচীমাতা, 'যাতে আমার নিমাইয়ের সুখ, তাইতেই আমার একমাত্র আনন্দ।' 'আপনার সুখদুঃখ তাহা নাহি গণি। তাঁর যেই সুখ সেই নিজসুখ মানি।'

সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল।

মায়ের কথাই বেদ-আজ্ঞা, সানন্দে মেনে নিলেন মহাপ্রভু। যাব নীলাচল। থাকব নীলাচল।

'তোমরা এবার তবে বাড়ি ফিরে যাও।' নবদ্বীপবাসীদের সকলকে সম্মান করে বললেন মহাপ্রভু, 'বাড়ি গিয়ে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করো। আমি নীলাচলে যাই। সকলকে বলে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব, দেখা দিয়ে যাব।'

'ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমায় দিব দরশন॥'

হরিদাস এসে কেঁদে পড়ল। বললে, 'তুমি শ্রীক্ষেত্রে গেলে আমার কী গতি হবে? আমার তো সেখানে যাবার অধিকার নেই। আমি যে যবন, আমি যে অস্পৃশ্য। তোমাকে না দেখে আমার এ পাপিষ্ঠ জীবন বাঁচবে কি করে?'

প্রভু বললেন, 'হরিদাস, তোমার দৈন্য সংবরণ করো। তোমার দৈন্য দেখলে অস্থির হয়ে পড়ি। তোমার ভয় নেই, তোমার কথা

জগন্নাথের চরণে নিবেদন করব, তাঁর কৃপায় তোমাকে নিয়ে যাব শ্রীক্ষেত্রে।'

কে এই জগন্নাথ ? এই জগতের নাথ ?

যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ, বাইরে গৌরবর্ণ, যিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে নিজের বৈভব প্রকাশ করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সঙ্কীর্তন-রূপ অর্চনায় আমরা আশ্রয় করেছি। রাধিকার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করেছেন বলেই তিনি গৌর। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ।

উপপুরাণে ব্যাসকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'কোনো কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করে আমি পাপহত মানুষদের হরিভক্তি শিখিয়ে থাকি।'

সকল কলিতে নয়, কোনো এক কলিতে। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-লীলা প্রকটিত করেন, সন্দেহ কী, তারই অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে।

তা হলে শাস্ত্রেই বলা আছে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। ভগবান ছাড়া কার এত বিভূতি গোচরীভূত হয় ? কোন মানুষে সম্ভব এত প্রেমবিকার ? কার সাধ্য বন্য পশু-পাখিকে প্রেমদানে বশীভূত করবে ? সন্দেহ কী, চৈতন্যই পরতত্ত্বের সীমা, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। আর লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিই তত্ত্বজ্ঞান বা সিদ্ধান্ত। তর্কে নয় সিদ্ধান্তেই জাগবে সুদৃঢ় নিষ্ঠা। 'চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥'

অদ্বৈত বললে, 'তুমি এখুনি যেও না। দিন দু চার থাকো কৃপা করে।'

দশ দিন থাকলেন মহাপ্রভু।

শচীমাতা বললেন, 'এ কদিন আমি রান্না করব। রান্না করে খাওয়াব আমার নিমাইকে। আর সকলে অন্যত্র কত তো দেখতে পাবে নিমাইকে, কিন্তু আমি আর কোথায় তার দর্শন পাব ?'

না, না, তুমিই রান্না করে খাওয়াবে বৈকি। তুমি থাকতে আর কার হাতে খাব ? আর কার ব্যঞ্জন সুস্বাদু লাগবে ?

শুধু কি নিমাইয়ের জন্যে রান্না? বহুতর ভক্তই প্রসাদপ্রত্যাশী।

তা হোক, প্রভুর কৃপায় অদ্বৈতের কি অপ্রতুল আছে? তার ভাণ্ডার অক্ষয়-অব্যয়। যতই ব্যয় করো ততই আবার তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। কোত্থেকে আসে, কে জোটায়, তা কে বলবে!

'আনন্দিত হইয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু-আরাধনে॥'

ভোজনতৃপ্ত পুত্রমুখ দেখে শচীর গভীর আনন্দ।

দিনে ভক্তদের নিয়ে কৃষ্ণকথা, আর রাত্রে নর্তন-কীর্তন—এ চলছে নিয়মিত। কৃষ্ণকথায় কেমন শান্ত নিমাই, কিন্তু নর্তনে-কীর্তনে একেবারে উন্মাদ। স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ প্রলয়—এসব তো হচ্ছেই, থেকে থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছে। শচীমা হাহাকার করে উঠছেন, নিমাইয়ের শরীর বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করছেন, 'দেখো আমার নিমাইয়ের শরীরে যেন ব্যথা না লাগে। বাছা আমার সন্ন্যাস করেছে বলে কি তার শরীরে ব্যথা লাগে না?'

ব্যথার মধ্যেই যে আনন্দের বাসা। এ যে বিষামৃতে একত্র মিলন।

যাত্রার দিন উপস্থিত হল।

'হরি বোল।' হুঙ্কার করে উঠলেন মহাপ্রভু। 'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই। ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।'

ক্রন্দনের রোল তুলল ভক্তদল।

প্রভু বললেন, 'ঘরে ফিরে যাও সকলে। যা বলেছি, কৃষ্ণকীর্তন করো। আবার আমাদের দেখা হবে। মা-ই তো বলেছেন, তোমরা নীলাদ্রি যাবে আর আমি গঙ্গাস্নান করতে নবদ্বীপে আসব।'

ভক্তের আশ্রমে, ভক্তির আশ্রয়েই আমি সর্বক্ষণ বিরাজ করি।

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় নেই কেউ। যদিও আমার স্বতন্ত্র বিহার, তবু আমি ভক্ত-পরবশ। তোমরাই আমার সর্বস্ব। তোমাদের ছেড়ে আমার তিলার্ধও বিচ্ছেদ নেই।

'ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতামাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সবা লাগি মোর সর্ব অবতার॥
তিলার্ধেও আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জান ইহা॥'

ভগবানের যত লীলা, সমস্তেরই উদ্দেশ্য ভক্ত-চিত্ত-বিনোদন। ভক্ত যেমন ভগবানের সুখ ছাড়া আর কিছু জানে না, ভগবানও তেমনি ভক্তের সুখ ছাড়া আর কিছু জানেন না। প্রেম-রস আস্বাদনের জন্যেই কৃষ্ণের প্রকটলীলা, আর এই আস্বাদনেই তাঁর ভক্তকে অনুগ্রহ। 'এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥' ভক্তকে নিয়েই ভগবান এই জগতের মেলা বসিয়েছেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁর রসের খেলা চলছে, এই অনুভবটিই তাঁর অপার অনুগ্রহ। 'রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম।' ধর্ম মানে বেদধর্ম, লোকধর্ম আর কর্ম মানে যাগযজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান। ধর্মকর্মের উদ্দেশ্য ইহলোকের বা পরলোকের সুখ। এ সুখ অনিত্য। কৃষ্ণসেবাসুখের তুলনায় তুচ্ছ।

তাই কৃষ্ণে নির্মল অনুরাগ করো। ভগবানে পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ কোরো না। সূর্য সর্বত্র সমানভাবেই রোদ দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে শীতার্ত মনে হয়, বাইরে রোদে এসে বোসো। ঘরে বন্দী হয়ে থেকে সূর্যের দোষ ধোরো না। সূর্য-সান্নিধ্যে, কৃষ্ণ-সান্নিধ্যে চলে এস।

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্যেই ভগবান সর্বচিত্তহারিণী লীলা করছেন। ভক্তের মুখে সেই লীলাকথা শুনবে আর সকলে। শুনে তারা আবার বলবে। তারা আবার ভগবৎপরায়ণ, লীলাকথা-পরায়ণ হবে। ভক্ত নিজে ভগবৎ-লীলার অনুষ্ঠান করবে না—সাধ্য কী সে সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করে—সে শুধু ভগবৎলীলাকথা শুনবে, বলবে, ভাববে অনন্যনিষ্ঠ হয়ে।

শচীমাতাও কি কাঁদছেন? তিনি তো অনুমতি দিয়েছেন যেতে। তবু অশ্রুধারা বারণ মানছে না। অশ্রুধারার সান্ত্বনা কোথায়?

মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন প্রভু। আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'মা, তুমি উতলা হয়ো না। শুধু কৃষ্ণকে স্মরণ করো। তা হলেই আমাকে পাবে কোলের কাছে।' 'প্রভু বলে মাতা দুঃখ না ভাবহ মনে। সর্বসিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে॥ যদি শ্রদ্ধা আমা প্রতি আছে সবাকার। কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার॥'

চারজন সঙ্গী নিলেন মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ দত্ত আর দামোদর। কিন্তু পথে পা বাড়িয়েছেন কী, বহু বৈষ্ণব ভক্ত পিছু নিল। আমাদেরও সঙ্গী করো। আমাদের ফেলে যেও না।

'বলেছি তো, ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ নাম গান করো।' ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন মহাপ্রভু, 'আমার বিরহে দুঃখ পাবে ভেবেছ? কেউ দুঃখ পাবে না। কৃষ্ণকীর্তনে ডুবলে কারু দুঃখ থাকে না। তোমাদের তো আমি বৃহৎ সম্পত্তিই দিয়ে গেলাম। আর দেখবে যখনই কৃষ্ণভজন করবে, আমি তোমাদের কোলে বসে আছি।' 'কাহারো হৃদয়ে নাহি রবে দুঃখশোক। সঙ্কীর্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্বলোক॥ কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥'

তোমার পথ আর কে নিরোধ করতে পারে বলো। যখন নীলাচলে চিত্ত তোমার স্থির হয়েছে, সাধ্য নেই কেউ তোমাকে নিবৃত্ত করে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন তোমার কিঙ্করের কিঙ্কর। দুর্ঘট সময়

হোক, উড়িষ্যার রাজায় আর বাঙলার নবাবে বিবাদ হোক, তাতে তোমার কী! আমরা ফিরে যাচ্ছি। তুমি সুখে থাকো। তোমার ইচ্ছায়ই সব হচ্ছে। তোমার ইচ্ছারই জয় হোক।

'যে করেন মনে কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥'

একমাত্র কৃষ্ণভক্তরাই ভক্তিরস আস্বাদন করতে পারে। যারা অভক্ত, তাদের পক্ষে ও রস-আস্বাদন অসম্ভব। যাদের ভক্তিবিষয়ে আদর নেই, যারা ফল্গুবৈরাগ্য ধারণ করেছে, যারা শুষ্ক জ্ঞানের অভ্যাসে তৎপর, যারা তার্কিক, কর্মকাণ্ডপরায়ণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মসন্ধানী, তারা এ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত। যাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজই যাদের সর্বস্ব, তাদেরই এ রসে অধিকার। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও নিরর্থক, যদি তা ভক্তিবর্জিত থাকে। 'কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥' যারা শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ, তাদের মায়ামুক্তি জ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই হতে পারে। ভক্তি পরমস্বতন্ত্রা। ভক্তিরেব ভূয়সী। ব্রহ্মা তাই কৃষ্ণকে বলছে, মঙ্গলহেতুভূতা ভক্তি ছেড়ে যারা জ্ঞানের জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে, তারা অন্তঃসারহীন স্থূল তুষকেই আঘাত করে। অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে তণ্ডুল জোটে না, তাদের পরিশ্রমই সার।

বঙ্গদেশের শেষপ্রান্তে সাগরসঙ্গমের কাছে ছত্রভোগের দিকে যাত্রা করলেন মহাপ্রভু। ডায়মণ্ডহারবারের দিকে জয়নগর-মজিলপুরের কাছাকাছি গ্রাম এই ছত্রভোগ। এখানে বিরাজমান অম্বুলিঙ্গ মহাদেব।



৪১

'পথের সম্বল কে কী এনেছ?' নিত্যানন্দকে জিগগেস করলেন প্রভু।

'একটা কানাকড়িও সঙ্গে নিইনি।' বললে নিতাই, 'সম্বলের মধ্যে দণ্ড, করোয়া, কৌপীন ও বহির্বাস। তোমার আদেশ ছাড়া কার সাধ্য আছে জিনিস নেয়!'

কথা শুনে খুশি হলেন গৌররায়। বললেন, 'কেউ যে কিছু সঙ্গে নাওনি, তাতে বড় তৃপ্তি পেলাম। কৃষ্ণ ত্রিজগৎ পালন করেন, আমাদেরও করবেন। তাছাড়া, কৃষ্ণ যদি অন্ন মাপান, অরণ্যেও তা মিলবে। আর যদি না মাপান, রাজপুত্রও থাকবে অনাহারে। সর্বত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাই ফলবতী।'

'ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যেদিনে বা না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিবে সর্বত্র॥

ছত্রভোগে পৌঁছুবার আগে এলেন আটিসারায়। গ্রাম হলে কী হয়, সেখানে থাকে অনন্ত পণ্ডিত। তার ঘরে প্রভু অতিথি হলেন। কৌপীন বেশ, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু, ভিক্ষেয় বেরুলেন। অনুচরদেরও নিলেন সঙ্গে। ভিক্ষাই যে সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাই শেখালেন সবাইকে। আর যতক্ষণ গৃহে আছেন ততক্ষণ শুধু কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্তন।

ছত্রভোগে গঙ্গা শতমুখী। সেখানে জলময় শিবলিঙ্গ। ভগীরথ

যখন গঙ্গাকে নিয়ে এল, তখন বিরহবিহ্বল শিব উপস্থিত হল ছত্রভোগে। গঙ্গাকে দেখেই তার জলে ঝাঁপ দিল। সেখানেই বিরাজ করল জলরূপে।

শাক্ত ও বৈষ্ণবদের তারকতীর্থ ছত্রভোগ। তারপর এখন আবার চৈতন্যচন্দ্রের পদস্পর্শ পড়ল।

শতমুখী গঙ্গা দেখে প্রভুর নয়নধারাও শতমুখী হল। তিনি অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে স্নান করলেন। স্নানান্তে যে বহির্বাস পরেন, তাই আবার চোখের জলে ভিজে যায়।

ছত্রভোগ গৌড়রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। সে দক্ষিণাংশের অধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান। হোসেন শার অধীনস্থ কর্মচারী। ওপারেই উড়িষ্যা, প্রতাপরুদ্র যার রাজা। গৌড়ের সঙ্গে উড়িষ্যার তখন কলহ, সাধ্য নেই সহজে কেউ গৌড় থেকে যেতে পারে উড়িষ্যায়।

দোলায় চড়ে কোথায় যাচ্ছিল রামচন্দ্র। পথে এত কোলাহল কেন? মুখ বাড়িয়েই দেখতে পেল প্রভুকে। দেখল তেজোদৃপ্ত বিশাল পুরুষ। দেখেই কেমন ভয় হল। তাড়াতাড়ি নামল দোলা থেকে। নেমেই পড়ল প্রভুর পদতলে।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নেই। হা হা জগন্নাথ বলে কাঁদছেন আকুল হয়ে।

রামচন্দ্র খান ফাঁপরে পড়ল। এ আর্তির সম্বরণ হবে কী করে?

'দেখুন আপনার পায়ের কাছে কে পড়ে আছে?' নিতাই প্রভুকে বললে সকাতরে।

'তুমি কে?' গৌরসুন্দর চমকে উঠলেন।

'আমি আপনার দাসানুদাস।'

'ইনি এ এলেকার অধিকারী, নবাবের হয়ে শাসন করছেন।' বললে কেউ-কেউ।

'তা হলে তো ভালো হল।' প্রভু তাকালেন রামের দিকে। 'আমি নীলাচলচন্দ্র দর্শন করতে চলেছি। তুমি পারো কিছু সাহায্য করতে?'

'পারি।' বললে রামচন্দ্র। 'গৌড় আর উড়িষ্যা, দুই রাজায় বিষম কলহ চলছে, ত্রিশূল পুঁতে নির্ধারণ করেছে সীমানা। যদি কেউ এ সীমানা লঙ্ঘন করে, তাকে গুপ্তচর মনে করে তক্ষুনি হত্যা করা হয়। কাউকে এ পথে যেতে দিই—আমার অধিকার নেই। যদি উপরে জানতে পারে, তা হলে আমার ফাঁসি হবে। তা হোক, আমার জাতি-প্রাণ-ধন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তবু আপনাকে আমি পাঠাবই নীলাচল। আপনার ইচ্ছার আমি অপূরণ হতে দেব না।'

রামচন্দ্রের দিকে শুভদৃষ্টিপাত করলেন প্রভু। দৃষ্টিমাত্র তার সর্ববন্ধনের ক্ষয় হয়ে গেল।

এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাত কাটালেন। খেলেন নামমাত্র। কোথায় জগন্নাথ, কতদূর জগন্নাথ—রাত্রে-দিনে এই শুধু কাতরতা। কোথায় নীলাচলচূড়ামণি!

প্রহর খানেক রাত তখনো আছে, রামচন্দ্র এসে বললে, 'নৌকো এনেছি। রাত থাকতেই যাত্রা করুন।'

হরি-হরি বলে ত্বরিতে নৌকোয় উঠলেন গৌরহরি। একে একে অনুচরেরাও উঠল। উঠেই প্রভু নৃত্য করতে সুরু করলেন। মুকুন্দকে বললেন, কীর্তন লাগাও। 'হরিহরয়ে নমঃ' কীর্তন আরম্ভ করল মুকুন্দ।

মাঝিরা বিপদ দেখল। তারা ভেবেছিল গোপনে প্রভুকে উড়িষ্যায় নামিয়ে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাবে। কিন্তু এ যে দেখছি ভরাডুবি! এভাবে নাচলে নৌকো বেসামাল হয়ে যাবে তলিয়ে। তাছাড়া কোলাহলে জলদস্যুরা আকৃষ্ট হবে। ধন-প্রাণ কিছুই বাঁচবে না।

তখন তারা প্রভুর কাছে মিনতি করল: 'নাচের উৎপাতে নৌকো ডুবে গেলে কোথায় যাব, কোথায় পেঁাছিয়ে দেব? জল-ডাকাতরা ঘুরছে আশে-পাশে। গোলমাল শুনলেই সদলবলে চলে আসবে।

আমাদের দেখছি, ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। নীরবে বসুন শান্ত হয়ে। আমাদের বাইতে দিন চুপচাপ।'

প্রভুর সঙ্গীরা সঙ্কুচিত হল। যা বলছে মাঝিরা তা অযৌক্তিক নয়।

প্রভু হুঙ্কার করে উঠলেন: 'তোমরা ভয় পাচ্ছ? ভয় কী! এই দেখ সুদর্শন চক্র। ঘুরে ঘুরে ভক্তদের সর্ববিঘ্ন খণ্ডন করছে। কিছু চিন্তা কোরো না, কীর্তন লাগাও! তোমরা দেখ কি না-দেখ, সুদর্শন ফিরছে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে।'

'ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সভারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ে মরে॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥'

প্রিয়বর্গ আবার কীর্তন ধরল। মাঝিরাও আশ্বস্ত হয়ে বাইতে লাগল নৌকো।

দিন কয়েক পরে উড়িষ্যায় বালেশ্বরের কাছে প্রয়াগঘাটে নৌকো থামল।

'কারে বোলে রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল পার বা ওপার॥
কিছুই না জানে প্রভু ডুবি ভক্তিরসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥'

প্রয়াগঘাটে প্রভু স্বগণদের নিয়ে স্নান করলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠিত মহেশ আছে, তাকে প্রণাম করলেন। ভক্তদের বললেন, 'তোমরা বোসো, আমি ভিক্ষে মেগে আনি।'

সে কী! তুমি যাবে কোথায়? ভক্তদল আপত্তি করল। আমরা কেউ যাই।

কারু আপত্তি শুনলেন না প্রভু। নিজেই বেরুলেন একা-একা। বহির্বাসকে ঝুলির মত করে ধরলেন।

লক্ষ্মী যাঁর পাদপদ্মে স্থানভিক্ষা করছে, তিনিই কিনা পথের ভিখিরি! 'হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে। ন্যাসী রূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে॥'

ওরে ছাখ, পথে কে এক নতুন সন্নেসী বেরিয়েছে। আহা, মরে যাই, কী সুন্দর দেখতে! ভিড় জুটে গেল চারপাশে। যার ঘরের তুয়ারে গিয়ে দাঁড়ান, সেই বিহ্বল হয়ে তাকায়, মনে হয়, এ সোনার বিগ্রহকে যথাসর্বস্ব দিয়ে দিই।

ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফিরলেন গৌরহরি। মন্দিরে ভক্তরা অপেক্ষা করছিল, সেই মন্দিরে। ঝুলি তো নয়, এক সাম্রাজ্য নিয়ে ফিরেছেন! ভক্তরা তো অবাক। 'পারবে, তুমি পারবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে। তুমিই আমাদের দেহের অন্ন, আত্মার পরমান্ন।'

আহারান্তে সুরু হল কীর্তন। সমস্ত গ্রাম ধন্য ধন্য করে উঠল।

উষাকালে আবার যাত্রা করলেন প্রভু।

কিন্তু এবার ঘাটের পাটনি পথ আটকাল। বললে, 'দান দাও, নইলে পার করব না।'

যিনি ভবসাগর পার করবেন—তাঁরই পথরোধ।

ভক্তরা বললে, 'কোত্থেকে দান দেব, আমাদের কপর্দক মাত্র নেই।'

'তা হলে ওদিকে গিয়ে বসো, এদিকে এস না।' পাটনি অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু সহসা প্রভুর চোখের উপর চোখ পড়ল পাটনির! কী হল কে জানে, পাটনি প্রভুকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা, তুমি এস। আর ওরা,' ভক্তদের নির্দেশ করল পাটনি, 'ওরা কি তোমার লোক?'

প্রভু বললেন, 'এ জগতে আমার কেউ নেই, আমিও কারু নই। আমি একান্তই একা।'

'তা হলে তুমি এদিকে এস, একা শুধু তোমাকেই পার করব।'

প্রভু ভক্তদের ছেড়ে ঘাটের কাছে গিয়ে বসলেন।

ভক্তরা প্রমাদ গুনল, প্রভু কি তবে আমাদের ছেড়ে দিয়ে একাই নীলাচল যাবেন? প্রভু ছাড়া আমরা তবে বাঁচব কী করে?

নিত্যানন্দ বললে, 'ভয় নেই। প্রভু কি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন?'

'তোমরা তো গোঁসাইয়ের কেউ নও', পাটনি ভক্তদের কাছে হাত পাতল: 'তবে ঘাটের কড়ি বের করো।'

সকলে ত্রস্ত হয়ে উঠল, কে যেন উচ্চরোলে কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, জগন্নাথ, তুমি কতদূরে? দেখা দাও, দেখা দাও আমাকে।

পাটনি স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাঠ-পাথর গলে যায়, এমন কান্নাও কাঁদা যায় নাকি? ভক্তদের জিগগেস করলে, 'এমন অদ্ভুত কাঁদছেন ইনি কে?'

'ইনি আমাদের ঠাকুর। সকলের ঠাকুর।' অশ্রুচোখে বললে ভক্তদল।

'কে ঠাকুর?'

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম শুনেছ? ইনি সেই নবদ্বীপের অবতার, ত্রিজগতের ঈশ্বর। সন্ন্যাসীবেশে জীবোদ্ধার করবেন বলে চলেছেন নীলাচল।'

পাটনি প্রভুর পায়ে গিয়ে পড়ল।

সর্বজীবনাথ হরি-হরি বলে উঠলেন। নৌকো চলল পরপার।

পৌঁছুলেন রেমুণায়। পরমমোহন গোপীনাথকে দর্শন করলেন। প্রণাম করতেই গোপীনাথের পুষ্পচূড়া প্রভুর মাথার উপর খসে পড়ল। তা মাথায় বেঁধে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। গোপীনাথের

সেবকেরা অবাক মানল। এত রূপ তারা কোনোদিন দেখেনি, এত প্রেম! কে গোপীনাথ! যে মন্দিরে স্থির, না, যে অঙ্গনে নৃত্যপর?

'এই যে ঠাকুর ইনি একদিন ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন,' সমবেত সকলকে বলছেন প্রভু, 'তাই এঁর নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।'

'কে সে ভক্ত?'

'মাধবেন্দ্র পুরী।'

বৃন্দাবনে তাঁর গোপালের গায়ে চন্দন মাখাবার স্বপ্নাদেশ হয়েছে, সেই চন্দনের সন্ধানে নীলাচলে যাচ্ছিলেন মাধবেন্দ্র, পথিমধ্যে থেমেছেন রেমুণায়, গোপীনাথকে দেখতে। গোপীনাথের বারোখানি ক্ষীর ভোগ হয়, বারো থালায় সাজিয়ে। সেই ক্ষীরের স্বাদ অমৃতের তুল্য বলে তার নাম অমৃতকেলি। মাধবেন্দ্র কোনোদিন কারু কাছে কিছু চেয়ে আহার করত না, কিন্তু সেদিন গোপীনাথের ক্ষীর খেতে তার আকাঙ্ক্ষা হল। আকাঙ্ক্ষা হতেই লজ্জায় মরে গেল মাধবেন্দ্র, এই আকাঙ্ক্ষায় তার অযাচক বৃত্তির হানি ঘটেছে। অপরাধ-মোচনের জন্যে বিষ্ণু স্মরণ করতে লাগল। কিন্তু গোপীনাথ করল কী? গোপীনাথ মাধবেন্দ্রের জন্যে ক্ষীর চুরি করল, লুকিয়ে রেখে দিল ধড়ার আড়ালে। রাত্রে পূজারীকে স্বপ্ন দেখাল, ভোগের জায়গায় বারোখানা ক্ষীরের জায়গায় যে এগারোখানা ছিল লক্ষ্য করোনি। বাকি একখানি আমি আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্য চুরি করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। যাও, সেই ক্ষীরখানি মাধবেন্দ্রকে দিয়ে এস। মাধবেন্দ্র হাটের আটচালার নিচে শুয়ে আছে।

'ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণ।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবন॥'

ভক্তের জন্যে ভগবান চুরি পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের স্বীকৃতিতে গোপীনাথের নাম "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।"

মাধবেন্দ্রের অমৃত চরিত ভক্তদের কাছে বর্ণন করলেন মহাপ্রভু। গোপালের জন্যে চন্দনভার বয়ে নিয়ে চলেছে, কোনো কষ্টকেই অন্তরায় বলে মানছে না। প্রগাঢ় প্রেমের এমনি স্বভাব যে প্রিয়-সুখের জন্যে প্রেমিক সমস্ত দুঃখকে তুচ্ছ করতে পারে, সমস্ত বিঘ্নকে তুচ্ছতর। 'প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥' তারপর চন্দনভার নিয়ে যখন রেমুণায় এল, তখন গোপাল বললে, তোমাকে এ বোঝা বৃন্দাবনে বয়ে আনতে হবে না, তুমি গোপীনাথকেই চন্দন মাখাও, তাতেই আমি সুশীতল হব। ভক্তশ্রম লাঘব করে দিল গোপাল।

সেই মাধবেন্দ্র—পরম নিস্পৃহ, বৃথালাপবর্জিত, সর্বত্র উদাসীন, গ্রাম্যবার্তার ভয়ে দ্বিতীয়সঙ্গহীন, প্রতিষ্ঠা বা সুখ্যাতির ভয়ে চিরকাতর—যখন দেহ রাখছেন তখন দিব্যোন্মাদগ্রস্তা রাধিকার মত বিলাপ করছেন : হে দীনদয়ার্দ্র কৃষ্ণ, দেখা দাও, তোমার অদর্শনে প্রাণ যায়, তুমি দেখা না দিলে আমি কী করব, কী করতে পারি বলো।

মহাপ্রভু সেই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁরও মধ্যে দেখা দিল রাধিকার প্রেমোন্মাদ।

রেমুণা থেকে প্রভু এলেন যাজপুর। যাজপুরে বৈতরণী নদীতে স্নান করলেন, বরাহঠাকুরকে দর্শন করলেন, পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিরজা দেবী ও ত্রিলোচনেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গিয়েও প্রণাম করলেন। বিরজা দেবীকে দেখে তাঁর গোপীভাব উপস্থিত হল। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ভিক্ষে করলেন কৃষ্ণপ্রেম।

তারপর চলে এলেন কটক। প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান, উড়িষ্যার রাজধানী এলেন সাক্ষীগোপাল দেখতে।

সাক্ষীগোপালের কাহিনীটি প্রভুকে শোনালে নিত্যানন্দ।

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ করতে গিয়েছে বৃন্দাবন। একজন

বুড়ো, আরেকজন যুবক। যুবক সারাক্ষণ বৃদ্ধের সেবাযত্ন করছে। বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললে, তোমাকে সম্মান না করলে আমার কৃতঘ্নতা হবে। অতএব আমি তোমাকে কন্যাদান করব।

যুবক বললে, 'এ অসম্ভব। আমি অকুলীন, উপরন্তু দরিদ্র, বিদ্যার্জনও বেশি করিনি, সুতরাং এ প্রস্তাব ফিরিয়ে নিন। আপনার সেবায় কৃষ্ণ খুশি হবেন—সেই আশায় আপনার পরিচর্যা করছি। পাত্র হবার মত আমার যোগ্যতা নেই।'

বৃদ্ধ মানল না। বললে, 'তুমি সংশয় কোরো না। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমাকেই কন্যা সমর্পণ করব।'

যুবক আবার বাধা দিল। বললে, 'আপনার অনেক জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, তাদের সম্মতি ছাড়া এ প্রস্তাব অর্থহীন।'

বৃদ্ধ বললে, 'কন্যা আমার আপন বিত্ত, তা দিতে অন্যের নিষেধ চলবে কেন? যদি জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কেউ বাধা দিতে আসে, তাদেরকে নিরস্ত করে বা বর্জন করে আমি কথা রাখব।'

'তা হলে গোপালকে সাক্ষী রাখুন।'

গোপালকে সাক্ষী রাখল বৃদ্ধ। গোপালের সাক্ষাতে বললে, 'আমি আমার নিজধন নিজকন্যা এই যুবককে দান করব।'

'তুমি আমার সাক্ষী।' গোপালকে বললে যুবক, 'যদি অন্যথাচরণ দেখি, তোমাকে ডাকব সাক্ষ্য দিতে।'

গুরুবুদ্ধিতে বৃদ্ধকে যুবক সেবা করতে লাগল প্রাণপণে। দেশে ফিরে এসে বৃদ্ধ সমস্ত বৃত্তান্ত আত্মীয় বন্ধুদের কাছে বিবৃত করলে। সকলে হাহাকার করে উঠল, নীচ বংশে কন্যা দেবে—অমন হীন কথা মুখেও এনো না। সমস্ত সমাজ উপহাস করবে আমাদের।

'কিন্তু তীর্থবাক্যের অন্যথা করি কী করে?' বৃদ্ধ বললে সকাতরে।

আত্মীয়-বন্ধুরা রুখে দাঁড়াল। বললে, তা হলে আমরা সকলে তোমাকে ত্যাগ করব। স্ত্রী-পুত্র বললে, বিষ খাব।

'ও যে তা হলে গোপালকে সাক্ষী ডাকবে।' বৃদ্ধ বললে, 'লাভের মধ্যে মামলাতে ও জিতবেই, আমাকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে। এ সহ্য হবে না।'

'কিসের তোমার সাক্ষী?' পুত্র বললে রুষ্ট হয়ে, 'একটা নিশ্চল বিগ্রহ, তাও দূর দেশে রয়েছে। সে আসবে সাক্ষ্য দিতে!' পরে বললে নিভৃত হয়ে, 'যুবক যদি এসে কন্যা দাবি করে, আর তুমি সরাসরি মিথ্যে বলতে না পারো, বোলো, কী বলেছি আমার স্মরণ নেই। তা হলেই ওর মামলা টেঁসে যাবে।'

'তা আমি কী করে বলতে পারি? কথা দিইনি—এ যেমন মিথ্যে, স্মরণ নেই—এ আরো মিথ্যে। গোপাল, আমার দু-দিক রক্ষা করো।' গোপালচরণে বৃদ্ধ কাঁদতে লাগল। 'দেখো আমার ধর্মও যেন বাঁচে, আত্মীয়স্বজনও না রুষ্ট হয়।'

একদিন সত্যি-সত্যিই যুবক এসে দাবি জানাল। অঙ্গীকার রাখতে চেষ্টা করছেন না, এ আপনার কেমনতরো আচরণ?

বৃদ্ধ চুপ করে রইল। কিন্তু তার পুত্র এল ঠেঙা নিয়ে। তুমি বামন হয়ে চাঁদ চাইছ? কুলহীন অধম হয়ে চাইছ আমার বোনকে বিয়ে করতে?

যুবক পালিয়ে গেল প্রাণভয়ে। গ্রামস্থ পঞ্চজনের কাছে শরণ নিল। সালিশ বসল গণ্যমান্যদের। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তলব হল। বলো, কেন একে কন্যা দিচ্ছ না? কথা দিয়েছ তো কথার খেলাপ করছ কেন?

ছেলে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই বললে বৃদ্ধ। বললে, 'কখন কী বলেছি আমার কিছু স্মরণ নেই।'

তখন ছেলে অগ্রবর্তী হয়ে বললে, 'শুনুন। তীর্থযাত্রায় বাবার সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি ছিল। ঐ পাষণ্ড বাবাকে ধুতুরা খাইয়ে অজ্ঞান করিয়ে সমস্ত লুট করে নিয়েছে। এখন রব তুলেছে, কন্যাদানের অঙ্গীকার করেছে ব্রাহ্মণ। আপনারাই বিচার করে

বলুন ঐ নরাধম কি পাত্র হবার যোগ্য? ঐ কুলহীন অনাচারী? ওকে বাবা কন্যা দিতে স্বীকার করবেন?'

'কিন্তু সাক্ষী আছে, আমার একজন সাক্ষী আছে।' যুবক চিৎকার করে উঠল।

'কে সাক্ষী?'

'এক মহাজন আমার সাক্ষী।'

'কে, তার নাম কী?'

'তার নাম গোপাল। বৃন্দাবনের গোপাল। সেই পরাবরেশ পরিপূর্ণ পুরুষ। যার বাক্য সত্য বলে ত্রিভুবন মানছে। যার কাছে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ স্বমুখে দিয়েছে প্রতিশ্রুতি।'

'তাই ভালো। গোপাল যদি এসে সাক্ষ্য দেয়,' বৃদ্ধ বললে, 'তবে নিশ্চয় কন্যার্পণ করব।'

'হ্যাঁ, গোপাল যদি এসে বলে –' ব্রাহ্মণের পুত্র সায় দিল।

বৃদ্ধের আশা—কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করবেন, আমার বাক্য সপ্রমাণ করবেন; আর পুত্রের আশ্বাস, প্রতিমা কখনো আসতে পারে? কখনো হাঁটতে পারে?

যুবক তখন সটান হাজির হল বৃন্দাবনে। গোপালকে গিয়ে বললে, 'গোপাল, তুই বিপ্রের ধর্ম রাখো। কন্যা পাব—এতে আমার গৌরব নেই, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা থাকে—এতেই আমার গৌরব।'

কৃষ্ণ বললে, 'তুমি ফিরে যাও, আমি সভাস্থলে আবির্ভূত হয়ে ঠিক সাক্ষ্য দেব। কিন্তু প্রতিমাস্বরূপে আমি সেখানে যাব কী করে?'

'না, না, তুমি যদি চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হও কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না। তুমি যে মূর্তিতে আছ সেই মূর্তিতে যাবে আমার সঙ্গে।' বললে যুবক, 'তা হলেই সকলে তোমাকে মান্য করবে।'

'বা, প্রতিমা হাঁটবে কী করে?' বললে কৃষ্ণ।

'তা হলে এখন কথা কইছ কী করে?' বললে যুবক, 'তুমি প্রতিমা নও, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ভক্তের জন্যে তুমিই তো অকার্যকরণ করবে। মন্দির ত্যাগ করে আমার সঙ্গে যাবে, যাবে পায়ে হেঁটে, যেমন আমি যাব। যে ভাবে ভজন করব তোমাকে, তুমিও সেইভাবে আমাকে কৃপা করবে।'

'বেশ, আমি যাব তোমার পিছু-পিছু।' গোপাল রাজি হল, 'কিন্তু তুমি সন্দেহবশে পিছন ফিরে তাকাবে না আমি সত্যি যাচ্ছি কিনা। বিশ্বাস করবে। যদি ফিরে তাকাও আমি তবে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ব।'

'বুঝব কী করে যে তুমি ঠিক অনুসরণ করছ আমাকে?'

'আমার নূপুরধ্বনি শুনতে পাবে।'

যুবক গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল। পিছনে শুনতে পেল নূপুরধ্বনি। তবে গোপালও চলেছে সঙ্গে-সঙ্গে।

চলতে চলতে বহুদিন পরে পৌঁচেছে গ্রামপ্রান্তে। এবার গ্রামে ঢুকব, বাড়ি যাব, সকলকে বলব সাক্ষী আনার কথা, কিন্তু সাক্ষীকে নিজে একবার স্বচক্ষে দেখব না? আমার কেমন সাক্ষী একবার সনাক্ত করব না? এই ভেবে যুবক তাকাল পিছন ফিরে। আর নূপুরধ্বনি নেই। গোপালও থেমে পড়েছে।

যুবক কাঁদতে লাগল।

গোপাল বললে, 'আমি আর অগ্রসর হব না। তুমি বাড়ি যাও, সকলকে ডেকে নিয়ে এস। আমি এখানে দাঁড়িয়েই সাক্ষ্য দেব।'

গ্রামে টি-টি পড়ে গেল। প্রতিমা হেঁটে চলে এসেছে সাক্ষ্য দিতে। হ্যাঁ, সেই মূর্তি। ত্রিভঙ্গবঙ্কিম মুরলীধর। জলজ-লোচন। পীতধড়া ও মোহনচূড়ায় সাজানো। সর্বানন্দকদম্বস্বরূপ।

গোপাল সাক্ষ্য দিল। যুবককে কন্যাদান করল বৃদ্ধ। সর্ব আপত্তির মীমাংসা হয়ে গেল।

বিপ্রদ্বয়কে বর দিতে চাইল গোপাল।

'আর কিছু চাই না আমরা। তুমি শুধু এইখানে থাকো অনন্ত সাক্ষী হয়ে।'

নিত্যানন্দের কাছে গোপালকথা শুনে বিহ্বল হলেন প্রভু। সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ভক্তদল তাকিয়ে দেখল, গৌরাঙ্গ আর সাক্ষীগোপাল দুজনেরই একমূর্তি।

'দোঁহে একবর্ণ—দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর—দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশমন চন্দ্রবদন॥'

শ্রীচৈতন্যের রূপ কেমন? তপ্তহেম সমকান্তি, প্রকাণ্ড শরীর। কণ্ঠস্বর নবীন মেঘধ্বনির চেয়েও গম্ভীর। দৈর্ঘ্যে নিজের হাতের মাপে চার হাত। দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালে বিস্তারেও সেই চার হাত। বাহু আজানুলম্বিত, অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত ঝুলিয়ে রাখলে হাতের আঙুলের অগ্রভাগ হাঁটুকে স্পর্শ করে। নয়ন কমলসদৃশ, তিলফুলের চেয়েও সুন্দর নাক, মুখ চন্দ্রের চেয়েও মনোহর।

দেখা গেল সাক্ষীগোপাল সেই চৈতন্যমূর্তি গ্রহণ করেছে।

'ভক্তি তিন প্রকার।' কপিল তার মা দেবহূতিকে বলছে: 'তামস, রাজস আর সাত্ত্বিক। হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্যভরে ক্রোধী পুরুষ যে ভক্তি করে তা তামস ভক্তি। বিষয় যশ কিংবা ঐশ্বর্য কামনা করে যে-ভক্তি তা রাজস ভক্তি। পাপক্ষয়মানসে বা ভগবানের প্রীতিসম্পাদন-আকাঙ্ক্ষায় বা ভগবানে কর্মফল সমর্পণ করবার উদ্দেশ্যে যে ভক্তি তা সাত্ত্বিক। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি নির্গুণা ভক্তি। গঙ্গাধারা যেমন সাগরে গিয়ে মেশে তেমনি যে মনোগতি ফলানুসন্ধান না করে পুরুষোত্তমে নিহিত হয় সেই মনোগতিরূপা ভক্তিই নির্গুণা ভক্তি। যে নির্গুণা ভক্তির অভিলাষী সে ভগবানে একাত্মতাও কামনা করে না। সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য

সাজুয্যও না। ভগবানকে সেবা করবে এর বেশি কিছু তার কামনীয় নয়। একেই বলে ভক্তি অনিমিত্তা, ভক্তি আত্যন্তিকী।'

'চিত্তশুদ্ধির জন্যে কী করতে হবে? কী ভগবানের আদেশ?'

'ফলকামনা না করে নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্মানুষ্ঠান করবে। প্রতিমাকে দর্শন স্পর্শন স্তব বন্দন করবে। সকল প্রাণীতে চিন্তা করবে ভগবদ্ভাব। মহতে সম্মান, দীনে দয়া, আত্মসদৃশ ব্যক্তিতে মিত্রতা, বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, ভগবানের নামকীর্তন ও সরলতাচরণ করবে। সতের সঙ্গ করবে আর নিরহঙ্কার থাকবে। গন্ধ যেমন বায়ুযোগে ঘ্রাণকে আশ্রয় করে তেমনি অবিকারীচিত্ত ভক্তিযোগে পরমাত্মাতে আশ্রিত হবে। ভগবানই সর্বভূতের আবাস, সর্বলোকের সাক্ষী।'



৪২

তারপর এলেন ভুবনেশ্বর। যার আরেক নাম গুপ্তকাশী।

স্নান করলেন বিন্দুসরোবরে। যার আরেক নাম শিবপ্রিয়-সরোবর। সমস্ত তীর্থ থেকে বিন্দু বিন্দু জল এনে যে সরোবর শিব নিজে সৃষ্টি করেছে।

মন্দিরে বিগ্রহের সামনে নাচতে লাগলেন মহাপ্রভু। মত্ত হলেন শিবপ্রেমে। 'শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ, তাহা বুঝাইতে। নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে॥' ভক্তদের নিয়ে করলেন শিবপুজো। যত দেবালয় আছে সে গ্রামে সব দেখলেন ঘুরে ঘুরে।

শিবের কাছে ক্ষমা পেয়ে দক্ষ আবার যজ্ঞ আরম্ভ করলে ঋত্বিকেরা বিষ্ণুকে স্তব করতে লাগল: হে আশ্রয়প্রদ, এই সংসারপথ অতি দুর্গম। পথিকেরা কবে আপনার চরণনিবাস প্রাপ্ত হবে? অহঙ্কারাস্পদ

শরীর ও মমতাস্পদ গৃহই এদের গুরুতর ভার। এখানে মৃত্যুরূপ কালসাপ, বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা, সুখদুঃখদ্বন্দ্বরূপ বহুতর গর্ত, শোকরূপ দাবাগ্নি পীড়ন করছে। একমাত্র যার চিত্ত আপনার চরণে নিবিষ্ট তারই অমোঘ শান্তি।'

সেখান থেকে কমলপুর।

এখান থেকে জগন্নাথমন্দিরের ধ্বজা দেখা গেল। প্রভু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'দেখ দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে বালগোপাল বসে আছেন। স্মিত-সুবদন হাসছেন আমাকে দেখে।'

বিবশ হয়ে লুণ্ঠিত হলেন ভূতলে। কাঁদতে লাগলেন। সে আর্তি অনন্ত জিহ্বায়ও বুঝি বর্ণনা করা যায় না।

ভার্গী নদীতে স্নান করলেন। হাতের দণ্ড নিতাইয়ের কাছে জিম্মা দিয়ে গেলেন কপোতেশ্বরকে দেখতে।

নিতাই সেই দণ্ড তিন-টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দিল।

দণ্ডকে বললে, আমি যাকে হৃদয়ে বহন করছি, সে তোমাকে বয়ে বেড়াবে, এ অসহ্য। যাঁর ভুজযুগলই দুই হেমদণ্ড, তিনি আবার একটা বংশদণ্ড বইবেন কেন?

দণ্ড অস্ত্র ছাড়া আর কী! প্রেমসিন্ধু প্রভু কাকে দণ্ড দেবেন, কার শাসক হবেন? নাম-প্রেমে সকলের চিত্তশুদ্ধি ঘটাবার জন্যেই তাঁর আবির্ভাব, তাঁর দণ্ডের কী প্রয়োজন?

সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী। বাক্য, দেহ আর চিত্ত—এই তিনকে যে দণ্ড দিয়ে শাসন করে বশীভূত করেছে, সেই যতি, ত্রিদণ্ডী। মৌন হচ্ছে বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্মত্যাগ দেহের দণ্ড আর প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড। দণ্ড স্মারকচিহ্ন। সর্বদা সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তুমি কায়মনোবাককে সংযত করেছ, তুমি নিজেই নিজের দণ্ডদাতা। দৃষ্টিপূত পদন্যাস করবে, বস্ত্রপূত জল পান করবে, সত্যপূত বাক্য বলবে ও মনঃপূত আচরণ করবে।

প্রভুর কী দরকার এই স্মরণচিহ্নে? যিনি মায়াতীত সচ্চিদানন্দ-

ময়, তাঁর আবার কিসের দণ্ড, কাকে দণ্ড? পড়ুয়া নিন্দুকদের অসুরত্ব দূর করবার জন্যেই তাঁর সন্ন্যাস। আর সে অসুরত্ব দূর হবে দণ্ডে নয়, ক্ষমায়। চিত্তের শোধন হবে শুধু কৃপাবর্ষণে। তাই যিনি কৃপা ঢালবেন মুক্তহস্তে, তিনি বদ্ধমুষ্টি হবেন কী করে, কী করে দণ্ড ধরবেন? দণ্ড নিরর্থক।

মূর্তিমন্ত গৌরকৃপা নিতাই তাই ভেঙে ফেলল দণ্ড। দণ্ড তিন বলে টুকরোও তিন করল। ভাসিয়ে দিল নদীতে।

যিনি আগে বংশী হাতে করে তিন জগৎ মোহিত করতেন, তাঁর হাতে এখন তিন-পর্বের বংশদণ্ড। বংশীর বদলে বংশ! অসম্ভব। সুতরাং হে দণ্ড, তোমার দণ্ড নাও, ত্রি-ভঙ্গ হয়ে ভেসে যাও নদীস্রোতে।

সেই থেকে ভার্গীনদীর নাম দণ্ডভাঙা নদী।

আরো কি এক গূঢ় কারণ আছে দণ্ডভঙ্গের?

কপোতেশ্বর শিবকে দর্শন করে ভক্তসঙ্গে প্রভু চললেন শ্রীক্ষেত্রের দিকে। তিনক্রোশ পথ, মনে হচ্ছে যেন সহস্র যোজন। সোনার অঙ্গ কখনো ধুলোয় ধূসর হচ্ছে, কখনো বা চোখের জলে ধুলো ধুয়ে গিয়ে ফুটে উঠছে গৌরকান্তি। শরীরে কোনো অস্থি আছে বলে মনে হচ্ছে না। পথে যে দেখে, সেই বলে এ কে নওলকিশোর! কিশোর নারায়ণ!

প্রেমাবেশে পথ চলেছেন, আঠারনালায় এসে বাহ্যজ্ঞানের প্রকাশ হল। নিতাইয়ের দিকে হাত বাড়ালেন প্রভু। বললেন, 'আমার দণ্ড দাও।'

নিতাই চুপ করে রইল।

'সে কি, আমার দণ্ড কোথায়?' প্রভু কি ঈষৎ রুষ্ট হলেন?

'সে দণ্ড ভেঙে গিয়েছে। তিনখণ্ড হয়ে গিয়েছে।'

'সে কি! কী করে ভাঙল?'

'প্রেমাবেশে ভেঙে গিয়েছে।' গাঢ়স্বর নিতাইয়ের। 'তোমার

আবেশ হলে আমি তোমাকে ধরলুম। জড়াজড়ি করে পড়লুম একসঙ্গে—সেই দণ্ডের উপর। আর দুজনের দণ্ড তিন-টুকরো হয়ে গেল। টুকরোগুলো যে কোথায় গেল, কিছুই জানি না।'

তা হলে দণ্ড কি নিতাই স্বহস্তে স্বেচ্ছায় ভাঙেনি? সে কি মিথ্যে কথা বলছে?

আসলে প্রেমাবেশই দণ্ডভঙ্গের মুখ্য কারণ। নিতাই উপলক্ষ্য মাত্র। যার প্রেমাবেশ হয়েছে তার আবার দণ্ড কিসের? প্রেমাবেশেই ভেসে যাবে দণ্ড। দণ্ডের কথা যে এতক্ষণ ভুলে ছিলেন প্রভু, তার মূলেও সেই প্রেমাবেশ। প্রেমাবেশের কাছে দণ্ড অনাবশ্যক। আর যা অনাবশ্যক, তা থাকলেও যা, ভাঙলেও তা। কেন তবে নিষ্ফল ভারবহন?

আর, তাকিয়ে দেখ, নিমাইয়ে নিতাইয়ে জড়াজড়ি। নিমাইয়ের উচ্ছ্বাসে নিতাইয়ের উত্থম, নিমাইয়ের আবেশেই নিতাইয়ের আবেগ – দণ্ড আর দাঁড়ায় কোথায়?

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'নীলাচলে এনে তোমরা আমার খুব হিত করলে! আর সব গেছে, মাত্র দণ্ডধন ছিল, তাও কেড়ে নিলে, ভেঙে ফেললে। যাও, তোমাদের সঙ্গে আর আমি যাব না। জগন্নাথ দর্শনে হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।'

পুরীর কাছাকাছি নদীর উপর যে পোল আছে, তার নামই আঠারনালা। নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথের মন্দির আর দূরে নয়। কিন্তু প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন, একাকী যাবেন, হয় আগে নয় পরে।

মুকুন্দ দত্ত বললে, 'প্রভু, তুমিই আগে যাও, আমরা সকলে পরে যাব।'

এইটুকুই বুঝি রহস্য। একা না গেলে বুঝি সার্বভৌম উদ্ধার হয় না।

প্রভুর ইচ্ছাতেই দণ্ড ভাঙল, তা হলে প্রভুর ক্রোধ কেন?

জীবশিক্ষার জন্যেই এই ক্রোধ। প্রাকৃতজন যেন সন্ন্যাসাশ্রমে থেকে দণ্ড না ভাঙে। নিয়ম না অমান্য করে।

ক্রোধ উপলক্ষ্য করে ভক্তদের পিছনে রেখে প্রভু ছুটলেন তীরবেগে। ছুটলেন মন্দিরের দিকে। 'মত্ত সিংহগতি জিনি চলিলা সত্বর। প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর॥' কে তাঁকে রোধ করে! একেবারে জগন্নাথের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ইচ্ছে হল জগন্নাথকে আলিঙ্গন করি। হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় করে ধরে রাখি।

ধর ধর মার মার—মন্দিরের প্রহরীরা কোলাহল করে উঠল।

প্রেমাবেশে প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

'সরে দাঁড়াও। মেরো না।' কে গর্জন করে উঠল সহসা।

প্রহরীরা নিরস্ত হল। এ যে সার্বভৌম বারণ করছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত শুধু নয়, একাধারে গুরু, মন্ত্রী, মীমাংসক। তার কথা না শোনা অর্থ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা।

নাম বাসুদেব, উপাধি সার্বভৌম। নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, সর্বশাস্ত্রে, বিশেষ করে ন্যায়ে ও বেদান্তে সুপণ্ডিত। লোকে বলে, বাঙলা দেশে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না, বাসুদেব পড়তে গিয়েছিল মিথিলায়। পাঠশেষে ইচ্ছে হল ন্যায়শাস্ত্র নকল করে দেশে নিয়ে আসে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তাতে বাধা দেয়। ন্যায় মিথিলা থেকে বেরিয়ে গেলে যেন মিথিলার গৌরব ম্লান হয়ে যাবে। তখন বাসুদেব সমগ্র ন্যায় কণ্ঠস্থ করে নিল। আর নকল করার দরকার হল না।

মায়াবাদে বিশ্বাসী বাসুদেব, অদ্বৈত বেদান্তে পারঙ্গম। ন্যায়ের অধ্যাপনা তো করেই, সন্ন্যাসীদের বেদও পড়ায়। কুতর্ককর্কশ —ভক্তিবাদের ধার ধরে না, তর্কে ভক্তিবাদের নিরসন করে।

কিন্তু এ কী, এ কে অপরূপ পুরুষ? এত সৌন্দর্য, এত প্রেমবিকার আগে কখনো দেখেনি সার্বভৌম। পাছে কেউ নির্যাতন করে, সার্বভৌম প্রভুকে আবরণ করে দাঁড়াল। কিন্তু

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল না। এদিকে জগন্নাথের ভোগের সময় উপস্থিত। মন্দির তাই বন্ধ হবে এখুনি।

তবে উপায়?

সার্বভৌম বললে, 'এঁকে আমার বাড়িতে বয়ে নিয়ে চলো।'

মন্দিরের ছড়িদাররা অবাক। এ অপরাধীকে আবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কেন? একে আবার কিসের আপ্যায়ন?

সার্বভৌম বললে, 'ইনি মহাপুরুষ। দেখেই বুঝতে পারছি কৃষ্ণমহাপ্রেমের সমস্ত সাত্ত্বিকভাব এঁর দেহে পরিস্ফুট।'

ভক্তিবাদের বিরোধী হলেও কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ কী তা সার্বভৌমের জানা ছিল। সন্দেহ নেই—এ নবীন সন্ন্যাসী নিত্যসিদ্ধ, তার মধ্যে উদ্দীপ্ত ভাবের প্রকাশ যা একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেয়সীদের বৈশিষ্ট্য। সেই মহাভাব এই মর্ত মানুষের মধ্যে সম্ভব কী করে?

প্রভুকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এল সার্বভৌম। পবিত্র স্থানে ও আসনে শুইয়ে দিল। কিন্তু প্রভুর শ্বাস নেই স্পন্দন নেই, আয়ত নয়ন আধবোজা। নাকের কাছে তুলো ধরে দেখল, না, তুলো অল্প-অল্প নড়ছে। ক্ষীণ হলেও শ্বাস আছে, একেবারে নিঃশেষ হয়নি। সন্দেহ নেই, এ প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ।

কিন্তু কতক্ষণে ফিরে আসবে বাহ্যজ্ঞান? শিয়রে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সার্বভৌম। দেহলক্ষণ নিরীক্ষণ করতে লাগল।

এদিকে নয়নের অদর্শন হতেই অনুগামী ভক্তের দল ছুটল মন্দিরের দিকে। দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে ব্যাকুলস্বরে জিগগেস করল, —একজন নবীন সন্ন্যাসীকে এদিকে আসতে দেখেছ?

মন্দিরে পৌঁছেও জগন্নাথদর্শনের কথা তাদের মনে নেই। আগে প্রভু, পরে বিগ্রহ।

'দেখেছি।'

'দেখেছ?'

'হ্যাঁ, মন্দিরে ঢুকেই চেয়েছিল জগন্নাথকে কোলে নিতে। মূর্ছিত

হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। সার্বভৌম ভটচাজ তখন মন্দিরে ছিলেন, সন্নেসীর জ্ঞান হয় না দেখে তাকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন।'

চলো যাই, কে সে সার্বভৌম, তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করি।

এমন সময় সেখানে গোপীনাথ আচার্যের আবির্ভাব।

নবদ্বীপের লোক, মুকুন্দর সঙ্গে আগে থেকে জানাশোনা। একি, তুমি কোত্থেকে? মুকুন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরল গোপীনাথ।

নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মুকুন্দ বললে, 'গোপীনাথ, বিশারদের জামাই, তার মানে সার্বভৌমের ভগ্নীপতি।'

'ও সব পরের কথা। এখন বলো প্রভু কোথায়?' গোপীনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'তোমাদের বলা হয়নি,' মুকুন্দ বললে, 'গোপীনাথ প্রভুর ভক্ত। শুধু ভক্ত নয়, তত্ত্বজ্ঞ।'

'তবে আর চিন্তা নেই, উনি নিশ্চয়ই সার্বভৌমের বাড়ি জানেন।' বললে নিতাই, 'এখানে লোকমুখে শুনে অনুমান করছি প্রভু সার্বভৌমের বাড়িতে আছেন। সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন।'

গোপীনাথ নিয়ে গেল সবাইকে। তাদেরকে বাইরে রেখে দ্রুতপায়ে ঢুকল অন্তঃপুরে। ধূলিধূসর দেহে অচেতন হয়ে দীনবেশে শুয়ে আছেন গৌরহরি। মুখ দেখে সুখ হল বটে, কিন্তু অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হল। কতক্ষণে না-জানি ফিরে আসবে বাহ্যজ্ঞান!

সার্বভৌমকে বললে, 'এ সন্ন্যাসীর সঙ্গের লোকেরা এসেছে। অপেক্ষা করছে বাইরে।'

'নিয়ে এস ভিতরে।'

ভিতরে এসে প্রভুকে দেখে ভক্তবৃন্দ আশ্বস্ত হল। সার্বভৌম প্রভুকে সেবা-যত্ন ঠিকই করছে। খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই, প্রভুর এই ধ্যানমূর্ছা দীর্ঘস্থায়ীই হয়ে থাকে।

নিত্যানন্দকে প্রণাম করল সার্বভৌম। শুনল তাদের এখনো

জগন্নাথদর্শন হয়নি। পুত্র চন্দনেশ্বরকে বললে, 'এঁদেরকে দর্শন করিয়ে নিয়ে এস।'

মন্দিরে নিয়ে এসে চন্দনেশ্বর বললে, 'স্থির হয়ে দেখবেন জগন্নাথকে। আপনাদের আরেক গোসাঁই তো মাথা ঘুরে আছাড় খেয়ে পড়লেন—'

হাসতে লাগল ভক্তদল। 'আমাদের জন্যে চিন্তা নেই।'

প্রকট পরমানন্দ জগন্নাথকে দেখে আবেশ লাগল সকলের। কাঁদতে লাগল নিত্যানন্দ। মন্দিরের সেবক সকলকে মালা-প্রসাদ এনে দিল। প্রসাদে প্রসন্ন হল সকলে।

চলো এবার তবে মহাপ্রভুর কাছে ফিরে যাই।

গিয়ে দেখল নবদ্বীপচন্দ্র তখনো সমাহিত। সার্বভৌম ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় বসে আছে পদতলে। ভক্তদল গৌরহরিকে ঘিরে বসে উচ্চস্বরে নামকীর্তন সুরু করল। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতনা ফিরে এল, হরি-হরি বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে বসলেন। স্থির হয়ে জিগগেস করলেন নিতাইকে, 'এখানে আমি কী করে এলাম?'

নিতাই বললে, 'জগন্নাথ দেখামাত্র তুমি আনন্দ-আবেশে মূর্ছা গেলে। মন্দিরে সার্বভৌম উপস্থিত ছিল, সে তোমাকে তার ভবনে নিয়ে এসেছে।'

'জগন্নাথকে দেখামাত্রই ইচ্ছে হল তাকে বুকে করি, উন্মত্তের মত বাহু বাড়িয়ে ছুটলাম তাকে ধরতে। তারপর কী হল আর মনে নেই।' বললেন মহাপ্রভু।

'জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ-মাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥'

'দৈবে সেখানে সার্বভৌম ছিল', নিতাই তাকাল সার্বভৌমের দিকে, 'সে তোমাকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করেছে।'

'জগন্নাথের কী কৃপা!' বললেন গৌরহরি, 'সার্বভৌমের সঙ্গে আমার মিলন ঘটাল।'

সার্বভৌম কাছে এল। 'নমো নারায়ণ' বলে প্রণাম করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু।'

মতি থেকেই রতি জাগবে। আর আগুন যে আধারে থাকে তাকেও যেমন উত্তপ্ত করে, তেমনি আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতি যে ভক্তে থাকে, তাকেও আনন্দিত করে রাখে। এমন আনন্দ যে বিচ্ছেদেও কৃষ্ণস্ফূর্তি।

ব্রজাঙ্গনার রতি স্বভাবজা, রাধিকার স্বরূপজা। অনাদিসিদ্ধা। এ রতির উৎপাদক কোনো হেতু নেই। তবে বাহ্যবস্তু কিছু আছে যা এ রতিকে উদ্দীপিত করে। যেমন শব্দ, বেণুশব্দ; স্পর্শ, অঙ্গস্পর্শ; যেমন দর্শন, রূপদর্শন। যেমন বা রসাস্বাদন, কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল খেয়ে রাধিকার দেহে সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব। যেমন বা সম্বন্ধ-চিন্তন। কার এমন সৌন্দর্য মাধুর্য গাম্ভীর্য বৈদগ্ধ্য, শৌর্য বীর্য সৌশীল্য? কার এমন লোকোত্তর চরিত্র? এমন জগৎচমৎকৃতিকরী লীলাই বা কার। এ সব দেখে শুনে ভেবে চিন্তে কোন রমণী থাকবে ধৈর্য ধরে?

সার্বভৌম বললে, 'এখানেই আপনাদের আজ মধ্যাহ্নকৃত্য হবে। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আমি আজ ভিক্ষে দেব।'

স্বগণদের নিয়ে প্রভু গেলেন সমুদ্রস্নানে।

স্নানান্তে বসলেন ভোজনে। সোনার থালায় সার্বভৌম পরিবেশন করতে লাগল।

'এত পিঠা-পানা আমি খেতে পারব না।' বললেন মহাপ্রভু, 'এসব আমার সঙ্গীদের দাও। আমাকে কিছু লাফরা তরকারি দিলেই চলবে।'

'তা কী করে হয়?' আপত্তি করল সার্বভৌম। 'এ সমস্তই

জগন্নাথকে নিবেদন করা হয়েছে। আপনি আস্বাদ করে দেখুন জগন্নাথের রোচনীয় হবে কি না।'

একে একে সমস্ত রান্না খাওয়াল প্রভুকে।

ভোজনান্তে গোপীনাথকে জিগগেস করল, 'এ কে? কৃষ্ণে মতিরস্তু শুনে মনে হচ্ছে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, কৃষ্ণভক্ত। এর পূর্বাশ্রম কোথায়?'

'নবদ্বীপে।' বললে গোপীনাথ, 'জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। নীলাম্বর তোমার বাবার সহপাঠী ছিলেন—'

তবে আর কথা কী। যিনি এসেছেন তিনি সার্বভৌমের নিজ জন। আত্মার আত্মীয়।

'সহজেই তুমি আমার পূজ্য।' গৌরহরিকে বললে সার্বভৌম, 'আর যেহেতু তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ, আমি তোমার দাস ছাড়া কিছু নই।'

গৌরহরি বিষ্ণু স্মরণ করলেন। বললেন, 'সে কী বলছেন? আপনি জগদ্‌গুরু, সর্বলোকের হিতকর্তা। সন্ন্যাসীদেরও বেদান্ত পড়ান আপনি। আমিও সন্ন্যাসী, বালক সন্ন্যাসী, সুতরাং আপনি আমারও গুরু। আপনার সঙ্গ পাবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। মন্দিরে আজ যা বিপদে পড়েছিলাম, আপনি না থাকলে আর নিস্তার ছিল না।'

'তুমি আর একা-একা যেওনা মন্দিরে।' সার্বভৌম সাবধান করে দিল : 'হয় আমাকে সঙ্গে নিও, নচেৎ আমাকে বোলো, আমি লোক দিয়ে দেব।'

'না, আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাব না, গরুড়স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে দর্শন করব।' প্রভু আশ্বস্ত করলেন।

সার্বভৌম গোপীনাথকে বললে, 'দর্শনকালে প্রভুর সঙ্গী হবে।' আরো বললে, 'আমার মামীর বাড়িটি নির্জন, সেখানে ওর থাকবার বন্দোবস্ত করো। যা প্রয়োজন সব যোগাড় করে দাও।'

প্রভু ও তাঁর সঙ্গীরা সার্বভৌমের মামীর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গোপীনাথ একদিন প্রভুকে শয্যোত্থান দর্শন করিয়ে আনল। জগন্নাথ যখন প্রথম শয্যা থেকে উঠছে, সেই সময়কার দর্শন।

মুকুন্দ দত্ত নিয়ে এল সার্বভৌমের কাছে।

'এ সন্ন্যাসী প্রকৃতি-বিনীত, দেখতে সুপুরুষ। এঁর উপর আমার প্রীতি ক্রমশই বাড়ছে, বেড়ে চলেছে। কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ইনি? এর নাম কী?' গোপীনাথকে লক্ষ্য করল সার্বভৌম।

গোপীনাথ বললে, 'এঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গুরু কেশব ভারতী।'

'নামটি সর্বোত্তম হয়েছে।' বললে সার্বভৌম, 'কিন্তু সম্প্রদায়টা মধ্যমশ্রেণীর।'

'কিন্তু প্রভুর সে বাহ্যাপেক্ষা নেই।' বললে গোপীনাথ, 'কোন সম্প্রদায় ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা মানী বা অমানী, এ সব বিচার করবার অবকাশ ছিল না। কোনো প্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায় নিয়ে মাথা ঘামাননি। মিথ্যে গৌরবের প্রতি মোহ নেই এক বিন্দু।'

'কিন্তু এর তো এখন পূর্ণ যৌবন।' সার্বভৌম চিন্তান্বিত মুখে বললে, 'এ সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করবে কী করে? চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে কী করে শাসনে রাখবে? তবে এক কাজ করি। ওকে নিরন্তর বেদান্ত পড়াই, বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে নিয়ে যাই।'

অদ্বৈতমার্গ শঙ্করাচার্যের সাধনপথ। কী বলে অদ্বৈতমার্গ? বলে—জীবে ব্রহ্মে ভেদ নেই। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম, তেমনি ব্রহ্মের বদলে ভুল করে জগৎ প্রপঞ্চকে দেখছি। ব্রহ্মই বস্তুরূপে প্রতিভাত। আর কী বলে? বলে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তার কোনো আকার নেই, শক্তি নেই, গুণ নেই, শুধু সে এক বৈচিত্র্যহীন আনন্দসত্তা। আর এই ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যপ্রাপ্তিই অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য।

আর বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গ অর্থ, যে অদ্বৈতমার্গে বৈরাগ্যের সুরটি সবলে উচ্চারিত।

'আর যদি উনি অনুমতি করেন', বললে সার্বভৌম, 'ওকে দিয়ে নতুন করে উত্তম সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস নেওয়াই।'

কথা শুনে গোপীনাথ ও মুকুন্দ দুজনেই বিমর্ষ হল। সার্বভৌম বোধ হয় মনে করেছে—এ একজন সামান্য সন্ন্যাসী, বিচার-বিবেচনা না করেই সন্ন্যাস নিয়ে ফেলেছে। সম্প্রদায়ের তাৎপর্যের ধার ধারেনি।

তখন গোপীনাথ গর্জন করে উঠল : 'ভটচাজ, তুমি এঁর মহিমা কিছুই জানো না, বোঝওনি কিছু। ইনিই ভগবত্তার শেষ সীমা, চরম বিকাশ। ইনিই স্বয়ং ভগবান। তা এ কথা অজ্ঞ লোকে বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞজনেই পারবে অনুভব করতে।'

'কিন্তু কেন?' সার্বভৌমের শিষ্যের দল কোলাহল করে উঠল : 'কেন ওঁকে ঈশ্বর বলবে? প্রমাণ কী?'

'যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁদের অনুভবই প্রমাণ।' বললে গোপীনাথ, 'তাঁরা সাধন দ্বারা অনুভব করেছেন কী ঈশ্বর-লক্ষণ।'

'তার অর্থ, অনুমান করে ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপন করো!' শিষ্যের দল বললে, 'ঘট দেখে যখন কুম্ভকারকে অনুমান করি, তেমনি জগৎ সংসার দেখে এর এক সৃষ্টিকর্তাকে অনুমান করব?'

'এই অনুমানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হয়তো বা নির্ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু অনুমানে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরতত্ত্বকে জানা যায় না।' গোপীনাথ বললে, 'অনুমানে নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানেই ঈশ্বরতত্ত্ব গোচরীভূত। কিন্তু যাই বলো, ঈশ্বরের কৃপা না হলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব।'

'শিষ্য কহে—ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য কহে—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
অনুমান প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহো নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥'

যে দুটি চরণকমলের প্রসাদলেশ পেয়েছে, সেই জানতে পারে ঈশ্বরমহিমার স্বরূপ। সেই তো তাঁকে দেখতে পারে চোখ দিয়ে, শুনতে পারে কান দিয়ে, ছুঁতে পারে হাত দিয়ে। নচেৎ একাকী থেকে শুধু যোগাভ্যাসে বা শাস্ত্রালোচনায় বা বিচিত্র বিচারে বা অনুসন্ধানে তাঁর কিছুই নির্ণয় হয় না।

সার্বভৌমকে লক্ষ্য করে গোপীনাথ বললে, 'তুমি শাস্ত্রবেত্তা হতে পারো, কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরের কৃপালেশ নেই, তাই সাধ্য কি তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝো। তোমার শাস্ত্রই তো বলে, শুধু পাণ্ডিত্যে বোঝা যায় না ঈশ্বরতত্ত্ব।'

'কিন্তু তোমাতে তাঁর কৃপা হয়েছে, তারই বা প্রমাণ কী?' সার্বভৌম রুক্ষস্বরে বললে।

'প্রমাণ, আমি বস্তুকে বস্তু বলে জেনেছি। আর তুমি এঁর শরীরে মহাপ্রেমাবেশ দেখেও চিনতে পারছ না। তুমিই বলো, এ মহাপ্রেমাবেশ কি ঈশ্বরলক্ষণ নয়? তাই তো বলি, আমাতে কৃপা আছে, তোমাতে নেই। তোমাতে শুধু মায়া, তুমি মায়াচ্ছন্ন।'

হাসল সার্বভৌম। বললে, 'রুষ্ট হয়ো না। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে কথা বলি। তত্ত্বনির্ণয়ের অনুরোধে বিচার-বিতর্ক করতে ভালোবাসি। আমার বক্তব্য আমাকে বলতে দাও।'

'বলো।'

'শাস্ত্রে আছে, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নেই। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগেই তাঁর অবতার হয়, তাই তো বিষ্ণুর নাম ত্রিযুগ। সুতরাং তোমার ঐ শ্রীচৈতন্য অবতার হতে পারেন না।' সার্বভৌম গম্ভীর হল: 'তবে তিনি যে মহাভাগবত, তাতে সন্দেহ নেই।'

'তোমার দেখি অভিমানের শেষ নেই। মহাভারত ও ভাগবত—এই দুই মহাশাস্ত্রের কথা কি ভুলে গিয়েছ? তারা বলছে, কলিতে লীলাবতার না হতে পারে, কিন্তু যুগাবতার হতে বাধা নেই। কিন্তু

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যুগাবতার নন, তিনি স্বয়ং ভগবান।' গোপীনাথ বিরক্তমুখে বললে, 'তোমাকে কী বোঝাব, উষর ভূমিতে বীজ বপন নিষ্ফল। যখন তোমার উপর তাঁর কৃপা হবে, তখন বুঝবে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কি না।'

হাসতে লাগল সার্বভৌম।

ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং নরং॥' যার কামনা নেই, যার আবার সকল কামনাই বর্তমান, কিংবা যে উদারবুদ্ধি মোক্ষকামী, সকলেই একান্ত ভক্তিতে পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করবে। অন্যথা সমস্ত বিফল।

সূর্য প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হয়ে মানুষের পরমায়ু বৃথা হরণ করছে। যার জীবন হরিগুণকীর্তনে কেটে যায় তারই আয়ু ফলান্বিত। পাদপেরও তো জীবন আছে। ভস্ত্রাও তো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া করে। গ্রাম্য পশুরাও তো আহার-বিহারে অভ্যস্ত। কিন্তু হরিনাম যার কর্ণপথে কখনো প্রবেশ করেনি সে পশু ছাড়া আর কী। যে কখনো হরিকথা শোনেনি তার শ্রোত্রদ্বয় বিবরমাত্র। যে জিহ্বা হরিগুণগানে বিরত তা ভেকজিহ্বা। যে মাথা মুকুন্দের পদারবিন্দে প্রণত নয়, তা পট্টবস্ত্রে বা কিরীটে সুশোভিত হলেও দেহের বৃথা ভার মাত্র। যে হাত হরিচরণে কুসুমাঞ্জলি দেয় না তা কাঞ্চনবলয়ে ভূষিত হলেও মৃত মানুষের হাতের মতই অসার। যে চোখ হরির রূপ দেখে না তা ময়ূরপাখায় আঁকা চোখের মতই অনর্থক। চরণ থাকতেও যে হরিক্ষেত্রে যায় না সে তো নিশ্চল বৃক্ষমূল। আর যে হরিপাদলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণ না নেয় তার শ্বাস থাকলেও সে শব-স্বরূপ। আর পাষাণতুল্য কঠিন তার হৃদয় যার হরিনামে ভক্তি-বিকার জন্মে না আর বিকার জন্মালেও নয়নে অশ্রু আসে না আর অঙ্গে লাগে না রোমহর্ষ।

ভক্তিমার্গই সমীচীন মঙ্গলদায়ক। একমাত্র অকুতোভয়।



৪৩

প্রভু সার্বভৌমের মন্তব্য শুনলেন। তাঁর নামটি ভালো, কিন্তু সম্প্রদায় ভালো নয়। বয়স অল্প, ইন্দ্রিয়দমন অসাধ্য! ভালো একজন সন্ন্যাসী ডাকিয়ে নতুন করে তাঁর সংস্কার করে নেবে। শুধু তাই নয়, সার্বভৌম নিজে ক্লেশ করে তাঁকে বেদ পড়াবেন, ঢুকিয়ে দেবেন অদ্বৈতমার্গে।

প্রভু খুব খুশি, বললেন, 'ভট্টাচার্যের অসীম অনুগ্রহ।'

'অনুগ্রহ?' রেগে উঠল মুকুন্দ। 'অবজ্ঞা—এ অবজ্ঞা ছাড়া কিছু নয়।'

'না, না, অবজ্ঞা কেন হবে? ভট্টাচার্য আমার মঙ্গল চান, আমার সন্ন্যাস-রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এই করুণা।'

মন্দিরে প্রভুকে নিয়ে এল সার্বভৌম। বললে, 'তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সর্বদা বেদান্ত পড়বে, বেদান্ত শুনবে। তাই সন্ন্যাসীর বিধি, সন্ন্যাসীর ধর্ম।'

'আপনি যা বলবেন, তাই হবে। তাই করব।' বিনয়ে বললেন গৌরহরি।

সার্বভৌম বেদান্ত পড়াতে বসল।

ছাত্র কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। তদ্গত-তন্ময়। কথাটি কইছে না।

সাত-সাত দিন পড়ানো হচ্ছে, একটিও কথা নেই ছাত্রের মুখে। সামান্য একটা প্রশ্নও নয়। সন্ন্যাসী কি তবে বদ্ধ পাগল, না, নির্বোধ? ভালো-মন্দ কিছুই তবে বলছে না কেন? তবে কি দাম্ভিক? তাও তো মনে হবার নয়। অমন নম্র ও লাজুক ছাত্র দেখা যায় না।

'সাত দিন ধরে পড়ছ, হাঁ-না কিছুই বলছ না কেন?' প্রায় বিরক্ত হয়েই জিগগেস করল সার্বভৌম। 'বুঝছ কি বুঝছ না, অন্তত সেটুকু বুঝতে দেবে তো?'

'আমার শোনবার কথা, আমি শুনে যাচ্ছি।' বললেন গৌরহরি।

'আর আমি যে ব্যাখ্যা করছি, সঙ্গে-সঙ্গে তা বুঝছ?'

'আমি মূর্খ, আমার পড়াশোনাও কিছু নেই, তাই বুঝছি না কিছুই।'

'না বুঝলে জিগগেস করতে হয় তো?' ভট্টাচার্য মুখ-চোখ রুক্ষ করে উঠলেন: 'চুপচাপ বসে থাকলে চলে কী করে?'

বিনম্র মুখে প্রভু বললেন, 'বেদান্তসূত্রের অর্থ তো নির্মল, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যাই মেঘাচ্ছন্ন।'

বলে কী সন্ন্যাসী? নিশ্চল পাথর হয়ে গেল সার্বভৌম।

'সূত্রের অর্থ স্পষ্ট, কিন্তু শঙ্করাচার্য কল্পনাবলে অন্যরকম ভাষ্য করেছেন, আর আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যের অনুযায়ী।' নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন গৌরহরি। 'যতক্ষণ শঙ্করভাষ্য থাকবে, ততক্ষণ ঠিক-ঠিক অর্থবোধ হবে না।'

শঙ্করভাষ্যে বলা হয়েছে, একমাত্র নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মই শ্রুতিসিদ্ধ। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, সর্বোপাধিবর্জিত। আর এই ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র জ্ঞানগম্য। সুতরাং ভক্তি-উপাসনা অর্থহীন।

এ একরকমের নাস্তিক্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই মতের পরিপোষক।

খণ্ডন করতে বসলেন গৌরহরি।

ব্রহ্ম-র অর্থ কী? যিনি বড়, বৃহদ্‌বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম। আবার যিনি অন্যকে বড় করেন, তিনিও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তি বর্ত্তমান, শক্তি না থাকলে বড় করেন কী করে? সুতরাং ব্রহ্ম শক্তিমান। আবার যিনি বড়, তিনি সব বিষয়ে বড়, তিনি সর্ববৃহত্তম। আর

বৃহত্তমতা গুণ ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং তিনি সগুণ, সবিশেষ। আর সবিশেষ হলেই সাকার। শক্তি আছে বলেই তাঁর বৈভব আছে, প্রকাশবৈচিত্রী আছে, আর এই প্রকাশবৈচিত্রীই তাঁর ঐশ্বর্য। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ ভগবান। 'সর্বৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান?'

শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরাকার বলেও ধরে রাখতে পারেনি নিরাকারে। ব্রহ্মের হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই বলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলেছে, তিনি গ্রহণ করেন, তিনি চলেন, তিনি দেখেন। হাত না থাকলে ধরেন কী করে? পা না থাকলে চলেন কী করে? নিরিন্দ্রিয় হলে ইন্দ্রিয়েব কাজ থাকে কেন? আরো দেখুন। বলছে, এই আত্মা বহু অধ্যয়নে পাওয়া যায় না, না বা মেধায়, না বা বহুবেদ-শ্রবণে, এই আত্মা যাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, একমাত্র তারই কাছে ইনি স্বীয় তনু বা স্বরূপকে প্রকাশ্ করেন। তা হলে আত্মার তনু আছে, মানে শরীর আছে। যদি তিনি অশরীরী, তবে আবার তিনি সতনু হন কী করে? এর সমাধান কী? এর সমাধান হচ্ছে এই ব্রহ্মেব প্রাকৃত শরীর নেই, প্রাকৃত আকার নেই, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নেই। ব্রহ্মেব দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিন্ময়, অপ্রাকৃত। 'তাঁহার বিভূতি দেহ—সব চিদাকার।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত, অনন্তগুণসমন্বিত ও পূর্ণানন্দঘনমূর্ত্তি।

শঙ্কর যে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলতে চেয়েছে, তাতে তার দোষ নেই, কেননা, ভগবানের আদেশেই সে ও-রকম অর্থ করেছে। কিন্তু তাই বলে তুমি যেন ভগবানের নিন্দা শুনো না। তুমি যেন বোলো না ভগবানের ঐশ্বর্য নেই, ধাম নেই, লীলা নেই, লীলাপরিকর নেই। তাঁর বিগ্রহও সচ্চিদানন্দাকার। ঈশ্বরের অপ্রাকৃত দেহ বা বিগ্রহ যে না মানে, সে দর্শন-স্পর্শনের অযোগ্য। ভগবানের নিন্দা শুনলে যে স্থানত্যাগ করে উঠে না যায়, সে তার সমস্ত সুকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়।

ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। বলতে পারো, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম হয়, তবে তো ঈশ্বর বিকারী হলেন। না, নিজের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন। স্যমন্তক-মণি সোনার ভার প্রসব করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার ক্ষয় বা বিকার ঘটে না। জগৎ ভ্রম নয়, মিথ্যা নয়, শুধু জীবদেহে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যা। অদ্বৈতবাদীরা যে ভ্রম বলে, সেটাই ভ্রম। যা চোখের সামনে, চারদিকে দেখছি, তার অস্তিত্ব আদৌ নেই, এ হতে পারে না। অস্তিত্ব আছে, তবে এ নশ্বর, বিনাশশীল। অস্তিত্বই যদি না থাকে, তবে সৃষ্টি কী, ধ্বংসই বা কার?

প্রণবই ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ব্রহ্মঃ। পরিদৃশ্যমান জগৎই ওঙ্কার। ওঙ্কারই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপক। যেহেতু প্রণব ব্রহ্মের স্বরূপ, সমস্ত বিশ্ব প্রণবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রণবই বৃহত্তম বাক্য, আর সকল বাক্য প্রণবের চেয়ে ক্ষুদ্র। অথচ অদ্বৈতবাদী বলে, 'তত্ত্বমসি'-ই মহাবাক্য। প্রণব তো ঈশ্বরকেও বোঝায়, কিন্তু তত্ত্বমসি তা বোঝায় না। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' প্রণবের চেয়ে ছোট। তত্ত্বমসি তাই মহাবাক্য হতে পারে না। অংশ কি কখনো পূর্ণের চেয়ে বড় হয়?

তত্ত্বমসি-র মানে কী? শঙ্কর জীবে-ব্রহ্মে অভেদ করতে চেয়েছিল, তাই সে মনে করেছে, তুমি জীব, তুমিই সেই ব্রহ্ম। কিন্তু ও-কথার আরেক অর্থও বিধেয়। শোনো। তস্য ত্বম্—তত্ত্বম্। অর্থাৎ তাঁর তুমি। আর অসি অর্থ হও। সর্বসাকুল্যে অর্থ হচ্ছে, হে জীব, তুমি ব্রহ্মের হও। তুমি ব্রহ্মের আছ। তুমি ব্রহ্ম নও, তুমি ব্রহ্মের একজন। তুমি তাঁর দাস, দাসানুদাস। আর এ অর্থই ভক্তি-মার্গের।

এতক্ষণে তবে এসে গেল ভক্তির কথা। সম্বন্ধ বা প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভগবান, অভিধেয় বা জীবের কর্তব্য হল সাধন-ভক্তি, আর প্রয়োজন হল ভগবৎপ্রেম। এই সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন—তিন বস্তুই বেদের বর্ণনীয় ব্যাপার।

কী রকম ভগবান? মধুর, মধুর, মধুর হতে মধুর—এর বেশি আর কে কী বলতে পারে? আর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। আর, ভক্তের প্রীতি-রস-আস্বাদনেই ভগবান আনন্দিত। সাযুজ্য-মুক্তিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মে আনন্দ কই? সেখানে কোথায় তাঁর প্রেমবশ্যতার অবকাশ? কোথায় মাধুর্যের তরঙ্গ-লীলা?

কী রকম অভিধেয়? অভীষ্টকে পাবার জন্যে যে উপায়, তাই অভিধেয়। ভগবানকে কী করে জানা যায়, কী করে দেখা যায়? ভগবানকে জানলে আর ভয় থাকে না। সমস্ত পাশ-ক্লেশ নষ্ট হয়, জন্ম-মৃত্যুতে ছেদ পড়ে। আর দেখলেও তাই। হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরে যায়, কর্মের ক্ষয় হয়ে সংসার-গতাগতির উপশম ঘটে। কিন্তু উপায় কোথায়? উপায় উপাসনায়।

যোগমার্গে সকলের অধিকার নেই। যে মনকে বশীভূত করতে পারে, সেই যোগের যোগ্য। যোগের জন্যে শুচি দেশ ও সুখাসনের দরকার। যোগ তাই অন্য-নিরপেক্ষ নয়। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই। জ্ঞানও ফলবন্ত হতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে। জ্ঞানও অধিকারভেদের প্রশ্ন তোলে। শুধু শুদ্ধচিত্ত লোকই জ্ঞান-সাধনের অধিকারী।

সুতরাং যোগ বা জ্ঞান অভিধেয় হলেও, শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নয়।

শ্রেষ্ঠ অভিধেয় ভক্তি। ভক্তি স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ। সার্বত্রিক। সমস্ত অবস্থায়, সমস্ত স্থানে, সমস্ত সময়ে। সমস্ত নিয়ম-নিষেধের নাগালের বাইরে। ভক্তি সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

আর প্রয়োজন—কিসের প্রয়োজন?

যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে উপাসনা, তাই প্রয়োজন। উপাসনায় কী চাই? সংসারভয় থেকে, ত্রিতাপজ্বালার থেকে উদ্ধার চাই। কিন্তু কে উদ্ধার চায়, যদি সে বোঝে যে জন্ম-জন্ম হৃদয়ের মধু দিয়ে পরমমধুরের সেবা করতে পারবে? নৃসিংহকে কী বলেছিল প্রহ্লাদ?

বলেছিল, কর্মফলে আবার হাজার-হাজার জন্ম ঘুরে বেড়াতে হবে, কিন্তু যে-জন্মে যেখানেই থাকি না কেন, তোমাতে আমার ভক্তি যেন অবিচ্যুত থাকে। ইন্দ্রিয়ভোগবিষয়ে অবিবেকীর যেমন অবিচ্ছিন্ন প্রীতি, তেমনি আমার হৃদয়ে যেন তোমার প্রতি সে রকম রতি থাকে, আর সেই রতিতেই তোমাকে স্মরণ করি অহর্নিশ। রসস্বরূপকে পাওয়া অর্থই সেব্যরূপে পাওয়া। আর এই সেবা-বাসনাকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই উপাসনা। আর যখন সেবা থেকে আনন্দ, সেই আনন্দই প্রেম। প্রেমই পরম প্রয়োজন।

এই তিন বস্তু,—সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন ছাড়া আর যা-যা শঙ্করাচার্য বলেছে, সমস্তই কল্পনাবলে। শঙ্করাচার্য মহাদেবের অবতার। মহাদেব হয়ে শঙ্কর বেদের কল্পিত অর্থ কেন করবেন? ঈশ্বরের আদেশে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন শিবকে, তুমি আগমশাস্ত্রদ্বারা সকলকে আমার থেকে বিমুখ করো আর আমাকেও গোপন করে রাখো, যাতে সকলে বিষয়সুখে মত্ত হয়ে প্রজাবৃদ্ধিরই চেষ্টা করবে। 'আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥'

সমস্ত শুনে সার্বভৌম জড়বৎ নিশ্চল।

নির্বিশেষবাদ খণ্ডন হল। স্থাপন হল সবিশেষবাদ। সম্বন্ধ ভগবান, অভিধেয় ভক্তি, প্রয়োজন প্রেম, সাব্যস্ত হল নতুন তত্ত্ব। সার্বভৌমের মুখে কথা সরে না। একেই আমি কিনা অর্বাচীন বালক ভেবেছিলাম।

সার্বভৌমের বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করলেন গৌরহরি। বললেন, 'এতে বিস্ময়ের কী আছে? ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ।'

পুরুষার্থ চারটি। ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ। পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থই ভক্তি বা ভগবৎপ্রেম। এই প্রেম ব্রহ্মানন্দের চেয়েও লোভনীয়। এই প্রেম মহাধন। এই প্রেম কৃষ্ণের মাধুর্যরসের আস্বাদন করায়।

'প্রভু কহে—ভট্টাচার্য ! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম পুরুষার্থ হয় ॥'

যারা আত্মারাম অর্থাৎ যারা আত্মাতে রমণ করে, অর্থাৎ যারা মায়ামুক্ত, যারা নির্গ্রন্থ অর্থাৎ যারা অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য, তারাও শ্রীহরিতে অহেতুকী ভক্তি করে থাকে। জানবে এমনই শ্রীহরির গুণ।

'দয়া করে এই শ্লোকটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।' সার্বভৌম হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

কেন এই চাঞ্চল্য ? সার্বভৌমও কি ভক্তির কথা শুনতে চায় ?

প্রভু বললেন, 'তুমি আগে ব্যাখ্যা করো।'

বিবিধ রকম অর্থ করল সার্বভৌম।

'তুমি বৃহস্পতি'। বললেন প্রভু, 'এমন কেউ নেই তোমার মত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু তুমি নয় রকম অর্থ করলে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় ওদের বাইরে আরো অর্থ নিহিত আছে।'

আঠারো রকম অর্থ করলেন প্রভু। সার্বভৌমের নয় অর্থের একটা অর্থও না ছুঁয়ে।

এই নবীন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই মানুষ নয়। সার্বভৌমের চিত্তে দৈন্য উপস্থিত হল, ধুলো হয়ে গেল পাণ্ডিত্যের অভিমান। জাগল আত্মধিক্কার।

জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকলেও, হে নাথ, আমি জানি, আমি তোমারই অধীন। আমি তোমার থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছি কিন্তু তুমি আমার অধীন নও, তুমি আমার থেকে সঞ্জাত হওনি। তরঙ্গ ও তরঙ্গিত সমুদ্রে ভেদ না থাকলেও এ নিশ্চিত যে তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নয়।

অহঙ্কার ছাড়া আর কী আছে সন্ন্যাসে ? 'বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে। প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কারপাশে ॥' দণ্ড ধরেই নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবে, কোথাও হাত জোড় করে না। ভগবান অন্তর্যামীরূপে নিজ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট আছেন তবু ধর্মধ্বজী

সন্ন্যাসীরা তাদের প্রণাম করে না। জীবের স্বভাবধর্ম ঈশ্বরভজন, তা না করে নিজেকে নারায়ণ বলে মানে। গর্ভবাসে যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করলেন, যার প্রসাদে তার জ্ঞান বুদ্ধি হল, যার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় ঘটছে, সে আর কেউ নয়, সন্ন্যাসী নিজে। 'নিদ্রা হইলে আপনে কে ইহাও না জানে। আপনারে নারায়ণ বোলে হেন জনে॥' যে জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, তাকে যে ভক্তি করে সেই তো সুপুত্র। পুত্র কি নিজেই পিতা?

'তবে প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী কেন?'

আমি 'সন্ন্যাসী' নই, আমি কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ।

'প্রভু বোলে শুন সার্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র ঘুচাইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥'

প্রভুই কৃপা করলেন। সার্বভৌমের উপলব্ধি হল, এ সন্ন্যাসী কৃষ্ণ ছাড়া কেউ নন। পাণ্ডিত্যগর্বে প্রথমেই চিনতে পারিনি। আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম।

গর্ব নষ্ট হতেই সার্বভৌমের চিত্তে ভগবৎ-তত্ত্ব স্ফুরিত হল। দৃষ্টিতে লাগল দিব্যস্পর্শ।

দেখল, প্রভু তার সামনে ষড়ভুজমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন!

পদতলে লুটিয়ে পড়ল সার্বভৌম। তার হৃদয়ের উপর করুণাসমুদ্র প্রভু তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন। সার্বভৌমের সর্বদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। কাঁদতে লাগল দীনহীনের মত।

খবর পেয়ে ছুটে এল গোপীনাথ। কী ভীষণ কথা, সার্বভৌম নাচছে।

'সেই ভট্টাচার্যের এই গতি সম্ভব হল?' প্রভুকে লক্ষ্য করল

গোপীনাথ: 'সেই শুষ্কজ্ঞানী তার্কিক পণ্ডিত ভক্তিরসের ভাবুক বনে গিয়েছে!'

'সে একমাত্র তোমারই সঙ্গগুণে।' বললেন প্রভু, 'তুমি ভক্ত, তোমার সান্নিধ্যহেতুই জগন্নাথ একে কৃপা করলেন।'

ভট্টাচার্য প্রভুর স্তুতি করতে লাগল। নির্মম লৌহপিণ্ডকে তুমি নবনীতে পরিণত করলে। রজ্জু ছাড়াই বাঁধলে বন্যহস্তীকে। জলসেক ছাড়াই জুড়িয়ে দিলে হৃদয়দাহ। কঠিন বজ্র অমৃতসরস হয়ে উঠল।

'জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥'

একদিন কী হল, প্রভু অতি প্রত্যূষে মন্দিরে গিয়ে শয্যোত্থান দর্শন করলেন। পূজারী মালা আর প্রসাদ দিল প্রভুকে। মালা আর প্রসাদ প্রভু বাঁধলেন আঁচলে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন। বেগে চললেন রাস্তা দিয়ে।

তখনো সূর্যোদয় হয়নি। সার্বভৌমের ঘরে এসে পৌঁছুলেন।

তখনি সার্বভৌমের ঘুম ভাঙল। আর ঘুম ভাঙতেই সার্বভৌম বলে উঠল, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!

কখনো ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণনাম বলিনি তো! এ কেমন হল?

সার্বভৌম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সামনেই দেখতে পেল প্রভুকে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল।

আঁচল থেকে প্রসাদান্ন খুলে প্রভু দিলেন সার্বভৌমকে। সার্বভৌমের প্রাতঃকৃত্য হয়নি, স্নান-সন্ধ্যা হয়নি, মুখধোয়া হয়নি, তবু সেই আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইতস্তত না করে নিমেষে খেয়ে ফেলল প্রসাদান্ন। চৈতন্যপ্রসাদে তার সমস্ত জাড্য, সমস্ত বিমুখতা চলে গিয়েছে।

প্রসাদ সাধারণ অন্ন নয়, চিন্ময়বস্তু। তাই সে শুকনো হোক,

বাসি হোক, দূরদেশ থেকে আনা হোক, কালহরণ না করেই তা ভোজন করবে। প্রসাদের সাক্ষাতে কোনো সময়ের বিচার করবে না। দিনে-রাত্রে যখনই তা উপস্থিত হবে, তখনই তা ভক্ষণ করবে সানন্দে।

অন্ন-প্রসাদ মহাপ্রসাদ। আর তা কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট বলেই মহা-প্রসাদ। 'কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।' মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য কেন? যেহেতু নিবেদিত বস্তুতে কৃষ্ণের অধরামৃতের স্পর্শ লাগে। 'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাঁহা হৈতে আইল। কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল।'

প্রসাদে সার্বভৌমের শ্রদ্ধা দেখে প্রভু সার্বভৌমকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আজ আমার ত্রিভুবন জয় হল, আজ আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করলাম। সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয়েছে।'

দুজনে নাচতে লাগল বাহুবদ্ধ হয়ে।

'আজ তুমি নিষ্কপটে কৃষ্ণাশ্রয় হলে।' বললেন গৌরহরি, 'আজ কৃষ্ণও তোমাকে নিষ্কপটে দান করলেন প্রেমভক্তি।' আরো বললেন, 'তোমার দেহে আত্মবুদ্ধি দূর হল, দূর হল মায়াবন্ধন। তুমি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির যোগ্য হলে। আর কথা কী! বেদধর্ম লঙ্ঘন করে তুমি প্রসাদভক্ষণ করেছ।'

সার্বভৌমকে নাচতে দেখে গোপীনাথ পরিহাস করে উঠল। 'সে কী, তুমি নাচছ কী বলে? আর এ কি নাচ হচ্ছে, না, লাফ দিচ্ছ পাগলের মত? তোমার পড়ুয়ারা কী বলবে? জগজ্জনে কী বলবে?'

সার্বভৌম বললে, 'যার যা খুশি বলুক, নিন্দে করুক, আমরা বিচার করব না। হরিরসের মদিরা পান করেছি, এখন আমরা নাচব, লাফাব, মাটিতে পড়ব, ধুলোয় গড়াগড়ি দেব—কে আমাদের বাধা দেয়।'

সার্বভৌমের সমস্ত অভিমানের খণ্ডন হল। চৈতন্যচরণ বিনা আর আশ্রয় নেই, ভক্তি ছাড়া আর নেই শাস্ত্রব্যাখ্যা।

জগন্নাথদর্শনে বেরিয়ে সার্বভৌম চলে এল প্রভুর কাছে। বললে, 'সাধনভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী তাই জানতে এসেছি।'

প্রভু বললেন, 'নামসংকীর্তন। হরিনাম ছাড়া কলিতে আর গতি নেই। শুধু হরিনাম করো। হরিনামই কলির সাধন। ধ্যান যোগে তপস্যা কলিকালের নয়। কলিকালে নামই পরম উপায়।'

জগন্নাথ দর্শন করে সার্বভৌম ঘরে ফিরল। সঙ্গে দামোদর আর জগদানন্দ। একটি তালপাতায় প্রভুর উদ্দেশে দুটি শ্লোক লিখল। মহাপ্রসাদ আর সেই তালপাতা জগদানন্দের হাতে দিল। বললে, 'যাও, প্রভুকে দিয়ে এস।'

জগদানন্দের হাত থেকে তালপাতা নিয়ে আগে পড়ল মুকুন্দ। নিজে কণ্ঠস্থ তো করলই, বাইরে প্রাচীরগাত্রে সেই শ্লোক দুটি লিখে রাখল।

প্রভুকে সেই তালপাতা দিতেই পড়ে ছিঁড়ে ফেললেন। নিজের স্তুতি চান না শুনতে।

ভক্তকণ্ঠের রত্নহার সেই শ্লোক দুটো কী?

বৈরাগ্যবিদ্যা আর ভক্তিযোগ শেখাবার জন্যে করুণাসিন্ধু পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন—আমি তাঁর শরণ নিলাম।

যে ভক্তিযোগ কালপ্রভাবে নষ্ট হতে বসেছিল, তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর চরণকমলে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে আসক্ত হোক।

আরেকদিন এসেছে সার্বভৌম। ভাগবতের ব্রহ্মস্তব পড়ছে।

'কবে ভগবানের কৃপা হবে—এই প্রতীক্ষায় জাগ্রত থেকে স্বীকৃত

কর্মফল ভোগ করতে-করতে যে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করে জীবন ধারণ করে, সেই ভক্তিপদে দায়ভাগী থাকে।'

প্রভু বললেন, 'কথাটা তো 'মুক্তিপদে' আছে, তুমি 'ভক্তিপদে' বলছ কেন?'

'ফল মুক্তি নয়, ফল ভক্তি।' বললে সার্বভৌম। 'মুক্তি তো দণ্ড বিশেষ। মুক্তি হলে ভগবৎ-সেবাসুখ থেকে বঞ্চিত হতে হল। যাতে সুখ নেই, তা দণ্ড ছাড়া আর কী?'

প্রভু হাসলেন, বললেন, 'পাঠ বদলাবার কী দরকার! মুক্তিপদ অর্থাৎ মুক্তি পদে যাঁর, সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে বোঝায়। কিন্তু তোমার মুক্তি-শব্দেই ঘৃণা আর ত্রাস, আর ভক্তি-শব্দে পরমানন্দ।'

যে শুধু মায়াবাদ পড়ত আর পড়াত, তার মুখে এখন ভক্তিছাড়া কিছু নেই। এ চৈতন্যপ্রসাদ ছাড়া আর কী। লোহাকে ছুঁয়ে যতক্ষণ না তাকে সোনা করা যায়, ততক্ষণ মণিকে কেউ স্পর্শমণি বলে না। সার্বভৌমের বৈষ্ণবতা দেখে এ আর কারু সন্দেহ রইল না যে, যে তাকে ছুঁয়েছে সে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন।



৪৪

নীলাচল ছেড়ে দক্ষিণে যাব এবার। তোমরা সম্মতি দাও সকলে।

'বা, দক্ষিণ কেন?'

'বিশ্বরূপকে খুঁজব।'

বিশ্বরূপ ষোল বছরে সন্ন্যাস নেয়, দু বছর পরেই পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করে। শচীমাতা ছাড়া এ খবর সকলের জানা। তবে এ ছল কেন?

এ ছল বিনয়ের নামান্তর। দৈন্যের অবতার প্রভু কি বলতে পারেন—আমি জীবোদ্ধার করতে দক্ষিণে যাব? সামান্য দম্ভের কথাও যে তাঁর মুখে আসবে না।

'আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।'

'না, আমি একলা যাব।'

সকলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। নিত্যানন্দ বললে, 'তা কী করে হয়? একলা যেতে কত কষ্ট। তোমার কষ্ট আমরা সইব কী করে? দক্ষিণের তীর্থপথ সমস্ত আমার জানা, বলো, আমি তোমার সঙ্গী হই।'

'না, কেউ আমার সঙ্গী হবে না।'

'কেন, আমার অপরাধ?'

প্রভু হাসলেন। বললেন 'তোমাদের গাঢ় স্নেহই আমার বিষয়কণ্টক। তোমাদের গাঢ় স্নেহে আমার কর্মভঙ্গ। তোমাদের জন্যে আমি কিছুই ইচ্ছামত করতে পারি না।' তাকালেন নিত্যানন্দের দিকে: 'সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে যাব স্থির করলাম, তুমি আমাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে নিয়ে এলে। সন্ন্যাসীর প্রধান সহায় যে দণ্ড তা ভেঙে দিলে নীলাচলে। জানি এ সমস্তই তোমার ভালোবাসার প্রকাশ, কিন্তু আমার কার্যহানি। সাধ্য নেই তোমার মনে, কারু মনে, আমি ব্যথা দিই। যেহেতু আমি নর্তক, তুমি সূত্রধর। যেমন নাচাও আমাকে, আমি তেমনি নাচি।'

জগদানন্দ বললে, 'কিন্তু আমাকে নেবে না কেন? আমার কী অপরাধ?'

'অহর্নিশ তোমার একমাত্র চেষ্টা কী করে আমাকে ভোগে-আরামে রাখবে। কী করে ভালো খাওয়াবে, ভালো পরাবে, শুতে দেবে ভালো বিছানা। কিন্তু আমি কি ও সব নিতে পারি? অথচ তোমার কথায় রাজি না হলে রাগ করে তুমি তিন দিন আমার সঙ্গে কথা বল না।'

'কিন্তু আমার দোষ কী ?' জিগগেস করল দামোদর।

'আমি সন্ন্যাসী আর তুমি ব্রহ্মচারী মাত্র। কিন্তু সর্বক্ষণ আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরে আছ। তুমি আছ শুধু বিধিনিয়ম পালন করাতে, বিধিনিয়মের বাইরে আমাকে দিতে চাও না স্বাধীনতা। কৃষ্ণের জন্যে যে আমি একটু প্রাণ ভরে কাঁদব, তাতেও বাধা।' প্রভু ডাকলেন মুকুন্দকে : 'আর তুমি ? তুমি কিছু বলছ না ?'

মুকুন্দ অশ্রুনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

'তোমার দুঃখ দেখে আমার দুঃখ দ্বিগুণাকার হয়। শীতেও আমি তিনবার স্নান করি, মৃত্তিকায় শুই, এ তোমার কাছে অসহ্য। কিন্তু তুমি স্পষ্ট কিছু বল না, অন্তরে দুঃখী হয়ে বিষাদমুখে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি যে নিয়ম পালন করি, তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু আমার নিয়মপালনে মুকুন্দ দুঃখ পাচ্ছে—তাই আমার দুঃখ। ওর মুখের দিকে চাইতেও আমার বুক ফেটে যায়।'

যার যা গুণ তাই দোষ বলে কীর্তন করলেন প্রভু। 'দোষারোপ-চ্ছলে করে গুণ-আস্বাদন।'

'বেশ তুমি যখন বলছ তুমি একাই যাবে, আমাদের কাউকে নেবে না সঙ্গে, তখন তাই হবে।' বললে নিতাই, 'আমাদের সুখ-দুঃখ বিচার করব না, তোমার ইচ্ছাকেই শিরোধার্য করব! কিন্তু তোমার কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র কে বহন করবে ? তোমার দু'হাত তো নাম-গণনায় আবদ্ধ থাকবে, তুমি নিজে তো বইতে পারবে না। তার পর প্রেমাবেশে যখন পথে অচেতন হয়ে পড়বে, তখন কে তোমার বস্ত্র-পাত্র রক্ষা করবে ? অন্তত একজনকে সঙ্গে নাও।'

'কার কথা বলছ ?' একটু কি নরম হলেন গৌরহরি ?

'কৃষ্ণদাসের কথা। সরল বিনয়ী ব্রাহ্মণ, তোমার পাত্র-বস্ত্র ও বহন করবে আনন্দে।'

'বেশ, তাই নেব। এখন চলো সার্বভৌমের সঙ্গে দেখা করি।'

সর্বমঙ্গল উপস্থিত তার দুয়ারে, সার্বভৌম নিমাই-নিতাইকে পূজা করে আসন নিবেদন করল।

নিতাইকেও কি চিনেছে সার্বভৌম? প্রভুরই এক স্বরূপ, সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী যাকে বলেছিল দুর্বিজ্ঞেয়—বাৎসল্য দাস্য ও সখ্যের সমন্বয়, প্রভুর সহায়, লীলাসহচর। অকাতরে নির্বিচারে প্রেম বিলিয়ে যে প্রভুরই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য করছে।

প্রভু বললেন, 'অনুমতি করো। বিশ্বরূপের খোঁজে দক্ষিণে যাব। তোমার শুভ ইচ্ছায় আবার ফিরে আসব নির্বিঘ্নে।'

শেলের মত বুকে এসে বিঁধল সার্বভৌমের। বললে, 'প্রভু, তোমার বিরহ কি করে সহ্য করব? এর চেয়ে আমার নিজের মৃত্যু, পুত্রের মৃত্যুও সহনীয় ছিল। তুমি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র, কে তোমাকে নিবৃত্ত করবে? তবু, কোন পথে তুমি যাবে, কী করে সইবে পথক্লেশ?'

'কেন কাতর হচ্ছ?' সান্ত্বনা দিলেন প্রভু। 'আমি সেতুবন্ধ পর্যন্ত যাব, আবার ত্বরিত ফিরে আসব। কৃষ্ণ সকলকে কৃপা করবেন।'

'তবে দিন কতক আরো থাকো। প্রাণ ভরে তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করি। ষাঠীর মা, ব্রাহ্মণীকে বলি, তোমাকে ভিক্ষা দেন দিন কতক।'

চার দিন থেকে গেলেন প্রভু। তার পর মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথের কাছে আদেশ প্রার্থনা করলেন। প্রসাদী মালা এনে দিল পূজারী—তাই আজ্ঞামালা। মালা নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন, সমুদ্রতীর ধরে আলালনাথের উদ্দেশে অগ্রসর হলেন।

'তুমি এবার ফিরে যাও।' বললেন সার্বভৌমকে।

'প্রভু, আমার এক নিবেদন আছে।' বললে সার্বভৌম। 'গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় আছে। সে রাজ-প্রতিনিধি, বিষয়ী, জাতিতে কায়স্থ। তাই বলে তাকে উপেক্ষা কোরো না, দয়া করে দর্শন দিও। সে যেমন পণ্ডিত তেমনি ভক্ত।

তার সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। তাকে আমি এ যাবৎ 'বৈষ্ণব' বলে পরিহাস করেছি, তার কথা ও আচরণ কোনো কিছুরই মর্ম আমি বুঝিনি। তোমার কৃপায় এবার তার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তুমি তাকে সম্ভাষণ করলেই বুঝবে তার মহত্ত্ব।'

দেখা দেবেন বলে প্রভু সম্মত হলেন। আলিঙ্গন করে বললেন, 'এবার তবে ঘরে ফিরে কৃষ্ণ ভজন করো। আর আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমার প্রসাদে নীলাচলে ফের ফিরে আসি।'

চলে গেলেন প্রভু। সার্বভৌম মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তার দিকে প্রভু আর ফিরেও তাকালেন না। 'মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল—কঠিন বজ্রময়॥'

নিত্যানন্দ সার্বভৌমকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

বাকি সকলে যুক্ত হল প্রভুর সঙ্গে। সমুদ্রের ধারে-ধারে হেঁটে-হেঁটে পৌঁছুল আলালনাথে।

আলালনাথকে প্রণাম করে নৃত্য সুরু করলেন প্রভু। দলে-দলে লোক এসে জড়ো হতে লাগল। চতুর্দিকে রব উঠল হরি-হরি, রব উঠল কৃষ্ণ-গোপাল। অরুণ বসনে মণ্ডিত এমন কাঞ্চনদেহ কেউ দেখেনি, দেখেনি এমন কম্প-স্বেদ, এমন পুলকাশ্রু। যে দেখে সেই চমৎকার গণে, ফিরে যেতে চায় না। ছেড়ে যেতে চায় না।

প্রভুর তা হলে দুপুরের ভিক্ষা জোটানো কঠিন হল।

'তোমরা কেন এত ভিড় করছ?' নিত্যানন্দ চাইল বোঝাতে। 'কথা দিচ্ছি, প্রতি গ্রামে এমনি নৃত্য হবে, তোমরা পাবে এই মহৎ সঙ্গ। এখন সকলে নিরস্ত হও, গাঁয়ে-ঘরে ফিরে যাও।'

কে কার কথা শোনে!

'চলো তোমাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসি।'

সমুদ্রে নিয়ে গেল প্রভুকে, আথালি-পাথালি লোক ছুটল। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে আবার নিয়ে এল মন্দিরে। আর তক্ষুনি বন্ধ করে দিল দরজা।

গোপীনাথ প্রসাদ নিয়ে এসেছিল, নিমাই-নিতাইকে ভিক্ষা করাল। অবশিষ্ট বাকি সবাই ভাগ করে নিল।

'দরজা খোলো। দর্শন করতে দাও আমাদের।' জনতা উত্তাল হয়ে উঠল।

ভক্তদের সাহস হল না দরজা খোলে। কিন্তু প্রভু কতক্ষণ লোক-আর্তি সহ্য করবেন? বললেন, 'দ্বার মোচন করো।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত চলল জনস্রোত। যে দেখল সেই বৈষ্ণব হয়ে গেল। মুখে ধ্বনি ফুটল—হরি-হরি, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য।

সারারাত কাটল কৃষ্ণকথায়। প্রভাত হলে প্রাতঃস্নানের পর প্রভু ভক্তদের কাছে বিদায় চাইলেন। সকলে আবার হায়-হায় করে উঠল।

কারু দিকে আর তাকালেন না। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে রাধিকার মত চললেন বিষাদচ্ছবি হয়ে।

মুখে শুধু এক বাক্য: 'রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্।' এই বাক্য মুখে নিয়েই চলেছেন গৌরহরি, আর যাকেই দেখছেন, বলছেন, বলো হরি, বলো কৃষ্ণ। আলিঙ্গন করছেন আর সুযোগে শক্তি সঞ্চার করে দিচ্ছেন! আর সে তার গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষ্ণ বলে নাচছে, কাঁদছে, আর হাসছে, বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। তার পর অন্য গ্রামের লোক যখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, সেও হয়ে উঠছে মহাভাগবত, কৃষ্ণনামের আচার্য।

এভাবে সেতুবন্ধ পর্যন্ত সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হয়ে গেল।

ক্রমে এসে পৌছলেন কূর্মক্ষেত্রে গঞ্জামে। মন্দিরে কূর্মাবতারের বিগ্রহ দেখে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে লাগলেন প্রেমাবেশে।

এখানেও সেই কৌশল। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কৃষ্ণাগ্নি-সঞ্চার।

'কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল॥'

কূর্ম নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ আছে সেই গ্রামে, প্রভুকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করল। নিজে পা ধুয়ে দিল প্রভুর, সেই জল খেল সবংশে। অনেক স্নেহে ভিক্ষা করাল নানাপ্রকার, সবংশে খেল শেষান্ন। বললে, 'যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান করছে, তাই আমার ঘরে অবতীর্ণ। প্রভু, তোমাকে আর আমি ছাড়ব না, বিষয়তরঙ্গে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি, আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।'

'এসব কথা বলবে না।' বললেন প্রভু, 'ঘরে বসে নিরন্তর কৃষ্ণনাম নেবে, আর যাকেই দেখবে, তাকেই করবে কৃষ্ণ-উপদেশ। তোমাকে বিষয়তরঙ্গ স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।'

সর্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ, বাসুদেব রাত্রে শুনতে পেল, কূর্মবিপ্রের ঘরে প্রভু এসেছেন! ভোর হতেই চলে এল তড়িঘড়ি।

'প্রভু কোথায়?'

'এই খানিক আগেই চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন!' মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল বাসুদেব।

জীবনে তার একমাত্র সঙ্গী কুষ্ঠকীট। অঙ্গের ক্ষতস্থান থেকে যদি একটি কীট মাটিতে পড়ে যায়, বাসুদেব আবার তাকে সযত্নে ক্ষতস্থানেই আশ্রয় দেয়। নিজ দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ নেই, নিজ দেহ দিয়েই কীটগুলোকে, যেসব কীট দেহ থেকে খসে পড়েছে তাদেরও, তাদেরও সেবা-যত্ন করে, ভরণপোষণ করে। যে ঈশ্বরতন্ময়, কোথায় আর তার দেহবুদ্ধি!

বিলাপ করতে লাগল বাসুদেব।

হঠাৎ তার চোখের সামনে প্রভু এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন

না, তাকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। দিলেন তাকে জ্যোতির্ময় নিরাময় স্পর্শ।

মুহূর্তে অভিনব কাণ্ড ঘটে গেল। কুষ্ঠ সেরে গেল বাসুদেবের। তার সর্ব অঙ্গ নিরবদ্য হয়ে উঠল, ধরল সুবর্ণকান্তি।

'এ শুধু তুমিই পারো।' বললে বাসুদেব। 'এ জীবের পক্ষে অসম্ভব। তুমি ভগবান, জীবনিস্তার তোমার স্বভাব, তাই তোমার মধ্যে উত্তম-অধমের ভেদ নেই, উত্তম-অধম দুইই তোমার সমান প্রিয়। কিন্তু এ আরোগ্য সর্বাংশে আমার পক্ষে শুভ হল কী?'

'কেন এ কথা বলছ?'

'আমার এখন অহঙ্কার না জন্মায়।' দ্রবচিত্তে বললে বাসুদেব, 'আগে আমি সকলের অস্পৃশ্য ছিলাম, আমার গায়ের গন্ধে কেউ আমার কাছে ঘেঁসত না, নিজেকে ভাবতে পারতাম দীনাতিদীন বলে। তুমি এখন আমার দেহকে নিষ্কলঙ্ক করলে, রূপে লাবণ্যে গরীয়ান করলে, এখন আমাতে দেহাভিমান না এসে যায়। আর তুমি তো জানো অভিমানই ভজনের শত্রু।'

'তুমি সর্বদা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ-ধ্বনিতেই জন্মাবে না অভিমান। কৃষ্ণই তোমাকে আত্মসাৎ করে নেবেন।'

প্রভু চললেন এগিয়ে। নষ্ট-কুষ্ঠ রূপপুষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, হয়ে গেল ভক্তিতুষ্ট। প্রভুর নাম হল বাসুদেবামৃতপদ।

জিয়ড়-নৃসিংহের স্থানে পৌছুলেন তার পর। 'এই নৃসিংহ প্রহ্লাদের স্থাপনা। দণ্ডবৎ নতি করলেন প্রভু। বহু নৃত্যগীতস্তুতি করলেন। সিংহ যেমন অন্যের সম্পর্কে উগ্র হয়েও নিজের শাবকদের কাছে শান্ত, তেমনি নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুর মত ভক্তদ্রোহীর প্রতি উগ্র হয়েও প্রহ্লাদের মত ভক্তের কাছে স্নেহশীল।

প্রহ্লাদ তার বন্ধুদের বললে, 'তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হও, তা হলে শ্রদ্ধা হতেই তোমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধি উৎপন্ন হবে। আমি বলছি, যাতে ভগবানের অবিচলিত আসক্তি হয়, তাই

করো। শুশ্রূষা করো, সমস্ত লব্ধবস্তু সমর্পণ করো, সাধু ভক্তবৃন্দের সংসর্গ করো, ভগবৎকথায় অনুরাগী হও, সশ্রদ্ধ হও, ধ্যান করো তাঁর পাদপদ্ম। যেখানে তাঁর যত মূর্তি আছে, বহুমূর্ত্যৈকমূর্তি, সমস্ত দর্শন-পূজন করো। ভগবান সর্বভূতে বর্তমান—তাই জেনে সর্বভূতে সাধুদৃষ্টি করো। তা হলেই দেখবে বাসুদেবে আসক্তি আসবে। দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, চরিত্র, বহুজ্ঞতা, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত—মুকুন্দের প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থ নয়, একমাত্র নির্মল ভক্তিতেই হরি আনন্দিত হন। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি আর তাঁকে সর্বত্র নিরীক্ষণ করাই ইহলোকে পুরুষের পরমস্বার্থ। ভক্তি ছাড়া আর সমস্তই বিড়ম্বনা।

মানবজন্ম প্রয়োজনসাধক। যেহেতু মানবজন্ম দুর্লভ ও অনিত্য, কৌমারকালেই ভাগবতধর্ম আচরণ করো। আরো বললে প্রহ্লাদ। বিষ্ণু সর্বভূতের প্রিয় ও সুহৃদ। দেহসম্বন্ধ থেকে ইন্দ্রিয়সুখ অনায়াসেই পাওয়া যায়, এতে মঙ্গল নেই, শুধু আয়ুক্ষয়। একমাত্র ভগবানের চরণাম্বুজসেবনেই মঙ্গল। সেই আদ্য অনন্ত অধোক্ষজ যদি তুষ্ট হন তা হলে আর কী অলভ্য থাকে? পরিণামে যা হবেই যা অবশ্য-সিদ্ধ সেই সমস্ত ধর্মচেষ্টায় কী ফল? আমরা যারা নিরন্তর তাঁর নামকীর্তন করছি ও চরণসংলগ্ন আছি, আমাদের মোক্ষ দিয়েই বা কী হবে?

আয়ু মাত্র শতবৎসর। তার অর্ধেক ব্যয় হয় নিদ্রায়, অন্ধতমসে, নিষ্ফলশয়নে। বিশ বছর যায় বাল্যমোহে ও কৈশোরক্রীড়ায়, বিশ বছর জরাজীর্ণতায়, আর বাকি জীবন গৃহাসক্ত অবস্থায়, তাপত্রয়ে, দুরন্ত মোহে। কেশকার কীট যেমন নিজ বাসস্থান নির্মাণ করে নিজের বহির্গমনের জন্যেও দ্বার রাখে না তেমনি গৃহসুখমত্ত সংসারীরা আপন লোভজালেই বদ্ধ হয়ে পড়ে। মুকুন্দের শরণাগতিই এই পরম ক্লেশকর অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়। ভগবান অচ্যুত সর্বভূতের আত্মা ও স্বতঃসিদ্ধ বলে তাঁকে প্রীত করা কঠিন নয়। তা স্বভাবেরই বস্তু।

পরতত্ত্ববস্তু একেই বহু, আবার বহুতেও এক। তাই যেখানে যত মন্দির পেয়েছেন—ভগবতীর কি ভৈরবীর, বিষ্ণুর কি নৃসিংহের, দর্শন করেছেন প্রভু। আর সর্বত্রই তাঁর প্রেমাবেশ। যদিও কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের জন্যেই তাঁর অবতার, সেই আস্বাদনে পূর্ণতা কই যদি অন্য ভগবৎস্বরূপের মাধুর্যও না আস্বাদিত হয়? কোনো ভগবৎ-স্বরূপই উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্নস্বরূপে ভেদবুদ্ধি করলে অপরাধ। ঈশ্বরত্বে তাই প্রভুর সর্বত্র প্রেমাবেশ।

একরাত সেখানে থেকে আবার চললেন দক্ষিণে। গোদাবরীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। এ কি, যমুনা নাকি? আর চারদিকের এই ঘন বন, এই বুঝি ব্রজভূমি! মাতোয়ারা হয়ে নাচতে লাগলেন। আবার এ অঞ্চলও বৈষ্ণবায়িত হল।

পার হলেন গোদাবরী। ঘাটে স্নান করে অদূরে বসলেন কৃষ্ণ-কীর্তন করতে।

হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল, দোলায় চড়ে কে আসছে রাজরাজড়া। সঙ্গে বহুতর ভৃত্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ, সৈন্যসামন্ত। অনেক ঠাটবাট। আসছে স্নান করতে, কিন্তু বিষয়-বিলাসের ঘনঘটা কত!

প্রভু জানেন এ কে। এ উৎকলবাসী, বিদ্যানগরের অধিপতি রামানন্দ রায়। বিষয়ে বসবাস করেও নিরাসক্ত। কৃষ্ণপ্রেমে টলমল।

বিধিমত স্নান-তর্পণ করল রামানন্দ। হঠাৎ নজরে পড়ল অদূরে একাকী কে এক সন্ন্যাসী বসে আছে। সন্ন্যাসী সম্বন্ধে রামানন্দ বিশেষ উৎসাহিত নয়, কিন্তু কে এ অপরূপ? অরুণবর্ণ বহির্বাস, কমলচক্ষু, সুবলিত প্রকাণ্ড শরীর, শরীরে শত সূর্যের তেজ। সমস্ত বন-বিটপী আলো করে বসে আছে। শুধু চোখেই চমৎকার লাগল না, প্রাণেও বাঁশি বেজে উঠল। রামানন্দ এগোল দ্রুত পায়ে, একেবারে দণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল প্রভুকে।

তাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে প্রভুও সতৃষ্ণ হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওঠো। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো।'

উঠল রামানন্দ। সহর্ষচোখে তাকিয়ে রইল।

'তুমিই রামানন্দ ?'

দৈন্যবশে রামানন্দ বললে, 'আমিই সেই মন্দভাগ্য শূদ্রাধম।'

'তুমি ?' কতদিনের হারানো বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন—সেই উদ্বেল আনন্দে দীর্ঘ দৃঢ় ভুজে রামানন্দকে প্রভু বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন! দুজনেরই স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হল—প্রভুর রাধাভাব, রামানন্দের গোপীভাব। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দুজনেই পড়লেন মাটিতে—স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য তো ফুটলই, মুখে ফুটল গদগদ শব্দ—কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

এ কী আচরণ! বৈদিক ব্রাহ্মণেরা স্তম্ভিত হল। তেজপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী, অথচ শূদ্রকে আলিঙ্গন করছে! আর স্বভাবতই গম্ভীর যে রাজপুরুষ, সেই রামানন্দ সন্ন্যাসীস্পর্শে করছে এমন আকুলি-ব্যাকুলি!

বিরোধীয় ভাবের লোক দেখে প্রভু ভাব সম্বরণ করলেন। সুস্থ হয়ে বসলেন রামানন্দকে পাশে নিয়ে। বললেন, 'সার্বভৌম ভটচাজ তোমার কথা বলেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন দেখা করতে। ভালোই হল, অনায়াসে তোমার দর্শন পেলাম।'

'আজ আমার মনুষ্যজন্ম সফল হল।' বললে রামানন্দ। 'সার্বভৌমের কৃপায় আমি ভাগ্যবান হলাম, পেলাম চরণদর্শন। তার প্রেমে বশীভূত হয়ে আমার মত অস্পৃশ্যকে তুমি আলিঙ্গন করলে। বেদবিধি ভয় করলে না, আমার মত বিষয়ী রাজসেবী শূদ্রকেও তোমার বুকে স্থান দিলে। সন্দেহ কী, তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, জীবের প্রতি কৃপায় নিন্দ্যকর্ম করতেও তোমার বাধে না।'

'কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয়॥

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম ॥'

আরো বললে রামানন্দ, 'আমাকে উদ্ধার করতেই তোমার এখানে আসা। তুমি যে পরম দয়ালু, তুমি যে পতিত-পাবন। মহাপুরুষেরা নিজের আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র যায় কেন? তাদের নিজের প্রয়োজনে নয়, শুধু পাষণ্ড-উদ্ধারে। যায় কেন তীর্থ-পর্যটনে? শুধু তীর্থকে পবিত্র করতে, আর সেই ছলে সংসারীদের নিস্তার করতে।'

বিদুরকেও তাই বলেছিল যুধিষ্ঠির। বলেছিল, 'আপনার মত কৃষ্ণভক্ত তীর্থের মতই পবিত্র। যাদের অন্তরে গদাধর বিরাজমান, তাদের তীর্থদর্শনে প্রয়োজন কী! শুধু তীর্থের পবিত্রতা বাড়াবার জন্যেই তাদের তীর্থভ্রমণ।'

'দেখ, তোমাকে দেখে আমার অনুচরেরা, ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত দ্রবীভূত হয়েছে।' রামানন্দ আরো বললে, 'কৃষ্ণনাম শুনে সকলের শরীর শিহরিত, চোখ অশ্রুসজল। তোমার আকৃতিতে-প্রকৃতিতে ঈশ্বর-লক্ষণ সুস্ফুট, সামান্য জীবে এ কখনো সম্ভব নয়।'

'কী যে বলো'।' বললেন প্রভু, 'তুমি মহাভাগবত, তোমার ভক্তি দেখেই ওদের মন আর্দ্র হয়েছে। অন্যের কথা ছেড়ে দিই, আমি হেন যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তির ধার ধারি না, আমিও তোমার স্পর্শে ভাসছি কৃষ্ণপ্রেমে। সার্বভৌমই বলে দিলেন, আমার কঠিন চিত্তকে শোধন করবার একমাত্র রসায়ন তুমি, তাই তো এসেছি তোমাকে দেখতে।'

কিন্তু এখানে থাকি কোথায়?

এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁর ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন।

প্রভু হাসিমুখে বললেন রামানন্দকে, 'বড় সাধ তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনি। আবার দেখা হবে তো?'

'কিছুদিন এখানে থাকুন।' বললে রামানন্দ, 'এই দুষ্টচিত্তকে মার্জন করে শোধন করে দিয়ে যান।'

'আপনারা সংসারতপ্ত ব্যক্তিদের পরমবন্ধু।' সনৎকুমারকে জিগগেস করল মহারাজ পৃথু : 'আপনারা বলে দিন সংসারে কী উপায়ে মানুষের মঙ্গল হবে।'

'শ্রীহরিচরণে দুরাপা রতিই অন্তরের কামমলকে বিধৌত করে। শাস্ত্র দ্বারা যা নিশ্চিত হয়েছে, আত্মা ভিন্ন সে সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য আর গুণাতীত আত্মায় দৃঢ়া রতিই মানুষের শ্রেয়োলাভের হেতু। শ্রদ্ধা, চর্যা, জিজ্ঞাসা, নিষ্ঠা, উপাসনা, পুণ্যশ্লোক হরির পবিত্র কথা, তামস ও রাজস ব্যক্তিদের সঙ্গে সহবাস-অনিচ্ছা, নির্জনবাসে অভিরুচি, অর্থকামবর্জন ও আত্মাতে পরিতোষ—এ সমস্তে অনায়াসেই আত্মরতি ও আত্মভিন্নে অনাসক্তি জন্মাতে পারে। আর মুকুন্দচরিতামৃতাস্বাদন, হরিভক্তদের কর্ণালঙ্কারস্বরূপ হরিনাম বারংবার উচ্চারণ, এরাও দেয় শ্রেয়োফল। কর্মগ্রন্থি ও হৃদয়গ্রন্থি যদি ছিন্ন করতে চাও তবে সেই চরমশরণ বাসুদেবের ভজনা করো।

যাতে হরির পরিতোষ হয় সেই কর্মই কর্ম, যার দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে সেই বিদ্যাই বিদ্যা। ভগবানের পাদমূলেই আশ্রয়, পাদমূলেই কল্যাণ।



৪৫

দেরি নয়, আজ সন্ধ্যাতেই দেখা করব। ভাবছে রামানন্দ। প্রভু ভাবছেন, কতক্ষণে না জানি দেখা পাই। সন্ধ্যা হতেই যেন চলে আসে।

সান্ধ্য স্নান সেরে প্রভু বসে আছেন, রামানন্দ রায় উপস্থিত। রামানন্দ নমস্কার করল, প্রভু আলিঙ্গন করলেন।

নির্জনে বসে আলোচনা সুরু করলেন দুজনে।

. 'জীবের কাম্য বা সাধ্য বস্তু কী?' জিগগেস করলেন প্রভু, 'শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বলো।'

শুধু তোমার কী অনুভূতি, তা নয়, শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও প্রকাশ করো। অর্থাৎ শাস্ত্রবচনের সঙ্গে তোমার নিজের অনুভবকে মেলাও।

রামানন্দ বললে, 'স্বধর্মাচরণই সাধ্য। তাই বলেছে বিষ্ণুপুরাণে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠানেই বিষ্ণুপ্রীতি। যে যে-আশ্রমে যে-ভূমিতে আছে, সেই আশ্রমের বা সেই ভূমির বিহিত কাজ পালন করলেই বিষ্ণুর সন্তোষ।'

প্রভু বললেন, 'ইহ বাহ্য, আগে কহ আর। মহত্তর সাধ্যের কথা শুনতে চাই।'

'কৃষ্ণে কর্মার্পণ।' বললে রামানন্দ, 'শুধু সাধ্য নয়, সাধ্যসার। অর্থাৎ যা কিছু কাজ করো সব কৃষ্ণে অর্পণ করো। তোমার অধিকার কর্মে, ফলে নয়। যে কর্মের ফল কৃষ্ণের সুখে নয়, নিজের সুখে নিয়োজিত, তা অকর্ম।'

'এও বাহ্য এও বাইরের দরজা,' বললেন প্রভু, 'আগে কহ আর। অন্দরমহলের দ্বার দেখাও।'

'স্বধর্মত্যাগ—সর্বধর্মত্যাগ।' রামানন্দ বললে। 'কর্ম করে ফল অর্পণ নয়, কর্ম করবার আগেই আত্মসমর্পণ। ফলদান নয়, আত্মদান। গীতায় যাকে বলেছে,—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। যে নিজেকে দিয়েছে, তার আর ধর্ম থাকল কই? তার তখন স্ব-ও গেছে, ধর্মও গেছে। আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ সাধ্য।'

প্রভু আরো এগোতে চাইলেন। বললেন, 'এও বাহ্য, আগে বলো।'

সমর্পণ যে করবে, পূর্বাহ্নে জানতে হবে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র আশ্রয়স্থল। না জেনে সমর্পণে সার্থকতা কী। শুধু উপদেশ শুনে শরণাগত হবে? পাপ-পুণ্য বিচার করে? মুক্তি-ভুক্তির

আকাঙ্ক্ষায়? পায়ে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ার আর কোনো টান নেই? আর কোনো আকূতি?

রামানন্দ বললে, 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সারসাধ্য।'

আগে জানো শ্রীকৃষ্ণই শরণ্য, মহদাশ্রয়, তার পর ভক্তিই তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে তাঁর দিকে। তার পর এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই পরাভক্তিতে পরিণত হবে।

জ্ঞানের উদয়ে কী হবে? সর্বভূতে সমদৃষ্টি হবে। সর্বাত্মময় সর্বানন্দময় হবে। ব্রহ্মভূত হবে। সেই প্রসন্নাত্মার তখন আর কোনো শোক নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। আর তখনই উপনীত হবে সে পরাভক্তিতে।

সেই পরাভক্তির—উত্তমা ভক্তির কথা বলো।

প্রভু বললেন, 'এহ বাহ্য আগে কহ আর।'

'জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যোত্তম।' বললে রামানন্দ।

হে অজিত, তোমার স্বরূপের—তোমার ঐশ্বর্যের মহিমা জানবার জন্যে আমার কোনো চেষ্টা নেই। শুধু সৎ সঙ্গে থেকে সাধুদের মুখে তোমার রূপগুণ লীলাকথা, তোমার ভক্তদের চরিতকথা শুনব, তনুমনোবাক্যে নমস্কার করব সে সমস্ত কথাকে। জানি শুধু তাতেই, শুধু এইটুকুতেই, তুমি আমার হয়ে যাবে। তুমি ভগবান, এ ভাবলেই ঐশ্বর্যবুদ্ধি ভক্তিকে শিথিল করে দেয়। তুমি আমার আপনজন মনে করলেই তুমি নিবিড়তম সান্নিধ্যে ধরা দাও। আপন জন ভাবলেই হৃদয়মধ্যে ঘন হয়ে বসো।

প্রভু একটু হাসলেন। বললেন, 'এও হয়, তবু যেন আরো কিছু হয়। আরো কিছু বলো।'

রামানন্দ বললে, 'প্রেমভক্তিই সর্বসাধ্যসার।'

জ্ঞানশূন্যা বা শুদ্ধা ভক্তির সঙ্গে একটু কৃষ্ণতৃষ্ণা মেশাও, তা হলেই প্রেমভক্তি। ক্ষুধা না থাকলে ভোগ কী! জঠরে বলবতী ক্ষুধা-পিপাসা আছে বলেই ভক্ষ্য-পেয় আনন্দদায়ক। শুধু প্রেমার্তিতেই আর্তবন্ধু

কৃষ্ণ বিগলিত। কৃষ্ণ শুধু প্রশংসার বস্তু নয়, আস্বাদনের বস্তু। কৃষ্ণমতির মূল্য শুধু একটি। সে হচ্ছে লালসা। কৃষ্ণসেবার জন্যে আতীব্র উৎকণ্ঠা। লৌল্যং অপি মূল্যং একলং। লোভ জাগলেই বস্তু মেলে। আর এই লোভ জাগে কৃপায়। কোটিজন্মের সুকৃতির বিনিময়েও এ লোভ লাভ করার নয়।

সেবা দিয়ে কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছাই প্রেমভক্তি। আর লৌল্য বা লালসাই সেই প্রেমভক্তির প্রাণ।

'জলবিন্দু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেমবিন্দু এই মত ভক্ত।
চাতক জলদ-গতি এমতি একান্ত রীতি
যেই জানে সেই অনুরক্ত॥
লুবধ ভ্রমর যেন চকোর চন্দ্রিকা তেন
পতিব্রতা জন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন যেন দরিদ্রের ধন
এই মত প্রেম-ভক্তি রীতি॥'

প্রভু আবার হাসলেন। 'এও হয়। তবু আগে কহ আর। দেখ আর কোনো নিগূঢ়তর আস্বাদ আছে কি না।'

'আছে।' বললে রামানন্দ, 'দাস্য প্রেম।'

শান্তে কেবল কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, দাস্যে সেই নিষ্ঠার উপরে আবার সেবা। শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধিহীন। আর দাস্যে 'এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগত-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।' জীবের স্বরূপগত ভাবই দাস্যভাব। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবক, কৃষ্ণানুজীবী।

অম্বরীষকে কী বলেছিল দুর্বাসা? বলেছিল, যাঁর নাম শোনা মাত্রই মানুষ নির্মল হয়, পবিত্র হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসানুদাসের আর কি পাওয়া বাকি থাকে?

কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হব? কবে তোমার

সেবায় নিযুক্ত হয়ে নিজেকে সনাথজীবিত বলে অনুভব করব? কবে আমার অন্য সব বাসনা তিরোহিত হবে? কৃষ্ণসেবার বাসনা ছাড়া অন্য মনোরথ নিঃশেষে প্রশান্ত হবে? কবে আমি প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তর হব?'

'এও হয়।' মৃদু-মৃদু হাসলেন আবার প্রভু। বললেন, 'আরো বলো।'

রামানন্দ বললে, 'সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।'

প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায়। গৌরববুদ্ধিতে সেবায় সঙ্কোচ আসে। কৃষ্ণকে যদি ত্রাতা বিবেচনা করতে হয়, তা হলে সেবা সর্বাঙ্গীণ হয় না। সখ্যপ্রেম নিঃসঙ্কোচ। সখ্যপ্রেমে অভেদবুদ্ধি। নিজদেহে ও কৃষ্ণদেহে তফাৎ নেই। কার বা গাত্র, কার বা চরণ। গায়ে পা ঠেকলেও তাই চাঞ্চল্য নেই। নিজের গায়ে নিজের পা ঠেকলে কে উদ্বিগ্ন হয়? কে কার কাঁধে উঠছে। কে খাচ্ছে কার উচ্ছিষ্ট! কৃতপুণ্যপুঞ্জ ব্রজবালকদের সঙ্গে লীলারঙ্গী কৃষ্ণ অনেক ক্রীড়াকৌতুক করেছে, অনেক হুটোপুটি—অনেক দৌড়ঝাঁপ।

'এহোত্তম।' প্রভু আবার স্নিগ্ধনেত্রে হাসলেন। বললেন, 'আগে কহ আর।'

'বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' রামানন্দ উত্তর দিল।

সখ্যে কৃষ্ণ সমান-সমান, বাৎসল্যে কৃষ্ণ ছোট, দুর্বল, দীনহীন। বাৎসল্যে কৃষ্ণে অনেক দোষ, তাই তাকে তাড়ন-তর্জন, শাসন-পীড়ন, এমন কি রজ্জুবন্ধন পর্যন্ত চলে। বাৎসল্যে বৃহত্তমকে ক্ষুদ্রতম মনে করা, সমর্থতমকে অক্ষমতম মনে করাই রীতি। যে ভুবনের পালক—তাকে একটি তুচ্ছ অপোগণ্ড বালকরূপে অনুগ্রহ করা।

বিমুক্তিদাতা কৃষ্ণের থেকে যে প্রসাদ যশোদা পেয়েছে, তা না পেয়েছে ব্রহ্মা, না পেয়েছে শিব, না বা তার অঙ্গসংলগ্না লক্ষ্মী।

আর বাৎসল্যে কৃষ্ণেরও সেই বালকভাব। নন্দের পাদুকা মাথায়

নিয়ে চলেছে গোষ্ঠের পথে। মার হাতের প্রহার এড়াবার জন্যে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, মিথ্যে কথা বলছে, লজ্জিত-কুণ্ঠিত হচ্ছে। নিজে মুক্তিদাতা হয়ে বন্ধন মানছে।

দধিভাণ্ড ভগ্ন করেছে শুধু নয়, শিকের থেকে ননী নিয়ে বানরদের দান করছে দেখে যশোদা লাঠি হাতে তাড়া করল কৃষ্ণকে। চকিত নয়নে কৃষ্ণ ছুট দিল। যোগীদের মন তপস্যা দ্বারা তদাকারকারিত হয়েও যাকে পায়নি সুমধ্যমা যশোদা তারই পশ্চাদ্ধাবিত হল। বিচলিত বিশাল নিতম্বের ভরে তার গতিরোধ হল, বেগবশে কম্পমান কেশবন্ধ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফুল ঝরে পড়তে লাগল। কিছুদূর গিয়ে ধরে ফেলল কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল, চোখ মুছতে গিয়ে চোখের চার পাশ অঞ্জনলিপ্ত হল। কৃষ্ণকে ভয়ার্ত দেখে বুঝি মায়া হল যশোদার, লাঠি ছেড়ে বাঁধতে গেল দড়ি দিয়ে। যাঁর অভ্যন্তর-বাহ্য নেই, পূর্ব-পর নেই, যিনি জগতের বাহ্য ও পূর্ব-পর, যিনি নিজেই জগন্ময়, সেই অর্ভকরূপধারী অব্যক্ত অধোক্ষজকে সামান্য পুত্র মনে করে বাঁধল উদূখলের সঙ্গে, কিন্তু দড়ি দু আঙুল ন্যূন হল। অপর রজ্জু যোগ দিয়েও ন্যূনতার পূরণ হল না। গোপীদের গৃহে যত রজ্জু ছিল সমস্ত একত্রিত করেও না। যশোদা বিস্মিত লজ্জিত ক্লান্ত ঘর্মাপ্লুত বিস্রস্ত হয়ে গেল। তখন কৃষ্ণ কৃপা করে স্বয়ংবদ্ধ হল। হরি আত্মবশ হয়েও ভক্তিবশ। এ প্রসাদ আত্মভূত গুণীরা নয়, একমাত্র অনন্যনিষ্ঠ ভক্তরাই লাভ করতে পারে।

'এহোত্তম। আগে কহ আর।' প্রফুল্লনেত্রে প্রভু বললেন, 'প্রেমের আরো কোনো পরিপক্ক অবস্থা যদি থাকে, তাই বলো।'

রামানন্দ বললে, 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।'

কৃষ্ণের কাছ থেকে যে প্রসাদ ব্রজসুন্দরীরা লাভ করেছে, যে কণ্ঠাশ্লেষ, তা নিতান্তরতি লক্ষ্মীও পায়নি, স্বর্গাঙ্গনারাও পায়নি।

কৃষ্ণে লক্ষ্মীর ঈশ্বরবুদ্ধি, গোপীর আত্মবুদ্ধি। অনেকের মধ্যে

আমি একজন সেবিকা এই ভাব লক্ষ্মীর, আর কৃষ্ণ আমারই একলার, একান্ত আপন,—এইটিই গোপীভাব।

কান্তাপ্রেমই "সাধ্যাবধি।" গুণাধিক্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বাদাধিক্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ।

'পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।' শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে, বাৎসল্যের গুণ মধুরে। শান্তের একটি গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা। দাস্যে দুটি—কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই, তার উপরে সেবানিষ্ঠা। সখ্যে দাস্যের দুটি গুণ তো আছেই, তদুপরি অসঙ্কোচ অভিন্নমনন। বাৎসল্যে সখ্যের তিনটি গুণ তো আছেই, অধিকন্তু আছে মমত্ব-বুদ্ধিতে শাসন-ভর্ৎসন। মধুরে বা কান্তারতিতে বাৎসল্যের চারটি গুণ তো আছেই, তা ছাড়া আছে—অঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা—যা বাৎসল্যে অপ্রকট। সেই কারণে মধুরেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি। মধুরই পরাকাষ্ঠা।

'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥'

'আরো যদি থাকে তো আরো বলো।'

'আরো বলব? এর পর আরো আছে?'

'আছে।' বললেন প্রভু, 'কৃপা করে বলো শুনি।'

'সন্দেহ কী, আমার মুখে তুমিই বক্তা, আবার তুমিই শ্রোতা।' বললে রামানন্দ, 'কান্তাপ্রেমের মধ্যে রাধার প্রেমই শিরোমণি।'

রাসমঞ্চে প্রত্যেক গোপীর পাশে শ্রীকৃষ্ণ। রাধার পাশেও এক মূর্তি। সর্বত্রই যদি সমভাব, তা হলে আর রাধিকা অসামান্যা কিসে? রাধিকার মান হল। রাসমণ্ডলী ছেড়ে চলে গেল একা-একা। কৃষ্ণও উতলা হয়ে তাকে খুঁজতে বেরুল। যাকে সকলে খোঁজে, সেই আজ অনুসন্ধানে তৎপর। যে আকর্ষী, সেই আজ আকৃষ্ট।

কিন্তু কাকে খুঁজছে? খুঁজছে সমস্ত আরাধনার ধন রাধিকাকে। ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে। এখন কৃষ্ণের

রাধাভিসার। মুখে রাধানাম, হৃদয়ে রাধাভাব, সমস্ত জগৎ বিরহতন্ময়। ভগবানের সেবা করতে না পারলে ভক্ত যেমন উৎকণ্ঠিত, তেমনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে না পারলে ভগবানও উৎকণ্ঠিত। তাই কৃষ্ণ রাধার ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিয়ে রাধাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় সে সর্বস্বা, কোথায় সে সর্বেশ্বরী ?

'বলো', আরো কিছু বলো।'

'আমি বলব ?' রামানন্দ কাতরমুখে বললে।

'হ্যাঁ, তোমার কাছে এসেই তো রসবস্তু কী বুঝতে পারলাম।' প্রভু বললেন, 'এবার তবে রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করো।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি যা বলাচ্ছ, তাই বলছি। হৃদয়ে প্রেরণা দিচ্ছ, তাই কথা হয়ে আসছে মুখ দিয়ে। ভালো-মন্দ কী বলছি কিছুই জানি না। 'হৃদয়ে প্রেরণ করো জিহ্বায় বহাও বাণী। কি কহিয়ে ভালো-মন্দ কিছুই না জানি॥' '

প্রভু বললেন, 'আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি কী জানি না। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে সার্বভৌম এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি আমাকে এত স্তুতি করছ কেন ? আমি ব্রাহ্মণ বলে, না, সন্ন্যাসী বলে ? শোনো, যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু। তুমি কৃষ্ণজ্ঞ, তাই তুমি অব্রাহ্মণ হলেও, গৃহী হলেও, গুরু। সুতরাং শোনাও আমাকে কৃষ্ণকথা।'

রামানন্দ বললে, 'সূত্রধারের ইঙ্গিতে নট নাচে, তেমনি আমি নট, তুমি সূত্রধার। তুমি বীণাধারী, আমি তোমার হাতে বীণাযন্ত্র।'

'এ সব কথা রাখো, কৃষ্ণকথা আরম্ভ করো।'

রামানন্দ বলতে লাগল :

'কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান। সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত অবতারের মূল। সচ্চিদানন্দতনু। রসে, শক্তিতে ও ঐশ্বর্যে সর্বাতিশায়ী।

কৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন। যে মত্ততা জন্মায় সে মদন। যে

প্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মায়, সে প্রাকৃত মদন আর যে অপ্রাকৃত বস্তুতে লালসা জাগায়, সে অপ্রাকৃত মদন। প্রাকৃত মদনে কাম্যবস্তু লাভের পরে লালসা প্রশমিত হয়। আস্বাদনেও নূতনত্ব থাকে না। কিন্তু কৃষ্ণকামনায় কৃষ্ণকে যত আস্বাদন করা যায়, ততই লালসা বাড়তে থাকে। যত পান তত পিপাসা। কৃষ্ণমাধুর্য নিত্য নবায়মান।

সমস্ত রসের বিষয়-আশ্রয় কৃষ্ণ। অখিলরসামৃতমূর্তি। সকল রসের রাজস্বরূপ শৃঙ্গার, আর তারই প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ। সকলের চিত্তহর, সকলের তো বটেই, এমন কি নিজেরও। 'আত্মপর্যন্ত সর্ব-চিত্তহর।' নিজের রূপে নিজেই বিভোর। এত বিভোর যে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গন করতে উন্মুখ।'

প্রভু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার রাধাতত্ত্ব বলো।'

'রাধিকা সেই শক্তি—যা কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে। শুধু কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণভক্তকেও সুখাস্বাদন করায়। হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম, আনন্দ-চিন্ময়-রস। আর প্রেমের সার মহাভাব। আর মহাভাব-রূপাই রাধিকা। প্রেমে দেহ গড়া প্রেমের প্রতিমা। তার কাজ কী? কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই তার কাজ। সর্বদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করছে। কৃষ্ণের নাম গুণ যশ শোনাই তার কর্ণভূষণ। নাম গুণ যশের প্রবাহই তার সুখের মধুধারা। তার মাধ্যমেই কৃষ্ণ নিজেকে নিজে আস্বাদন করে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণের গতি নেই। রাধার গুণের পার পাওয়াও কৃষ্ণের অসাধ্য।

কৃষ্ণের প্রণয়ের উৎপত্তি-ভূমি কে? একা রাধিকা। কৃষ্ণের প্রেয়সী কে? অনুপমগুণা একা রাধিকা। রাধিকার কেশে কুটিলতা, নয়নে তরলতা, কুচে কঠিনতা—একা রাধিকাই কৃষ্ণের সমগ্র বাসনা পূর্ণ করতে সমর্থা, আর কেউ নয়।

সত্যভামা সকলের চেয়ে সৌভাগ্যবতী হয়েও রাধার সৌভাগ্য কামনা করে। ব্রজরামা রাধার কাছে কলাবিলাস শিখতে চায়।

পতিব্রতাদের মুকুটমণি অরুন্ধতী রাধার পাতিব্রত্য অভিলাষ করে। আর শ্রীমতী লক্ষ্মী ভাবে, হায়, আমার যদি রাধার মত রূপ থাকত!

প্রভু বললেন, 'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব জানলাম। এবার রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব শোনাও।'

রামানন্দ বললে, 'কৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব হল নিরন্তর কামক্রীড়া, অবিচ্ছিন্ন প্রেমের খেলা।'

এক মুহূর্তও খেলা ছাড়া নেই সে। রক্তকপত্রকের সঙ্গে কখনো দাস্যরসের খেলা, যশোদা রোহিণীর সঙ্গে বাৎসল্যরসের খেলা, শ্রীদাম সুদামের সঙ্গে সখ্যরসের খেলা, আর রাধাচন্দ্রাবলীর—ললিতা বিশাখার সঙ্গে মধুর রসের খেলা। কুঞ্জক্রীড়া। খেলাছুট নয় কখনো কৃষ্ণ। সে বিদগ্ধ, ধীর ললিত, নবীন তরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিরুদ্বেগ, আর যে প্রেয়সীর যে রকম প্রেম, সেই প্রেয়সীর প্রেমে সেইরকম বশীভূত।

'যা বলছ তা ঠিক।' বললেন প্রভু, 'তবু দেখ আরো কিছু আছে কিনা।'

'এর বাইরে আমার আর বুদ্ধিগতি নেই। তবে একটি প্রেম-বিলাসের কথা তোমাকে বলি,' বললেন রামানন্দ, 'জানি না তা তোমার মনোগত হবে কিনা।'

এই বলে স্বরচিত একটি গান ধরল রামানন্দ :

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনু দিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
ও সখি! সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুধামে কহবি, বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
দুহুঁ বেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥

অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি ॥

তাকে দেখলাম কি না দেখলাম, চক্ষের পলকে অনুরাগ জন্মাল। সে অনুরাগ নিরবধি বেড়েই চলল। কে জানে, এ অনুরাগ জন্মের আগে থেকেই ছিল কিনা। কে জানে, এ অনুরাগ বুকে নিয়েই জন্মেছি কিনা। নইলে চোখ মেলেই যেন কৃষ্ণমুখ দেখি, কৃষ্ণমুখ না দেখে চোখ খুলব না—এই সঙ্কল্পে চোখ বন্ধ করে জন্মেছিলাম কেন?

আমি রমণী, সে পুরুষ: সে স্বামী, আমি স্ত্রী—এই সম্বন্ধ থেকে অনুরাগ নয়। তুমি-আমি তখন কোন ভেদবুদ্ধি নেই, নেই কান্ত-কান্তার সীমারেখা। প্রেমের পেষণে মীনকেতু দুজনকে একজন করে ফেলেছে। এক দেহ দুই প্রাণ। এক দেহে দুই মনের খেলা, কখনো কৃষ্ণ কখনো রাধা, কখনো ভগবান কখনো ভক্ত।

এই মিলন ঘটাতে দূতী খুঁজতে হয়নি। শুধু জন্মের আগে থেকেই পরস্পরের যে নিদারুণ উৎকণ্ঠা, তাই আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে। পৌঁছে দিয়েছে পরিপূর্ণতায়।

প্রভু বুঝি এবার ধরা পড়ে যান—সেই আশঙ্কায় নয়, সেই আনন্দে, প্রভু রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। আর নয়, আর হবে না বলতে।

'এই সাধ্যবস্তুর শেষ সীমা।' বললেন প্রভু, 'তোমার অনুগ্রহে জানতে পারলাম পুরোপূরি।'

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু অবধি এ হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥'

'তবে এবার বলো এই সাধ্যবস্তু কি করে পাওয়া যায়? এবার বলো সাধকের কথা।'

রামানন্দ দেখল প্রভুর আর সন্ন্যাসীরূপ নেই। এক শ্যামল কিশোর দাঁড়িয়ে আছে মুখে বাঁশি নিয়ে। সামনে এক কাঞ্চন-

পঞ্চালিকা—স্বর্ণবর্ণা প্রতিমা। ও কি, প্রতিভার উজ্জ্বল গৌরকান্তিতে শ্যামল কিশোরের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

'মনে প্রবল সংশয় জাগছে।' স্থির স্বরে বললে রামানন্দ, 'তোমাকে তো আগে সন্ন্যাসী দেখেছিলাম, এখন তোমার মধ্যে শ্যামগোপরূপ দেখছি কেন? দেখছি তার সামনে এক কাঞ্চন-প্রতিমা, আর প্রতিমার অঙ্গ-কান্তিতে তুমি ঢাকা পড়েছ। এর অর্থ কী?'

প্রভু বললেন, 'এ কিছু নয়, এ তোমার চোখের ভ্রমমাত্র। রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রেম, তাই আমার মধ্যেও তুমি তোমার সেই ইষ্টের প্রকাশ দেখছ। যারা মহাভাগবত, স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্রই তারা ইষ্টস্ফূর্তি দেখে। তাই যা দেখছ তা আমার রূপ নয়, তোমারই প্রেমচক্ষুর প্রসাদ।'

রামানন্দ আর ভুলবে না ছলনায়। বললে, 'প্রভু, তোমার চতুরালি এবার ছাড়ো। আর আত্মগোপন কোরো না। আমি এতক্ষণে নিঃসংশয় হয়েছি। তুমি রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকৃত করে অবতীর্ণ হয়েছ, গৌরকান্তিতে শ্যামকান্তিকে আচ্ছন্ন করেছ, নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করবে বলে। প্রেমভক্তি বিতরণ করে নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেমময় করবে বলে। তোমাকে বুঝতে আর আমার বাকি নেই।'

'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥'

'হেথায় চৈতন্য পাব হোথা রাধাকৃষ্ণ।' তত্ত্বতঃ ও স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণ একই বস্তু, শুধু লীলারস আস্বাদনের জন্যে দুই রূপ ধরেছেন। এক আত্মা দুই দেহ। রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। সর্বশক্তিবরীয়সী রাধার প্রাণপুরুষ বলেই কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। কৃষ্ণ

যখন দ্বারকায় তখন তিনি পূর্ণতর, যখন ব্রজে তখন পূর্ণতম। ব্রজে রাধাও তাই সর্বশক্তি-অংশিনী, পূর্ণতমা।

তাই কৃষ্ণের পক্ষে রাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের একীভূতত্বের মূর্তিই গৌরহরি। জগজ্জীবকে প্রেমভক্তি শেখাবার জন্যেই এই আবির্ভাব। পরা ঠাকুরানী রাধিকাই কৃষ্ণের সর্বেচ্ছাপূরণী শক্তি, রাধিকার ভাবকান্তি না নিলে নিজের মাধুর্যের আস্বাদন হয় কী করে? কৃষ্ণের সর্ববিধ কামনা পূরণের যোগ্যতা আর কার?

তাই নবদ্বীপে ভগবান গৌরাঙ্গসুন্দর। নামেও চৈতন্য, স্বরূপেও চৈতন্য।

কৃষ্ণলীলা আর গৌরলীলা একই অদ্বয়তত্ত্ব। একই লীলার দুই বৈচিত্রী। কৃষ্ণলীলায় রাধাকৃষ্ণ দুই ভিন্ন দেহ। গৌরলীলায় কৃষ্ণ রাধার গৌর-অঙ্গ দ্বারা আচ্ছাদিত। 'গৌর অঙ্গ নহে মোর— রাধাঙ্গস্পর্শন।' রাধার দ্বারা প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত বলেই বাইরে এই গৌরকান্তির বিভাসা। 'তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।' তারই জন্যে আমার এই 'বাতুল চেষ্টা', এই উন্মাদনা।

দ্বাপর লীলায় অসুর সংহার করেছেন, কলিলীলায় অসুরত্বকে সংহার করেছেন। কৃষ্ণলীলায় উপযাচক হয়ে কাউকে প্রেম দেননি, গৌরলীলা তো নির্বিচার ও নিরর্গল প্রেমভক্তি বিতরণেরই ইতিহাস। আর, গৌরের এমন কৃপা যে তা খুঁজতে পর্যন্ত হয় না। রূপ লীলা আর করুণার বিশিষ্টতম বিকাশই নবদ্বীপলীলার। 'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।' চৈতন্যের চেয়ে মহত্তর পরতত্ত্ব আর কিছু নেই।



৪৬

রামানন্দ বললে, 'প্রভু, তোমার স্বরূপ উন্মোচন করো।'

প্রভু হাসলেন। দেখালেন তাঁর স্বরূপ। 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' শৃঙ্গাররসরাজ কৃষ্ণ আর মহাভাবস্বরূপিনী রাধিকা—দুয়ে মেলামেশা এক অপূর্ব মূর্তি।

মহানন্দে রামানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

হস্তস্পর্শে প্রভু তাকে সচেতন করলেন। বললেন, 'তুমি ছাড়া এ-রূপ কেউ পায়নি দেখতে। আমার তত্ত্বলীলারস তোমার কাছে প্রকট, তাই তোমার কাছেই এ রূপ প্রকাশিত হল। শোনো—এ কথা কাউকে বোলো না। বললে লোকে শুধু আমাকে পাগল বলবে না, তোমাকেও পাগল বলবে। দুইজনে সমান উপহাসাস্পদ হব।'

দশ দিন থাকলেন বিদ্যানগরে। প্রতি রাত্রে মিলিত হয়ে দুজনে বিচিত্র কৃষ্ণকথায় মত্ত হয়ে রইলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব গোপীতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব—ব্রজের নিগূঢ় রসলীলাব বিচারে বিস্তারে আনন্দের অবধি রইল না।

'এবার আমি যাই।' প্রভু বিদায় চাইলেন। 'তুমি বিষয়কার্য ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে গিয়ে থাকো।'

'নীলাচলে?'

'হ্যাঁ, আমি তীর্থ সাঙ্গ করে নীলাচলে যাব। সেখানে দুজনে থাকব একসঙ্গে।' প্রভু হাসলেন, 'আর দুজনে কৃষ্ণকথারঙ্গে দিন কাটাব।'

রামানন্দকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। শোকাকুল হয়ে রামানন্দ

ঘরে ফিরল। 'দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুভার? কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥' এমন সঙ্গ হারিয়ে আমি কোন জনারণ্যে ঘুরে বেড়াব? বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগল রামরায়।

সমুদ্র কী করে? নিজের জলই মেঘে সঞ্চারিত করে, আবার নিজেই তা মেঘের থেকে আকর্ষণ করে নেয়। প্রভুও তাঁর নিজের ভক্তিসিদ্ধান্ত পরম ভক্ত রামানন্দে সঞ্চারিত করে আবার রামানন্দের থেকে গ্রহণ করে অনুভবানন্দ সম্ভোগ করলেন। ভক্তের মুখ থেকে ভক্তির কথা ভক্তিরসায়িত চিত্তে শোনা আরেক আনন্দ। জঠরে যতক্ষণ ক্ষুধা ও রসনায় পিপাসা ততক্ষণই খাদ্যপেয় সুখপ্রদ। প্রাণে যখন প্রেম তখনই আর্তবন্ধু কৃষ্ণ বিগলিত। সেই ভক্তিরসভাবিতা মতি কেনা যায় শুধু লালসার মূল্যে, কৃষ্ণসেবার লালসা। মহৎকৃপা বা সাধুসঙ্গ ছাড়া সে লালসা জাগে কই?

বিদ্যানগরের লোকদের বৈষ্ণব করে প্রভু চললেন দাক্ষিণাত্যে।

যাবার আগে হনুমানের বিগ্রহকে প্রণাম করলেন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম।

গৌতমী গঙ্গায় স্নান করলেন। এলেন মল্লিকার্জুনে। মহেশ দর্শন করলেন। সেখান থেকে অহোবল। সেখানে নৃসিংহ দর্শন করে অনেক নতি-স্তুতি করলেন। সিদ্ধবটে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, সীতাপতি রঘুনাথকে দেখলেন।

মুখে নিরন্তর রামনাম, এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল যুক্ত করে। কৃপা করে আমার ঘরে যদি ভিক্ষা পান, নিমন্ত্রণ করল সবিনয়ে।

রামনাম ছাড়া অন্য কথা বলে না, ব্রাহ্মণে আকৃষ্ট হলেন প্রভু। তার ঘরে অতিথি হয়ে রাত কাটালেন। রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম।

পরদিন চললেন আরো দক্ষিণে। স্কন্দক্ষেত্রে এসে স্কন্দ দর্শন করলেন। ত্রিমঠে এসে দেখলেন ত্রিবিক্রমকে।

ফিরে এলেন সিদ্ধবটে, সেই রামভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এ কি, ব্রাহ্মণ দেখি এখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম বলছে!

'এ তোমার কোন দশা!' বললেন প্রভু, 'আগে তুমি সর্বদা রামনাম করতে, এখন হঠাৎ কৃষ্ণনাম বলতে সুরু করেছ কেন?'

ব্রাহ্মণ বললে, 'প্রভু, তোমার দর্শনপ্রভাবে আমার আজন্মের স্বভাব দূর হয়ে গেল। আমি বাল্যকাল থেকে রামনাম করছি, তোমাকে দেখে একবার কৃষ্ণনাম মনে এল। মনে আসতেই জিভে এল, আর বিনা চেষ্টায়ই বারে বারে স্ফুরিত হতে লাগল। শাস্ত্রমতে রামও পরব্রহ্ম, কৃষ্ণও পরব্রহ্ম, কিন্তু শাস্ত্রই বলছে রাম-নামের চেয়ে কৃষ্ণ-নামের মাহাত্ম্য বেশি। তবু আমি যে রাম-নাম করতাম তার কারণ রাম আমার ইষ্টদেব, কিন্তু তোমাকে দেখে যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কৃষ্ণনাম মুখে এসে গেল, তখনই বুঝলাম সে নামের কী মহিমা।'

'ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাইয়া সেই নাম নিরন্তর গাই॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল॥'

প্রভু হাসতে লাগলেন।

'তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।' ব্রাহ্মণ প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

সেখানে একদিন থেকে প্রভু গেলেন বৃদ্ধকাশী। সেখানে শিবদর্শন করলেন।

চললেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করো।

অরসিক কাক আমের মুকুল খায় না, নিমফল খায়। তেমনি জ্ঞানমার্গের সাধকেরা প্রেমরসের মর্ম না জেনে শুষ্ক জ্ঞানের নিমফল কামনা করে। আর যে ভক্ত, ভক্তিরসে অভিজ্ঞ, সে কৃষ্ণপ্রেমের আম্রমুকুল ভালোবাসে।

'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগীয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥'

ভাগবতোত্তম কে? যিনি সর্বভূতে নিজের উপাস্য ভগবানের বিদ্যমানতা দেখেন, ভগবানেও দেখেন সর্বভূতকে, তিনিই ভাগবতোত্তম।

কৃষ্ণস্মরণে গোপিনীর রোমাঞ্চ। সে যখন কৃষ্ণকে হৃদয়ে অনুভব করে আনন্দে কাঁদে, তার মনে হয় পুষ্পফলাঢ্যা পুলকিতদেহা বনলতা কৃষ্ণকে ভেবেই মধুক্ষরণ করছে। হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম জাগলে তরুলতাকেও নিজের মত প্রেমহৃষ্টতনু বলে অনুভব জাগে।

সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হয়ে গেল। তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদীর দল যুদ্ধং দেহি বলে আসতে লাগল এগিয়ে। নিয়ে এল শাস্ত্রস্তূপ, সাংখ্য পাতঞ্জল শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম—অনেক পাণ্ডিত্যের কোলাহল। কিন্তু তর্ক করবে কার সঙ্গে? এ যে সকল শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সকল শাস্ত্রে পারঙ্গম। সৌন্দর্যে-মাধুর্যে ব্যক্তিত্বে-বৈদগ্ধ্যে দীপ্তিমান।

সকলের মত অভ্রান্ত বুদ্ধিতে খণ্ডন করলেন প্রভু। নিরস্ত করলেন সমস্ত তর্ক। বিরুদ্ধবাদীরা পরাস্ত হতে-হতে প্রভুর সিদ্ধান্তে এসে প্রবেশ করল। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হল সর্বত্র।

এবার নিরীশ্বরবাদীরা এগিয়ে এল দম্ভভরে। সুরু হল মহা তর্কযুদ্ধ। হ্যাঁ, তর্কের অযুক্তিকে পরাভূত করব। দেখিয়ে দেব ভ্রম-প্রমাদ।

বৌদ্ধশাস্ত্র নব প্রস্থানের ভিত্তিতে সুরু করল বাদানুবাদ। প্রভু যুক্তিতর্কেই সমস্ত খণ্ডন করলেন। বিরুদ্ধবাদীদের আচার্য পরাস্ত হয়ে অধোমুখ হল। তাদের দলের লোক আচার্যকে উপহাস করতে লাগল। তখন সকলে কুমন্ত্রণায় বসল, কী করে এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

একথালা অপবিত্র অন্ন প্রভুর সামনে রেখে বললে, 'আপনার জন্যে এই বিষ্ণুপ্রসাদ এনেছি, গ্রহণ করুন।'

সবাই ভেবেছিল, প্রসাদ বলে যাই দেওয়া যাবে, তাই বৈষ্ণব অপ্রতিবাদে গ্রহণ করবেন।

কিন্তু অঘটন ঘটল। কোত্থেকে এক মহাকায় পাখি এসে ঠোঁটে করে থালা নিয়ে উড়ে পালাল। না, পালায় নি। থালার সেই অমেধ্য অন্ন বৌদ্ধদের উপর বর্ষণ করল আর থালা ছুঁড়ে মারল আচার্যের মাথা লক্ষ্য করে। মাথা কেটে গেল আচার্যের। আচার্য মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শিষ্যগণ শিরে করাঘাত করে হাহাকার করতে লাগল। সন্দেহ কি, মহতের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করারই এই প্রতিফল।

তখন প্রভুপদে শরণ নিল বৌদ্ধরা। বললে, 'তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমাদের অপরাধ মার্জনা করো। বাঁচাও আমাদের গুরুকে। করুণায় উদারধী হও।'

প্রভু বললেন, 'গুরুকর্ণে কৃষ্ণনাম বলো, তোমরাও সকলে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি বলো উচ্চকণ্ঠে, তোমাদের গুরুর চেতনা ফিরে আসবে।'

তথাস্তু। শিষ্যরা সমস্বরে কৃষ্ণকীর্তন করতে লাগল আর গুরুর কানে বলতে লাগল, কৃষ্ণ বলো, রাম বলো, হরি বলো।

চেতনা পেয়ে আচার্য বলে উঠল—হরি হরি। আর প্রভুকে স্তব করতে লাগল,—তুমিই কৃষ্ণ। তুমিই কৃষ্ণ।

অকস্মাৎ প্রভু সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। উপস্থিত হলেন ত্রিমল্লে। চতুর্ভুজ বিষ্ণু দর্শন করে গেলেন বেঙ্কটাচলে। সেখান থেকে ত্রিপদীতে এসে রাম দর্শন করলেন। সেখান থেকে পানা-নরসিংহে এসে দেখলেন নৃসিংহকে। তারপর পৌঁছুলেন শিব-কাঞ্চীতে। শিবকাঞ্চীতে শিব দেখে বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করলেন। দিন দুই থাকলেন সেখানে, প্রেমাবেশে করলেন অনেক নৃত্যগীত।

পৌঁছুলেন ত্রিকালহস্তি-স্থানে, সেখানে মহাদেবকে প্রণাম করলেন। আবার শিব দর্শন করলেন পক্ষীতীর্থে। বৃদ্ধকোলে দেখলেন শ্বেতবরাহ, পীতাম্বর শিব আর শিয়ালী ভৈরবী। তারপর উপনীত হলেন কাবেরীতীরে। সেখানে এসে দর্শন করলেন গো-সমাজ-শিব, বেদাবনে মহাদেব, অমৃতলিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষ্ণু, কুম্ভকর্ণকপালের সরোবর, শিবক্ষেত্রের শিব আর পাপনাশনের বিষ্ণু। সমস্ত দেখে পৌঁছুলেন শ্রীরঙ্গমে।

শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে মিলন। বেঙ্কটভট্ট শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, নারায়ণ-পরায়ণ। প্রভুকে বহুমানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল স্বগৃহে। স্ববংশে তাঁর পাদোদক খেল। ভিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু কিছুটা সুস্থ হলে ভট্ট বললে, 'চাতুর্মাস্য কাছে এসে পড়েছে, কৃপা করে এই চার মাস অধীনের ঘরে অবস্থান করুন। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে নিস্তার করুন আমাকে।'

রাজি হলেন প্রভু। ভট্টগৃহে নিত্য আরম্ভ হল কৃষ্ণনাম গান, কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ। হাজারে হাজারে লোক আসতে লাগল প্রভুর দর্শনে, নামকথায় লুব্ধ হয়ে। কৃষ্ণ নাম ছাড়া কারু মুখে আর কথা নেই, কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া মনে নেই আর কোনো বাসনা। যে প্রভুকে দেখে, সেই যেন কৃষ্ণকে দেখে, পলকে সমস্ত দুঃখশোক খণ্ডে যায়।

এক ব্রাহ্মণ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে বসে তন্ময় হয়ে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় আবৃত্তি করে। আর ভক্তিতে বিগলিত হয়ে কাঁদে। দেহে কখনো কম্প, কখনো রোমাঞ্চ, সে এক অদ্ভুত প্রেমাবেশ! কিন্তু তার সংস্কৃত-জ্ঞান নেই। শুদ্ধাশুদ্ধ যেমন শিখেছিল তেমনি বলছে অকুণ্ঠে। অশুদ্ধ পাঠ শুনে সকলে উপহাস করছে, তাতে চাঞ্চল্য নেই এতটুকু। আবেশে অব্যাহত হয়ে আছে।

প্রভুর মহা আনন্দ হল দেখে। জিগগেস করলেন, 'পাঠের সময় আপনার এত আনন্দের হেতু কী? কোন অর্থ বুঝে আপনার এত সুখ, এত সাত্ত্বিক বিকার?'

ব্রাহ্মণ বললে, 'প্রভু, আমি মূর্খ, আমি শব্দার্থের কিছুই জানি না। আমি শুধু দেখি অর্জুনের রথে শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ রজ্জুধর হয়ে বসে অর্জুনকে হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন। তাই দেখে আমার আনন্দ। আমি সংস্কৃতের কী-ই বা জানি, কী-ই বা বুঝি তার ব্যাকরণ। যাবৎ পড়ি তাবৎ কৃষ্ণদর্শন হয়, তাই তো ছাড়তে পারি না গীতাপাঠ।'

প্রভু ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'গীতাপাঠে তোমারই অধিকার। তুমিই বুঝেছ গীতার সার অর্থ।'

প্রভুর পা ধরে ব্রাহ্মণ বললে, 'অর্জুনের রথে কৃষ্ণকে দেখে আমার যে আনন্দ, তোমাকে দেখে তার চেয়ে আমার দ্বিগুণ আনন্দ। আমার মন বলছে তুমিই সেই রথারূঢ়।'

প্রভু বললেন, 'এমন কথা মুখেও এনো না।'

চার মাসে এক একদিন এক এক ব্রাহ্মণের ঘরে প্রভুর নিমন্ত্রণ, সেই গীতাধ্যায়ী বিপ্র প্রভুর সঙ্গ ছাড়ল না। ছায়ার মতন ফিরতে লাগল পিছে পিছে।

বেঙ্কট ভট্টের ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা। একদিন প্রভু ভট্টকে জিগগেস করলেন, 'তোমার লক্ষ্মী তো নারায়ণের বক্ষোবিহারিণী। পতিব্রতার শিরোমণি, তিনি আবার গোয়ালা কৃষ্ণ—রাখাল কৃষ্ণের সঙ্গমের জন্যে কেন তপস্যা করতে বসলেন?'

ভট্ট বললে, 'কৃষ্ণে আর নারায়ণে ভেদ নেই। স্বরূপত এক। কৃষ্ণে লীলামাধুর্য বেশি। তাই আমার লক্ষ্মী যদি কৌতুকে কৃষ্ণরূপের প্রতি অভিলাষ করে, তাতে তার পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ হয় না।'

'তা হয় না। কিন্তু তপস্যা করেও লক্ষ্মী রাসলীলায় স্থান পেল না কেন? কেন পেল না কৃষ্ণসঙ্গ?'

'তা আমি কী জানি। কেন তুমি লক্ষ্মীকে সঙ্গ দাও নি, তা তুমিই বলতে পারো।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'কৃষ্ণের এক অদ্ভুত স্বভাব এই যে, সে স্বমাধুর্যে সর্বদা সকলকে আকর্ষণ করে থাকে, মানুষ থেকে স্থাবর

জঙ্গম পর্যন্ত। এমন কি, নিজেকেও। 'স্বমাধুর্যে করে সদা সর্ব আকর্ষণ।' এ বৈশিষ্ট্য নারায়ণে নেই। কৃষ্ণকে ব্রজজনেরা ঈশ্বর মনে করে না, আপনজন মনে করে। গোপীভাব ভজন করে গোপীদেহ প্রাপ্ত না হলে কৃষ্ণের প্রেয়সী হওয়া সম্ভব নয়। 'গোপ-জাতি কৃষ্ণ—গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥' লক্ষ্মী দেবী-দেহেই কৃষ্ণ সঙ্গম চেয়েছিল, তাই ব্যর্থ হল। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, নারায়ণ তার বিলাসমূর্তি। তাই কৃষ্ণ লক্ষ্মীরও মনোহরণ করতে সমর্থ। তোমার নারায়ণ গোপীর মনোহরণ করতে সমর্থ নয়।'

বেঙ্কট ভট্টের মনে গর্ব ছিল তার নারায়ণপূজনই বৈষ্ণবের সর্বোচ্চ ভজন। পরিহাসচ্ছলে প্রভু তার গর্ব নষ্ট করে দিলেন।

দেখলেন ভট্টের মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছে। তখন তাঁর সিদ্ধান্তের গূঢ়ার্থ উন্মোচন করলেন: 'ঈশ্বরত্বে ভেদ নেই। একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ একই বিগ্রহে নানারূপ ধরে। লক্ষ্মী দেবী-দেহে কৃষ্ণসঙ্গ পায়নি বটে, কিন্তু গোপীদেহে পেয়েছে। গোপীদেহে লক্ষ্মীই তো রাধিকা। রাধায় ও লক্ষ্মীতে স্বরূপত কোনো ভেদ নেই। তাই রাধা যখন কৃষ্ণসঙ্গ পেল, তখন লক্ষ্মীও কৃষ্ণসঙ্গই পেল। নীল-পীত বহুরূপ ধারণ করলেও বৈদূর্যমণি যেমন অক্ষুণ্ণ মণিই থাকে, তেমনি ভক্তের ধ্যানভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হলেও অচ্যুত অচ্যুতই থাকেন, নিজেকে ন্যূন করেন না।'

'একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥'

ভট্ট প্রসন্ন হল। বললে, 'ঈশ্বরের অগাধ লীলার আমি কী জানি! তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি যা বলছ তাই সত্য বলে মানছি। বুঝতে পারছি লক্ষ্মীনারায়ণ আমাকে পূর্ণ কৃপা করেছেন, তাই তোমার চরণ দর্শন পেলাম। বুঝলাম কৃষ্ণ-ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন।'

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হল। শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে রঙ্গনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে প্রভু চললেন দক্ষিণে। এ কে? সঙ্গে আবার এ কে জুটেছে? এ কী, কাঁদছে নিরর্গল।

প্রভু চিনতে পারলেন। বেঙ্কটের কিশোর পুত্র গোপাল।

'এ কী, কাঁদছ কেন?'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাব। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হব।'

এতদিন প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছে গোপাল। তাঁর সংসর্গে থেকে তাঁরই কৃপায় হৃদয়ঙ্গম করেছে কাকে বলে প্রেমভক্তি, কাকে বলে উচ্চাঙ্গের সাধন ভজন। তাই সে সঙ্গ ছাড়তে নারাজ।

প্রভু তাকে বোঝালেন। 'যতদিন বাবা মা বেঁচে আছেন, ঘরে থেকে তাঁদের সেবা করো। পরে কোরো সংসার ত্যাগ।'

ফিরে গেল গোপাল।

প্রভু পৌঁছুলেন মাদুরা জেলায় ঋষভ পর্বতে। নারায়ণবিগ্রহ দেখে ফিরছেন, লোকমুখে শুনলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী আছেন এখানে। প্রভু তখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। দেখা পেতেই তাঁর চরণবন্দনা করলেন। বললেন, 'বড় ইচ্ছে হয় নীলাচলে দুজনে কিছুকাল একত্র থাকি।'

'আমি গৌড়ে যাচ্ছি গঙ্গাস্নানে, সেখান থেকে আসব নীলাচলে।' বললেন পরমানন্দ।

'আর আমি সেতুবন্ধ হয়ে ফিরব পুরুষোত্তমে।' প্রভু সানন্দে বললেন, 'দুজনের দেখা হবে।'

ঋষভ থেকে প্রভু এলেন শ্রীশৈলে। সেখানে শিবদুর্গা এক ব্রাহ্মণের বেশে বিরাজ করছে। সেই ব্রাহ্মণের ঘরে তিন দিন থাকলেন প্রভু, নিভৃতে বসে দুজনে অনেক গুপ্ত কথা হল।

সেখান থেকে এলেন কামকোষ্ঠী। কামকোষ্ঠী থেকে দক্ষিণ মাদুরায়, মীনাক্ষী মন্দিরে। সেখানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা, প্রভুকে সে ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু, আশ্চর্য, রান্নার কোনোই

আয়োজন নেই। প্রভু স্নান করে এলেন, মধ্যাহ্ন উপস্থিত, তবু উনুনে আগুন দেখা যাচ্ছে না।

প্রভু জিগগেস করলেন, 'তুপুর হয়ে গেল, রান্না কোথায়?'

রামদাস ব্রাহ্মণ বললে, 'আমি বনবাসে আছি। বনে পাকের সামগ্রী তুর্লভ। লক্ষ্মণ বন্য অন্নফল শাক আনতে গেছে। সে ফিরে এলে সীতা রান্নার যোগাড় দেখবে।'

ব্রাহ্মণের ভাব বুঝে নিলেন প্রভু। অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাস্মরণ। এ উপাসনা-প্রণালী দেখে প্রভু আনন্দে ভরপুর হয়ে গেলেন। এমন ভক্তও দেখা যায় সংসারে!

লীলাস্মরণের আবেশ তৃতীয় প্রহরে তিরোহিত হল। তখন অতিযত্নে প্রভুকে ভিক্ষা দিল ব্রাহ্মণ। কিন্তু নিজে কিছুই খেল না, বিষণ্ণমনে বসে রইল।

'এ কী, তুমি খেলে না?'

'আমার জীবনে প্রয়োজন নেই। অনাহারে আমি দেহত্যাগ করব।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'রাক্ষস মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণীকে ধরেছে।' ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল: 'এই তুঃখে দেহ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, একে আর বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

প্রভু বললেন, 'সীতা ঈশ্বরপ্রেয়সী, চিদানন্দমূর্তি। প্রাকৃত হাত তাঁকে ছুঁতে পারে না, দেখতে পারে না প্রাকৃত চোখ। রাবণের কী সাধ্য তাঁকে দেখে, তাঁকে ছোঁয়। রাবণকে কুটিরদ্বারে আসতে দেখেই মায়া-সীতা রেখে সীতা স্বয়ং অন্তর্হিত হলেন। তুমি তুর্ভাবনা কোরো না, আমাকে বিশ্বাস করো।' 'অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃতগোচর।'

প্রভুর বাক্যে বিশ্বাস হল ব্রাহ্মণের। তখন সে আহার গ্রহণ করল।

কৃতমালায় স্নান করে প্রভু তারপর গেলেন তুর্বেশনে। সেখানে

রঘুনাথ দর্শন করে মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখলেন। সেখান থেকে সেতুবন্ধে গিয়ে ধনুতীর্থে স্নান করে দেখলেন রামেশ্বর। রামেশ্বরে ব্রাহ্মণসভায় কূর্মপুরাণ পাঠ হচ্ছে, শুনতে গেলেন প্রভু। পতিব্রতা-উপাখ্যান পড়ছে। কী আশ্চর্য, তিনি যেমনটি বলেছিলেন রামদাস ব্রাহ্মণকে—তেমনি অবিকল।

জগতের মাতা সীতা, শ্রীরামগৃহিণী পতিব্রতা-শিরোমণি, রাবণকে আসতে দেখেই অগ্নির শরণাপন্ন হলেন। অগ্নি তাঁকে আবৃত করে রাখল, পরিবর্তে এক মায়া-সীতা স্থাপন করে বঞ্চিত করল রাবণকে। সেই মায়া-সীতাই রাবণ হরণ করে নিল। রাবণবধ করে সীতাকে ঘরে এনে রাম যখন তাঁর অগ্নি পরীক্ষা করলেন, তখন অগ্নি সেই মায়া-সীতাকে গ্রাস করে সত্য-সীতাকে রামসকাশে এনে দিল।'

গ্রন্থের যে পত্রে এ কাহিনী বিবৃত আছে, তার প্রতিলিপি রেখে সে-মূল পত্র ছিঁড়ে নিলেন। ফিরে এলেন দক্ষিণ মাতুরায়। 'দেখ দেখ কূর্মপুরাণ কী বলে।' উৎসাহিত হয়ে প্রাচীন পত্র দেখালেন রামদাসকে।

আর সন্দেহ কী, দুঃখ কিসের! দশানন রাক্ষস সত্য-সীতাকে স্পর্শ করতে পারেনি, স্পর্শ করেছিল মায়া-সীতাকে। সত্য-সীতাকে অগ্নি রেখে দিয়েছিল বহ্নিপুরে।

প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগল বিপ্র। বললে, 'তুমিই সাক্ষাৎ রঘুনন্দন। সন্ন্যাসীব বেশে আমাকে দর্শন দিলে। তোমার কী করুণা! মহাদুঃখ থেকে আমাকে ত্রাণ করলে। পাছে তোমার মুখের কথায় আমার প্রতীতি না হয়, একেবারে প্রাচীন পুঁথির পত্র ছিঁড়ে নিয়ে এলে নিজের হাতে। প্রভু, সেদিন মনোদুঃখে তোমাকে ভালো করে খাওয়াতে পারিনি। আজ একবার পরিপূর্ণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করো।'

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। সকলকে, এমন কি নিজেকে যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। সর্ব-আকর্ষক আনন্দ-

বিগ্রহই কৃষ্ণ। নরবপু, কিন্তু দেহ প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ নয়, ঘনীভূত আনন্দই তাঁর দেহ। আবার, এ আনন্দ মায়িক বা প্রাকৃত আনন্দ নয়, এ আনন্দ চিন্ময়। 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।' কৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্যও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জগতে কাম্যবস্তু লাভের পর লালসার প্রশমন হয়। কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে লালসার অবসান হয় না, পানে-পানে পিপাসাই বাড়তে থাকে। 'তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।' আস্বাদনের পরেও কৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্য নিত্য-নবায়মান কামনা জাগায়। নিত্য-নবায়মান মত্ততা আনে। 'আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥'

কৃষ্ণের স্বরূপ তিন অংশে। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সৎ বা সত্তা-অংশে সন্ধিনী আর চিদংশে সংবিৎ। কৃষ্ণের সত্তা বা অস্তিত্ব মাতা-পিতায়, গৃহে, কুঞ্জে, শয্যায়, সিংহাসনে, তার নিত্য ধামে গোকুলে, বৈকুণ্ঠে। কৃষ্ণের সংবিৎ জ্ঞানে, ভগবত্তাজ্ঞানে। আর তার হ্লাদিনীর সার প্রেম আর প্রেমের পরমসার মহাভাব। আর মহাভাবমূর্তি রাধিকা, সর্বথাধিকা। রাধিকার দেহও অপ্রাকৃত, চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেমভাবিত। রাধিকার দেহই কৃষ্ণপ্রেম। নিজাঙ্গসৌরভালয়ে গর্বের পালঙ্কে বসে সর্বদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করছে।

রাধা সর্বকান্তাশিরোমণি। কৃষ্ণময়ী। সর্বলক্ষ্মীময়ী। দ্যোতমানা পরমসুন্দরী। অনুপমগুণা। একা যে কৃষ্ণের বাসনাপূর্তিসমর্থা। চারুললাটে সৌভাগ্যতিলক উজ্জ্বল হয়ে আছে। পতিসোহাগিনী সত্যভামা যার সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করে। যার কাছে ব্রজবামারা কলাবিলাস শেখে। লক্ষ্মী-পার্বতী সৌন্দর্যের পাঠ নেয়। শ্রেষ্ঠ পতিব্রতা অরুন্ধতী যার কাছে কামনা করে পাতিব্রত্য।

এই রাধাকৃষ্ণের একত্র রূপ গৌরহরি। অদ্বৈতের ইচ্ছায় ব্রজপ্রেম প্রচার করে কলিতে জীবকে করুণাসিঞ্চিত করবার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন।

নাম আর প্রেম। প্রেম আর নাম। ভক্তি আর সর্বসমর্পণ।



৪৭

তাম্রপর্ণীতে স্নান করে নয়ত্রিপদী দেখলেন, চিড়য়তালাতে রাম-লক্ষ্মণ। শিব দেখলেন তিলকাঞ্চীতে, গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণুমূর্তি। পানাগড়িতে সীতাপতি দেখে চামতাপুরে রামানুজ। মলয়পর্বতে কন্যাকুমারী। আমলীতলাতে আবার রাম। তারপর এলেন মল্লারে। সেখানে বামাচারী ভট্টমারিদের আস্তানা।

প্রভুর সহচর কৃষ্ণদাস ভট্টমারিদের খপ্পরে পড়ল। তারা কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ করল কৃষ্ণদাসকে। ঘরে আটকে রাখল।

'আমার পার্ষদকে তোমরা ধরে রেখেছ কেন?' গৌরহরি ভট্টমারিদের প্রশ্ন করলেন সরোষে।

'রেখেছি, বেশ করেছি। তাতে তোমার কী!' ভট্টমারিরা তেড়ে এল।

'তোমরা নিজেরা সন্নেসী হয়ে কেন আরেক সন্নেসীর বিঘ্ন করো?'

'বেশ করি।' ভট্টমারিরা অস্ত্র নিয়ে মারতে এল প্রভুকে।

'সে কি? মারবে?'

প্রভু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যার-যার অস্ত্র তার-তার হাত থেকে খসে পড়তে লাগল। পড়তে লাগল নিজের-নিজের শরীরে। আপন অস্ত্রেই আপনি ঘায়েল।

এদিক-ওদিক পালাতে লাগল ভট্টমারিরা।

বন্ধ ঘরে ঢুকলেন গৌরহরি। কী না জানি হয়, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ঘরে ঢুকে কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করলেন প্রভু। চুলে ধরে টেনে বার করে নিলেন ঘর থেকে।

তারপরে এলেন পয়স্বিনীতে। স্নান করে আদিকেশবের মন্দিরে গেলেন। সেখানে কেশবকে দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন। 'নতি-স্তুতি নৃত্য-গীত বহুত করিলা।' সেই আদিকেশব-মন্দিরে দেখতে পেলেন 'ব্রহ্মসংহিতা'। সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্রের শিরোমণি। 'অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।' সেই সিদ্ধান্তগ্রন্থের প্রতিলিপি লিখিয়ে নিলেন প্রভু। এই গ্রন্থেই কৃষ্ণের ও কৃষ্ণধামের কথা লেখা আছে বিশদ করে।

সেখান থেকে গেলেন অনন্ত পদ্মনাভে। সেখানে দিন দুই পদ্মনাভকে দেখে নর্তন-কীর্তন করে গেলেন সিংহারী বা শৃঙ্গেরী মঠে, শঙ্করাচার্যের স্থানে। অদ্বৈতবাদের প্রচারকেন্দ্রে। তারপর মৎস্যতীর্থ দেখে তুঙ্গভদ্রায় স্নান করে পৌঁছুলেন উড়ুপীতে, দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যের শ্রীপাটে।

এক বণিক দ্বারকা থেকে বেরিয়েছে নৌকো করে। নৌকোর মধ্যে গোপীচন্দন আর গোপীচন্দনের মধ্যে বালগোপালের মূর্তি। মধ্বাচার্যের শ্রীপাটের কাছে এসে নৌকো ডুবল। নৌকোর সঙ্গে গোপালও ডুবল। তখন গোপাল স্বপ্নে মধ্বাচার্যকে আদেশ করল, জল থেকে আমাকে উদ্ধার করো। উদ্ধার করল মধ্বাচার্য। দক্ষিণ কানাড়ায় সমুদ্রের কাছে উড়ুপীতে মূর্তি তুলে এনে মধ্বাচার্য গোপালের সেবা প্রতিষ্ঠিত করলে।

শঙ্করাচার্যের ঘোর বিরোধী মধ্বাচার্য। আগন্তুক সন্ন্যাসী দেখলেই তাকে শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী বলে মনে করত তত্ত্ববাদীরা। যারা দ্বৈতবাদী, তাদেরই আরেক নাম তত্ত্ববাদী। তাই প্রথমে তারা গৌরহরিকে সম্ভাষণই করল না। কে না কে এক মায়াবাদী এসেছে।

কিন্তু এ কী! গোপালকে দেখে এ তার কী প্রগাঢ় প্রেমাবেশ! এ যে নাচছে, কাঁদছে, টলে-টলে ঢলে-ঢলে পড়ছে।

সন্দেহ কী, এ সন্ন্যাসী বৈষ্ণবতম সন্ন্যাসী।

চলো, এর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করি। দেখি, এ কী বলে।

যতি ধর্ম কী, নারদ বলছেন ভাগবতে। ভিক্ষাজীবী হয়ে একাকী ভ্রমণ, এক গ্রামে একরাত্রি বাস। কৌপীনদণ্ডমাত্র ধারণ। আত্মানন্দতৃপ্ত, সর্বভূতমিত্র, শান্ত ও নারায়ণ-পরায়ণ। তার সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন। নিশ্চিত মৃত্যু বা অনিশ্চিত জীবন কাউকেই অভিনন্দন করবে না। বাদবিতণ্ডায় যোগ দেবে না, কোনো পক্ষ নেবে না। প্রলোভন দেখিয়ে শিষ্য করবে না, বহু গ্রন্থ পড়বে না, করবে না শাস্ত্রব্যাখ্যা। মঠ নির্মাণও নিষিদ্ধ। বালকস্বভাব ধরবে, থাকবে মূক হয়ে। দেখাবে তুমি উন্মাদ।

নিশ্চেষ্টকায় সর্বকর্মে নিরুদ্যম, অজগরব্রতী মুনি কী বলছে? বলছে, সংসারসঞ্চালিনী তৃষ্ণায় স্ত্রী-পুরুষ নিয়ত কর্ম করছে কিন্তু না পাচ্ছে সুখ না বা দুঃখনিবৃত্তি। আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই জীবের একমাত্র সুখ। ধন ও প্রাণ নিয়ে তার নিরন্তু আতঙ্ক। সুতরাং যা শোক মোহ ভয় ক্রোধ অনুরাগ কাতরতার মূল সেই অর্থ ও প্রাণে স্পৃহা ত্যাগ করবে। মধুকর আর অজগর আমাদের দুই গুরু। একের থেকে বৈরাগ্য ও অন্যের থেকে পরিতোষ শিক্ষা করছি। মধুকর কত কষ্টে মধু সঞ্চিত করে, অন্য লোক তা ভোগ করে। আর অজগর কী করে? উদ্যোগ করে না, যদৃচ্ছালাভে তুষ্ট থাকে। তেমনি আমিও ধৈর্য ধরে স্থিরভাবে কালযাপন করি। পাই তো খাই, না পাই তো খাই না। কখনো সুস্বাদু খাই, কখনো বা দগ্ধতিক্ত লবণাক্ত জোটে। কেউ শ্রদ্ধা করে প্রচুর দেয়, কেউ বা অপমান করে দেয় যৎকিঞ্চিৎ। তাতেই আমার সন্তোষ। কখনো তৃণে-পর্ণে ভস্মে-প্রস্তরে শুই, কখনো বা অট্টালিকায় বিলাসী পর্যঙ্কে। কখনো বসনভূষিত হয়ে চলি, কখনো বা দিগবসন। কারু নিন্দা বা স্তব কিছুই করি না। সকলেরই কল্যাণকামনা করি। আর আমার তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা বিষ্ণুতে ঐকাত্ম্যলাভ।

'কি কার্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। যেকালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥' প্রেমলাভের সাধনে সন্ন্যাসের প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বরভাবে জীবোদ্ধারের জন্যে প্রভু সন্ন্যাস নিয়েছেন। সন্ন্যাস না নিলে নিন্দুকদুর্জনেরা যে মানবে না তাঁর কথা। প্রণত হবে না। প্রণত না হলে পাপক্ষয় হবে কী করে? চিত্তশুদ্ধি হবে কী করে? ভক্তি জাগবে কী করে?

প্রভু বললেন, 'সাধ্যসাধন আমি ভালো জানি না। তোমরা একটু বলবে আমাকে বুঝিয়ে?'

তাদের আচার্য বললে, 'বর্ণাশ্রমধর্মের ফল কৃষ্ণে অর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধনেই পঞ্চবিধ মুক্তি। মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠগমন।'

পঞ্চবিধ মুক্তি কি? সার্ষ্টি—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য, সালোক্য—ভগবানের সমান স্থান, সারূপ্য—ভগবানের সমান রূপ, সামীপ্য—ভগবানের নৈকট্য, আর সাযুজ্য—ভগবানে সংমিশ্রণ।

'কিন্তু শাস্ত্র বলেন, নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন।' বললেন গৌরহরি। 'পঞ্চবিধা মুক্তির কথা কে বলে, কোন শাস্ত্র? কৃষ্ণের প্রেমসেবাই সাধ্য আর শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই সাধন। শ্রবণ-কীর্তন থেকে কৃষ্ণে প্রেম জন্মে, আর সেই প্রেমই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থসীমা—যার পরে আর কাম্য প্রাপ্য কিছু নেই।'

গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করে প্রহ্লাদ ফিরলে হিরণ্যকশিপু জিগগেস করলে, যা শিখে এলে তার মধ্যে সব চেয়ে যা ভালো তাই একটু শোনাও। প্রহ্লাদ বললে, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তি যদি বিষ্ণুকে কেউ অর্পণ করে পরে তা নিজে অনুষ্ঠান করে তবে তাই তার শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন।

শ্রবণ—নামশ্রবণেই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তে কৃষ্ণরূপের বিস্ফোরণ। কীর্তন—কীর্তনেই কৃষ্ণপ্রেমের জাগরণ। 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।' স্মরণ—লীলাস্মরণ। তার থেকেই আবার ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। পাদসেবন—চরণসেবা। বিগ্রহের দর্শন স্পর্শন, তীর্থগমন ও চরণসেবা। বৈষ্ণবসেবা তুলসীসেবাও তাই। অর্চন—পূজা। বাহ্য পূজা ও মানস পূজা। শিলাময়ী

মৃন্ময়ী দারুময়ী ধাতুময়ী বালুকাময়ী চিত্রময়ী মণিময়ী ও মনোময়ী আটরকম মূর্তি আছে, তার মধ্যে মনোময়ী বা মানসী মূর্তিটিই শ্রেষ্ঠ। বন্দন—নমস্কার। দাস্য, সখ্য—আমি কৃষ্ণের দাস, আমি কৃষ্ণের সখা এই অভিমানের থেকে ভজন। আর আত্মনিবেদন—দেহ মন প্রাণ সমস্ত কৃষ্ণে ঢেলে দেওয়া। কোনো স্বতন্ত্র চেষ্টা নেই, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই—সর্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ।

'আরো বলুন।'

'কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে।' কর্ম ভক্তির অঙ্গ নয়, কেন না, কর্মে শুধু স্বসুখানুসন্ধান। উদ্ধবকে কী বলছেন কৃষ্ণ? বলছেন, যে পর্যন্ত নির্বেদ না জন্মে কিংবা যে পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্যন্তই নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করবে। মুক্তিতে ভগবৎসেবা কই? তাই ভক্তেরা পঞ্চবিধা মুক্তির কোনো মুক্তিই কামনা করে না। 'সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য।'

অনন্তদেবের কৃপায় মহারাজ চিত্রকেতু অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। আকাশ-পথে যাচ্ছে, দেখল, মুনিদের সভায় মহাদেবও বসে আছে। কিন্তু এ কী, বসে আছে পার্বতীকে কোলে করে। শুধু কোলে করে নয়, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। চিত্রকেতু ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে মহাদেবকে বিদ্রূপ করে উঠল। এ কী আচরণ! প্রাকৃত মানুষও যে আচরণে লজ্জাবোধ করে, স্বয়ং মহাদেব, যিনি লোকগুরু, যিনি ধর্মবক্তা, তিনি কী করে তা করছেন, আর করছেন মুনিসভায় বসে! মহাদেব স্তব্ধ হয়ে রইল। স্তব্ধ মুনিরাও। কিন্তু জগজ্জননী পার্বতী এ কঠিন বাক্য সহ্য করতে পারল না, শাপ দিল চিত্রকেতুকে। বললে, তুমি অসুরযোনি প্রাপ্ত হবে। পার্বতীর শাপ যে অব্যর্থ, এ চিত্রকেতুর অজানা নয়, তবু সে বিচলিত হল না, বিমান থেকে নেমে নত মস্তকে বললে,—মা, তোমার শাপ আমি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করছি, আমাকে আমার কর্মফল ভোগ করতেই হবে। কিন্তু যে নারায়ণনিষ্ঠ, তার সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, তার স্বর্গ নরক অপবর্গ সমস্ত সমান।

তখন পার্বতীকে সম্বোধন করে মহাদেব বললে, 'দেবি দেখ, ভগবদ্ভক্তেরা কেমন নিস্পৃহ, কেমন নির্বিচল। তাদের শাপই দাও, তাপই দাও, অগ্নিকুণ্ডেই ফেল, ফেল বা সর্পমুখে—তারা নির্ভয়, নির্বিকার। তাদের কাছে স্বর্গ-নরক মুক্তি-মোক্ষ এককথা। যেহেতু ওর কোনোটাতেই ভক্তিসুখ নেই। তারা শুধু ভক্তিসুখপ্রয়াসী।'

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

'বৈষ্ণবের সাধ্য মুক্তি নয়, সাধনও কর্ম নয়।' বললেন গৌরহরি, 'তোমরা তত্ত্ববাদী, তোমরা তো এ জানো, কিন্তু কেন আমাকে বঞ্চনা করছ? কর্মী জ্ঞানী দুই-ই ভক্তিহীন, আর তোমাদের সম্প্রদায়ে কর্ম আর জ্ঞানেরই প্রশংসা। তবে তোমাদের একমাত্র গুণ তোমরা ঈশ্বরের বিগ্রহকে মায়িক মনে করো না, সচ্চিদানন্দময় মনে করো।'

প্রেমভক্তির প্রকৃতস্বরূপ বর্ণনা করলেন গৌরহরি। শাস্ত্রযুক্তিতে তত্ত্ববাদীদের গর্ব ধূলিসাৎ হল।

প্রভু ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুপুরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন বিঠ্ঠল ঠাকুরকে।

ইটের উপর বসে থাকা ঠাকুরই বিঠ্ঠল ঠাকুর।

এক ভক্ত কায়ে-মনে অখণ্ড পিতৃসেবা করছে, ভগবান তুষ্ট হয়ে তাকে দেখা দিলেন। সেবায় নিযুক্ত পুত্র অতিথিকে তখুনি অভ্যর্থনা করতে ছুটল না। হাতের কাছে একখানা ইট ছিল, তাই এগিয়ে দিয়ে বললে,—বৈঠো। হাতের কাজ সেরে আসছি তোমার খবর নিতে, ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করো।

হাতের কাজ সেরে ভক্ত এগিয়ে এসে দেখে সেই ইটের উপর কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। ভক্ত তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, বলল, সেবায় তন্ময় থেকে তোমাকে চিনতে পারিনি, আমার অপরাধ মার্জনা করো।

ভগবান বললেন,—তোমার পিতৃসেবায় আমি আনন্দিত, তুমি বর নাও।

'আর কোনো বর নয়, তুমি এইখানে এমনিভাবে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকো।'

ভুবনমোহন হাসলেন। বললেন—তথাস্তু।

বৈঠ্‌তে বলেছিল বলে ঠাকুরের নাম বিঠ্‌ঠল ঠাকুর।

এক ব্রাহ্মণ প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করল, বললে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী আছে তার অতিথি হয়ে।

বলো কী? প্রভু তখুনি চললেন বিপ্রগৃহে, দেখলেন তাঁর গুরুর গুরুভ্রাতা শ্রীরঙ্গ বসে আছে উদগ্রীব হয়ে। প্রেমাবেশে দণ্ড-প্রণাম করলেন, পুলকাশ্রু স্বেদ-কম্পের বিকার জাগল শরীরে।

'তোমার সঙ্গে আমার গুরুদেবের কি কোনো সম্পর্ক আছে?' জিগগেস করল শ্রীরঙ্গ, 'নইলে এমন প্রেমবিকার তো সম্ভব নয়।'

তার আর সন্দেহ কী। দুজনে কাঁদতে লাগল গলাগলি হয়ে।

তারপর সুরু হল কৃষ্ণকথা। কৃষ্ণানন্দ।

'তোমার পূর্বাশ্রম কোথায়?' কথাচ্ছলে জিগগেস করল শ্রীরঙ্গ।

'নবদ্বীপ।'

'জানো, মাধবপুরীর সঙ্গে আমি একবার গিয়েছিলাম নবদ্বীপ। এক সদ্‌ব্রাহ্মণ, নাম জগন্নাথ মিশ্র, আমাদের ভিক্ষে করিয়েছিলেন—একটি অপূর্ব জিনিস সেদিন খেয়েছিলাম।'

'কী?'

'মোচার ঘণ্ট। বাৎসল্যে জগন্মাতা, জগন্নাথের স্ত্রী, কত যত্ন করে আমাদের খাইয়েছিলেন। তুমি চেন তাঁদের? তাঁদের এক ছেলে অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিল—নাম শঙ্করারণ্য। এই তীর্থেই সে দেহরক্ষা করেছে।'

প্রভু বললেন, 'তিনি পূর্বাশ্রমে আমার ভ্রাতা ছিলেন। আর জগন্নাথ মিশ্রই আমার পূর্বাশ্রমের পিতা।'

বিভোর হয়ে প্রভুকে দেখতে লাগল শ্রীরঙ্গ। দ্বারকায় কী যাচ্ছি তবে কৃষ্ণ দেখতে!

শ্রীরঙ্গ দ্বারকায় চলে গেলেও প্রভু আরো চার দিন থাকলেন পাণ্ডুপুরে। তারপর এলেন কৃষ্ণবেণ্বাতীরে। শুনলেন সেখানকার বৈষ্ণবচরিত্র ব্রাহ্মণেরা বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' পড়ছে। শুনে শুনতে গেলেন একদিন।

কৃষ্ণলীলার সৌন্দর্য আর মাধুর্যের অবধিই 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।' পাঠ শুনে আনন্দময় হলেন প্রভু। পুঁথির প্রতিলিপি করিয়ে নিলেন। নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

তাপ্তীতে স্নান করে এলেন মাহিষ্মতীপুরে, নর্মদার তীরে দেখলেন নানা তীর্থ। ধনুতীর্থ দেখে নির্বিন্ধ্যাতে স্নান করলেন। তারপর এলেন দণ্ডকারণ্যে, ঋষ্যমূক পর্বতে।

কাননে সপ্ত তালবৃক্ষ। অতি-বৃদ্ধ, অতি-স্থূল, অতি-উচ্চ। প্রভু তাদের আলিঙ্গন করলেন। সপ্ততাল সশরীরে চলে গেল বৈকুণ্ঠে।

শূন্যস্থান দেখে সকলে অভিভূত হয়ে গেল। ইনি তবে সেই রাম-অবতার, করতে লাগল বলাবলি। রাম ছাড়া আর কার এমন শক্তি হবে!

প্রভু পম্পা-সরোবরে স্নান করলেন, বিশ্রাম করলেন পঞ্চবটীতে। নাসিক-ত্র্যম্বক দেখে ব্রহ্মগিরি গেলেন, গেলেন গোদাবরীর জন্মস্থানে, কুশাবর্তে। আরো বহুতীর্থ দেখে বিদ্যানগরে ফিরলেন।

সচল জগন্নাথ ফিরে এসেছেন খবর পেয়ে ছুটে এল রামানন্দ। নয়নে নিরবধি আনন্দের ধারা, বদনে 'হরেকৃষ্ণ' নাম—চলো দেখিগে সেই ভক্তিরসবিহারীকে। পদতলে লুটোই ধুলোতে।

রামানন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করল প্রভুকে, প্রভু তাকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সুস্থির হয়ে সুরু করলেন 'ইষ্টগোষ্ঠী', কৃষ্ণকথার আলাপন। প্রভু বর্ণন করলেন তাঁর তীর্থভ্রমণের কাহিনী, ব্রহ্মসংহিতা আর কর্ণামৃত পুঁথি দেখালেন।

'জানো, রাজা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।' বললে রামানন্দ, 'আমি পুরীতে গিয়ে থাকব।'

'খুব ভালো কথা।' বললেন প্রভু, 'আমি তো সেজন্যেই এখানে এসেছি। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

রামানন্দ বললে, 'না, তুমি আগে যাও। আমার সঙ্গে অনেক হাতি ঘোড়া সৈন্য সামন্ত যাবে। সে সব কোলাহল তোমার ভালো লাগবে না।'

ইষ্টগোষ্ঠী হল আরো কয়েক দিন। তুমি তবে পিছু-পিছু এস, প্রভু চললেন নীলাচলে। যে পথ ধরে গিয়েছিলেন, ফিরলেনও সেই পথে। হরিনামের ঢেউ পড়ে গেল চারদিকে। আমাদের গোঁসাই ফিরে এসেছেন।

'যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেইদিগে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-যুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করেন সকল॥
ধূলি গুট্টী পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।
তাহার আনন্দ হয় অকথ্য কথন॥
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম।
দেখিতে সভার চিত্ত হরে অবিরাম॥'

প্রভু আলালনাথে এসে পৌঁছুলেন। কৃষ্ণদাসকে পাঠিয়ে দিলেন, নিত্যানন্দকে খবর দাও,—আমি এসেছি।

ছুটে চলে এল নিত্যানন্দ। 'প্রেমে থেহ নাহি পায়।' প্রেমে আর স্থৈর্য মানতে চাইছে না। সঙ্গে এল দামোদর, মুকুন্দ, জগদানন্দ। পশ্চাতে গোপীনাথ। পথের মাঝখানেই নাগাল পেল প্রভুর। এ কি, এ যে সার্বভৌমও এসে পড়েছে। সকলকেই গাঢ় আলিঙ্গন করলেন প্রভু। সার্বভৌম কাঁদতে লাগল।

কে এই নিত্যানন্দ? 'চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।

নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥' নিত্যানন্দকে যে তুষ্ট করে সেই প্রভুর হয়ে যায়। নিত্যানন্দই প্রভুর প্রিয়তম। চৈতন্যরসে পরম উদ্দাম। একদিন জগন্নাথমন্দিরে সুবর্ণসিংহাসনে উঠে বলরামকে আলিঙ্গন করেছিল। প্রতিহারী হাত ধরে টেনে আনতে চেয়েছিল, দূরে পড়েছিল ছিটকে। মত্তহস্তীকেও বুঝি শাসন করা যায়, নিত্যানন্দকে নয়। বলরামের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল নিত্যানন্দ।

প্রথমেই চলো জগন্নাথ-দর্শন করে আসি।

জগন্নাথ দেখে প্রভুর প্রেমাবেশ জাগল। শরীর ভেসে গেল পুলকাশ্রুতে। নৃত্য সুরু হল, কিছুতেই স্থির হন না প্রভু। পাণ্ডারা প্রসাদ নিয়ে এল, সঙ্গে প্রসাদী মাল্য। প্রসাদে শান্ত হলেন।

কাশী মিশ্র এসে প্রণাম করল। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু, জগন্নাথ-সেবার অধ্যক্ষ। আলিঙ্গনে তাকে সম্মানিত করলেন প্রভু।

সার্বভৌম প্রভুকে নিজগৃহে নিয়ে গেল। ভিক্ষে করাল। শয়ন করলে লাগল পদসেবা করতে।

প্রভু বললেন, 'এত তীর্থ ঘুরলাম, তোমার মত বৈষ্ণব দেখলাম না। আর রায় রামানন্দ যে আনন্দ দিল, তার তুলনা হয় না।'

'তাই তো তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম।'

তারপর এবার আবার আরেকজন আসছে।

প্রভু তখন দাক্ষিণাত্যে, রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে রাজধানী কটকে ডেকে পাঠাল। বললে, 'হ্যাঁ হে, তোমার ঘরে নাকি এক অদ্ভুত মহাপুরুষ এসেছেন। অনেক নাকি কৃপা করেছেন তোমাকে। আমাকে একবার দর্শন করিয়ে দাও না।'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন?'

'তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না। বিষয়ীর [illegible]রি ভয়ে নির্জনে থাকেন। তা ছাড়া—'

হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল প্রতাপরুদ্র।

'তা ছাড়া সম্প্রতি তিনি তীর্থ করতে দক্ষিণে গিয়েছেন।'

'সে কী? তাঁর আবার তীর্থের প্রয়োজন কী?'

'প্রভুর এই এক লীলা। তীর্থ পবিত্র করবার জন্যেই মহাপুরুষদের তীর্থভ্রমণ। আর তীর্থভ্রমণের ছলে লোকনিস্তার।'

'তাঁকে তুমি যেতে দিলে কেন?' প্রতাপরুদ্র করুণ স্বরে বললে, 'পায়ে পড়ে কেন রেখে দিলে না সযত্নে?'

'আপনি কি বলছেন? তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাক্ষাৎ বাসুদেব, কে তাঁকে আটকাবে? কে তাঁর ইচ্ছার বাদী হবে?'

'কৃষ্ণ—তাকে তুমি কৃষ্ণ বলছ?' প্রতাপরুদ্র বললে গম্ভীর হয়ে, 'আমিও তাই সত্য বলে মানছি। কিন্তু বলো কী করে নয়ন সফল করি?'

'তিনি অল্পকালের মধ্যেই ফিরবেন।' বললে সার্বভৌম, 'কিন্তু তাঁকে রাখতে হলে তাঁর জন্যে একটি নির্জন স্থান দরকার।'

'কাশীমিশ্রের বাড়ি সমুদ্রের ধারে, মন্দিরের কাছে, বেশ নির্জন জায়গা। সেইখানে ব্যবস্থা করো।'

কাশীমিশ্র বললে, 'এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! প্রভু আমার গৃহে থাকবেন, আমার ভাগ্যের ইতি-অন্ত নেই।'

আর প্রভু তার ঘরে থাকতে সম্মত আছেন জেনে কাশীমিশ্র তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'শুধু ঘর নিলে চলবে না, সেই সঙ্গে আমাকেও নিতে হবে।' 'গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদন।'

বিরলে তাকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন প্রভু।

তারপর আসন নিলেন।

পুরুষোত্তমবাসীরা দেখা করতে আসছে প্রভুর সঙ্গে। তৃষিত চাতকের যেমন মেঘের জন্যে উৎকণ্ঠা, তেমনি প্রভুর জন্যে তাদের ব্যাকুলতা।

ডাইনে বসে সার্বভৌম পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এ জগন্নাথসেবক

জনার্দন। এ, হাতে সোনার বেত, মন্দিরের প্রহরী কৃষ্ণদাস, এ হিসেবরক্ষক শিখি মাহিতী—আর ইনি বৈষ্ণবপ্রধান প্রদ্যুম্ন মিশ্র। কীর্তনবিহারী, প্রেমের শরীরধারী প্রদ্যুম্ন।

'ইনি কে?'

'ইনি শিখির ভাই মুরারি মাহিতী—যিনি মন্দিরের প্রধান চালক। ইনি বিষ্ণুদাস, ইনি পরমানন্দ মহাপাত্র। সবাই তোমার চরণ ভজন করে।'

'আর ইনি?'

'ইনিই রায় ভবানন্দ পট্টনায়ক। রামানন্দের বাবা।'

ভবানন্দের পাঁচ ছেলে। রামানন্দ পরে আসছে, অপর চার-চার ছেলেসহ এসেছে ভবানন্দ। বললে, 'আমার সমস্ত তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম।' 'নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। আত্মা সমর্পিল আসি তোমার চরণে॥'

ছোট ছেলে বাণীনাথকে প্রভুর কিঙ্কর করে রেখে গেল।

যে কৃষ্ণদাস সঙ্গে গিয়েছিল তার কীর্তির কথা প্রভু বললেন সকলকে। 'আমাকে ছেড়ে বামাচারী ভট্টমারি হতে গেল, লুব্ধ হল কাম-কাঞ্চনে। বামাচারীদের হাত থেকে নিয়ে এসেছি উদ্ধার করে। ও এখন যেখানে খুশি সেখানে থাক, আমার সঙ্গে আর নয়।'

তবে ওকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিই। নিত্যানন্দ পরামর্শ দিল। শচীমাতাকে গিয়ে খবর দিক। খবর দিক অদ্বৈত-শ্রীবাসকে। প্রভু ফিরে এসেছেন নীলাচলে।

'কী বলো, দেশে এবার খবর পাঠাই।' প্রভুর মতামত জানতে এল সকলে।

'তোমাদের যা খুশি করো।' সম্মতি দিলেন প্রভু।

কৃষ্ণদাসই নিয়ে যাক সমাচার। লোকশিক্ষার জন্যে প্রভু তাকে বর্জন করেছেন কিন্তু তবু নিত্যানন্দের কৃপা থেকে সে বঞ্চিত হয়নি।

যদি কামকাঞ্চনে মন বিক্ষুব্ধ হয়, নিত্যানন্দের চরণ স্মরণ করো, বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হও, মোহমুক্ত হয়ে যাবে। অক্রোধ পরমানন্দ, দোষদৃষ্টিশূন্য নিত্যানন্দ। একবিন্দু অভিমান নেই, মূর্খ নীচ অধম পতিত সকলের প্রতি প্রেমোচ্ছ্বসিত।

'সর্বজীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম সেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবক্ষে ধর পূর্ণশক্তি॥
বিষ্ণুভক্তি সভেই লয়েন তোমা হৈতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে॥
পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য॥'

কৃষ্ণদাসের সঙ্গে মহাপ্রসাদ দিয়ে দিল। দিও শচীমাতাকে। বৈষ্ণববৃন্দকে।

অদ্বৈত আচার্যের ঘরে উল্লাসের বান ডাকল। প্রেমাবেশে হুঙ্কার করতে লাগল অদ্বৈত। এল হরিদাস, বাসুদেব, মুরারি, শিবানন্দ। এল বক্রেশ্বর, গদাধর, শ্রীবাস, দামোদর। এল আরো অনেকে।

চলো সকলে নীলাচলে যাই। আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হই। তার আগে শচীমাতার আশীর্বাদ নিই।

গেল সকলে শচীমাতার কাছে।

'খবর পেয়েছ?'

'পেয়েছি বইকি।' বললেন শচীমাতা, 'নিমাই আমার জন্যে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ পাঠিয়েছে। ভিক্ষে করেছে আশীর্বাদ।' একচোখে হাসছেন, কাঁদছেন আরেক চোখে।

'অনুমতি করো—আমরা সব নীলাচলে যাব।'

'যাও, দেখে এস আমার নিমাইকে। নিত্য যে বালগোপালকে ভোগ দিই, আমার সেই চিত্তের পুত্তলকে।'

'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। এগিয়ে এল পরমানন্দ পুরী।

ঋষ্যভ পর্বতে দেখা হয়েছিল প্রভুর সঙ্গে। প্রভু বলেছিলেন নীলাচলে স্থায়ী ভাবে বাস করতে। নীলাচল হয়ে পরমানন্দ এসেছিল নবদ্বীপ। বিশ্রাম করল শচীগৃহে, ভিক্ষাগ্রহণ করল। বলল প্রভুর সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতের কথা। তোমার নিমাই ভালো আছে, ভুবনপ্লাবিত করছে কৃষ্ণনামে।

ওদের বেরুতে বোধ হয় এখনো দেরি আছে। তর সইল না পরমানন্দের। কমলাকান্তকে সঙ্গে করে চলল নীলাচলে।

সকলের আগে এসে পৌঁছুল।

'মাধবেন্দ্রের প্রসাদ আবার প্রকাশিত হল আমার কাছে।' প্রভু পরমানন্দকে আলিঙ্গন করলেন: 'ইচ্ছে হয় তুমি নীলাদ্রি আশ্রয় করে থাকো। আমাকে তোমার সঙ্গ দাও।'

কাশী মিশ্রের আবাসেই পরমানন্দের জন্যে নিভৃত ঘর ধার্য হল। ধার্য হল সেবক কিঙ্কর।

এ আবার কে এল মিলতে?

এ যে দেখি স্বরূপদামোদর। পরমানন্দের আবির্ভাব ত্রিহুতে, স্বরূপদামোদরের নবদ্বীপে। পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য। প্রভুর সন্ন্যাস দেখে পাগলের মত ছুটল কাশীতে, চৈতন্যানন্দের কাছে সন্ন্যাস নিল। শিখাসূত্র ত্যাগ করল না, যোগপট্ট গ্রহণ করল না, স্বরূপে অবস্থান করল বলে নাম হল স্বরূপ। শুধু গৈরিক ধারণ করে ব্রহ্মচারী রইল।

গুরু বললে, 'বেদান্ত পড়ো, বেদান্ত পড়াও।'

স্বরূপ বললে, নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজনা করব বলেই আমার সন্ন্যাস। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানি না, নেই বা জানবার।

গুরুর সম্মতি নিয়ে ছুটল নীলাচল।

প্রভুরই দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রেমময় দেহ, কৃষ্ণরসতত্ত্ববিগ্রহ। পাণ্ডিত্যের পাহাড়, কিন্তু কারু সঙ্গে কথা কন না, নির্জনে বসে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে

বিহ্বল থাকেন। কেহ কোনো গ্রন্থ বা গীত বা শ্লোক রচনা করে প্রভুকে দেখাতে আনলে স্বরূপ প্রথমে পরীক্ষা করে দেখে এতে ভক্তির কোনো বিরুদ্ধ কথা আছে কিনা, আছে কিনা রসাভাস, রচনা শুনে প্রভু আনন্দিত হবেন কিনা। যদি স্বরূপ বোঝে রচনা শুদ্ধ, ভক্তি-সিদ্ধান্তের অনুকূল, তবেই প্রভুকে শোনায়। আর সঙ্গীতে গন্ধর্ব, প্রভুর কাছে গান গায় দামোদর। প্রভুর রুচি শুধু চণ্ডীদাসে, বিদ্যাপতিতে, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে।

পরমানন্দ আর স্বরূপদামোদর প্রভুর দুই বাহু। দুই নেত্র। এক নদীর দুই তীর।

এক প্রার্থনা।

প্রচেতাগণ সুহৃত্তম ভগবানের কাছ থেকে জানতে পেল গৃহাশ্রমে প্রবেশ করলেই বন্ধন জন্মায় না। গৃহাশ্রমে প্রবেশ করেও যারা ফল হরিতে অর্পণ করে কুশলকর্ম করে, হরিকথা আলোচনা করে কালযাপন করে, গৃহাশ্রম তাদের বন্ধনের কারণ হয় না। গৃহে বসে হরিকীর্তন শুনলে গৃহস্থের হৃদয়মধ্যেও হরি আবির্ভূত হন।

প্রচেতারা সুহৃত্তম ভগবানের স্তব করতে লাগল, হে ভগবান ক্লেশহন্তা, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বাসুদেব, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভক্তজনের প্রভু। কমলনাভ কমলমালী কমললোচন কমল-চরণ, আমাদের ক্লেশনাশের জন্যে তুমি এই মূর্তি প্রস্ফুটিত করলে, এর চেয়ে অনুকম্পা আর কী হতে পারে? তুমি আমাদের অন্তর্যামী, আমাদের কী ইচ্ছা, আমাদের কী বরণীয়, তা কি তুমি জানো না? তোমার প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। পারিজাত পেলে ভ্রমর কি অন্য বৃক্ষের সেবা করে? তেমনি তোমার পদমূল প্রাপ্ত হয়ে অন্য পদার্থ কী প্রার্থনা করব? তবু যদি বর দেবেই এই বর দাও যেন জন্মে জন্মে তোমার ভক্তদের, সাধুদের সঙ্গে আমাদের সমাগম হয়। পদরজে পৃথিবী পবিত্র করার জন্যে তাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁরা সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ। তাঁরা মুক্তসঙ্গ হয়ে সর্বদা তোমার প্রসঙ্গ

করে থাকেন। তাঁদের সাহচর্য, স্বর্গ বা মোক্ষপদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, অন্য বিভবের কথা আর কী বলব। এই দুশ্চিকিৎস্য সংসারের একমাত্র সুচিকিৎসক তুমি। সাধুজনের নির্মল নিষ্কাম হৃদয়েই তুমি সতত বন্দীভূত হয়ে বাস করছ, কখনো অপসৃত হচ্ছ না। তুমি ভক্তানুরক্ত, তাই ভক্তসঙ্গই একমাত্র বরণীয়। তোমাকে নমস্কার। যেমন ভোজন করলে সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, তেমনি তোমার আরাধনা করলে সকল দেবতার আরাধনা।



৪৮

হে শ্রীচৈতন্য, হে দয়ানিধি, আমাতে তোমার দয়া হোক। যে দয়ায় সমস্ত খেদ অনায়াসে দূরে যায়, যা নির্মল, বিশদ, যা আনন্দ-বর্ধন, যা সমস্ত শাস্ত্রবিবাদ নিরস্ত করে, যা অখণ্ড ভক্তিসুখের উৎস, যার চিরন্তন মর্যাদা একমাত্র মাধুর্যে, সেই অসামান্য কৃপা আমার জীবনে প্রকাশিত করো। দামোদর প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল।

'ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।' প্রভু দামোদরকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম তুমি আসবে। তুমি না এলে কার কাছে সেই অন্তরঙ্গ কথা, কৃষ্ণকথা ব্যক্ত করি?

'তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ জেনেও আমি তোমার সঙ্গে না এসে কাশী গিয়েছিলাম।' বললে দামোদর, 'আমার অপরাধের মার্জনা নেই। কিন্তু, আমি তোমাকে ছাড়লেও তুমি আমাকে ছাড়োনি, কৃপার দড়ি গলায় বেঁধে আমাকে এখানে টেনে এনেছ।' 'মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা। কৃপারজ্জু-গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥'

প্রভু দামোদরের নির্জন বাসস্থান ঠিক করে দিলেন।

কিন্তু তুমি কে?

আগন্তুক প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। আমি গোবিন্দ। ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। তিরোধানের সময় ঈশ্বরপুরী বলে দিয়েছেন এখন থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করো। তাই এসেছি নীলাচলে।

'আমার প্রতি পুরীশ্বরের কী কৃপা, কী স্নেহ! নিজের ভৃত্যকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু,' সার্বভৌমকে লক্ষ্য করলেন প্রভু: 'গুরুর সেবক মান্যপাত্র, তাকে দিয়ে অঙ্গসেবা করা কি সঙ্গত হবে?'

'কিন্তু গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করবে কী করে?' বললে সার্বভৌম।

'ঠিক বলেছেন।' গোবিন্দকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু।

গোবিন্দ শূদ্র। তা হোক। ঈশ্বরপুরীর সেবায় আর সঙ্গে তার চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, গোবিন্দের চিত্তে প্রীতি-ভক্তির লাবণ্য, কে আর তার জাতি-কুলের বিচার করে? দাসীপুত্র দরিদ্র বিদুরের ঘরে ভোজন হয়নি শ্রীকৃষ্ণের? শুধু ভক্তির খোঁজ করো। কৃষ্ণে শুধু ভক্তির অপেক্ষা।

ঈশ্বরকৃপা পরম স্বতন্ত্রা। তা কিছুরই ধার ধারে না, না কুল-মান, না ধন-সম্পদ, না বা বিদ্যাবুদ্ধি। তা বেদধর্ম লোকধর্ম দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত নয়। তা শুধু স্নেহলেশ খুঁজে বেড়ায়। যেখানে প্রীতিস্পর্শ সেখানেই কৃপা মুক্তস্রোত।

বিদুরকে দেখ। বিদুর দাসীপুত্র, তার উপরে দরিদ্র। কিন্তু কৃষ্ণে প্রীতিমান। তাই দ্বারকার অধিপতি হয়েও কৃষ্ণ এলেন তার কুটিরে, খেলেন তার খুদকণা। সে তৃপ্তি কি দুর্যোধনের রাজভোগে সম্ভব?

'মর্যাদা হইতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।' স্নেহ নেই, মমত্ব নেই, হৃদয়মাধুর্য নেই, শুধু অহঙ্কারের আস্ফালন, শুধু গৌরববুদ্ধি কি সুখ দিতে পারে? সুখ প্রীতিতে, সোহার্দ্যে, অন্তরমধুতে। আর প্রেম বাহ্যানুসন্ধান করে না, প্রাণানুসন্ধান করে।

এই বিদুরকেই যুধিষ্ঠির তীর্থ বলে অভিহিত করেছিল। যাদের

অন্তরে গদাধর নিয়ত বিরাজমান তারাই তীর্থভ্রমণ করে সমস্ত তীর্থকে তীর্থান্বিত করে তোলে।

'ভট্টাচার্য কহে—গুরু-আজ্ঞা বলবান।

গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ॥'

গোবিন্দ পেল শ্রীঅঙ্গ সেবার অধিকার। প্রভুর আরো দুই ভৃত্য ছিল—রামাই আর নন্দাই, কিন্তু তারা গোবিন্দের অধীন। প্রভুর সমস্ত কার্যের নির্বাহভার গোবিন্দের হাতে, গোবিন্দই সর্বেসর্বা। এমন কি, যারা প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদেরও তদারক গোবিন্দের। প্রভুর কিসে আরাম হবে—এই একমাত্র গোবিন্দের বিচার, গোবিন্দের সমাধান।

মুকুন্দ দত্ত এসে বললে, 'ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসেছেন তোমাকে দেখতে। তাঁকে নিয়ে আসব এখানে?'

'না, তিনি আমার গুরুস্থানীয়, ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ। তাই আমি নিজে তাঁর কাছে যাব। তাঁর মর্যাদা আমাকে রক্ষা করতে হবে।'

ভক্তসঙ্গে প্রভু গেলেন ব্রহ্মানন্দের স্থানে। গিয়ে দেখলেন, ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরে আছে।

'ভারতী গোঁসাই কোথায়?' প্রভু জিগগেস করলেন মুকুন্দকে।

'সে কী? তিনি তো তোমার সামনেই বসে রয়েছেন।' মুকুন্দ অবাক মানল।

'না, ইনি হতে যাবেন কেন? ভারতী গোঁসাই চামড়া পরবেন কেন? তুমিই এককে অন্য মনে করছ। তুমিই অজ্ঞান।'

ব্রহ্মানন্দের তখন জ্ঞান হল। আমার চর্মাম্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পছন্দ করছেন না। হয়তো এই চর্মে ত্যাগের দম্ভই প্রকাশ করা হচ্ছে, আর যেখানে দম্ভ সেখানেই ভগবৎশূন্যতা। ঠিকই তো, মৃগচর্ম পরে কই এখনো তো সংসার-সমুদ্র পার হতে পারিনি, শুধু অহঙ্কারকেই সার করেছি। আর পরব না চর্মাম্বর।

প্রভু তার মনের ভাব বুঝে নিলেন। আনালেন সুতোর বহির্বাস। ব্রহ্মানন্দ বেশ পরিবর্তন করল। অহমিকার ভার থেকে মুক্ত হল নিমেষে।

তখন প্রভু তাঁর চরণবন্দনা করলেন।

'তোমার আচরণ লোকশিক্ষার জন্যে, তাই তুমি আমাকে, আমি শুধু গুরুস্থানীয় বলে, প্রণাম করলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তুমি নতিস্বীকার কোরো না।' বললেন ব্রহ্মানন্দ, 'বর্তমানে নীলাচলে দুই ব্রহ্ম প্রকট—অচল আর সচল। অচল মন্দিরে আর সচল তুমি। অচল শ্যামব্রহ্ম আর সচল গৌরব্রহ্ম। আজন্ম আমি নিরাকার ধ্যান করেছি, কিন্তু কী আশ্চর্য, তোমাকে দেখামাত্রই আমার অদ্ভুত অনুভব হচ্ছে। অনুভব হচ্ছে যেন স্বয়ং কৃষ্ণ আমার সামনে উপনীত হয়েছেন। মনে আর চোখে—দু জায়গায়ই কৃষ্ণ দেখছি আর মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হচ্ছে। আমার বুঝি বা সেই বিল্বমঙ্গলের অবস্থা।'

কী বলেছিল বিল্বমঙ্গল? বলেছিল, আমরা অদ্বৈতপথের পথিকদের আরাধ্য ছিলাম, স্বানন্দসিংহাসনে সর্বদা পূজা পেতাম। হায়, কোনো গোপবধূলম্পট শঠ বলপ্রয়োগ করে আমাদের তার দাস করে ফেলেছে।

'আজন্ম করিল আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণ নাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥'

অদ্বৈতমার্গে সকলের পূজা পেয়ে যে আনন্দ পেতাম, কৃষ্ণদাস্যের আনন্দের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। কৃষ্ণদাসের কত বড় ভাগ্য। যিনি অজিত, যিনি সর্ববিশ্বের অধীশ্বর, অদ্বৈতপন্থীদের ব্রহ্ম যার অঙ্গকান্তিমাত্র, তাঁকে জয় করতে পারে—বশীভূত করতে পারে—একমাত্র তাঁর দাস। স্বতন্ত্র হয়েও কৃষ্ণ তাঁর দাসের কাছে পরাজিত,

দাসের কাছে পরাধীন। 'কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ। আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥'

উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ: 'উদ্ধব, তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা সেরূপ নয়, নয় বা শঙ্কর, নয় বা সঙ্কর্ষণ, নয় বা লক্ষ্মী—এমন কি, আমি নিজেও আমার সে রকম প্রিয়তম নই। 'আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্ত বড় করি মানে।' উদ্ধব, শ্রদ্ধান্বিত হয়ে আমার লোকপাবনী সুমঙ্গল কথা শ্রবণ করো, গান করো, স্মরণ করো। আত্মাতে নানাত্ব ভ্রম ত্যাগ করে একমাত্র আমাতে সমর্পিত হও। আমি যা ও যতটুকু ও যেরূপ—এ বারে বারে জেনে যে আমাকে ভজনা করে সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ। যে আমার প্রতিমাকে দেখে, আমার ভক্তকে দেখে, মনোহর গুণকর্মের কীর্তন করে, সমস্ত লব্ধ বস্তু আমাকেই অর্পণ করে, গীতবাদিত্র দ্বারা গৃহে উৎসব করে, অথচ আচরিত ধর্মকর্মের প্রচার করে না, যে অদাম্ভিকত্বের প্রতিমূর্তি, জানবে তারই মধ্যে ভক্তি জাগ্রত হয়েছে। আরো বলি, বেদবিদ্যা দ্বারা সূর্যে, ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণে, মিত্রতা ও সম্মাননা দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যান দ্বারা হৃদয়াকাশে আমাকে ধ্যান করবে। সমাধিযোগে আমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত রূপ ধরে সমুদিত হব। উদ্ধব, সৎসঙ্গজাত ভক্তিযোগ ছাড়া সংসারতরণের আর অন্য উপায় নেই। তুমি শ্রুতি স্মৃতি নিবৃত্তি প্রবৃত্তি সমস্ত বিসর্জন দিয়ে সকল শরীরীর আত্মরূপ একমাত্র আমাতেই একাগ্র ভক্তিতে শরণ নাও, অকুতোভয় হবে।'

প্রভু বললেন, 'তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের তুল্য দেখছ, সে আমার মহিমা নয়, তোমারই মহিমা, তোমারই কৃতিত্ব। কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রীতি, তাই সর্বত্র তোমার কৃষ্ণস্ফুরণ। যাদের ইষ্টে অনুরাগ তারা বস্তুতে বস্তুর স্বরূপ দেখে না, ইষ্টেরই স্ফূর্তি দেখে।'

'প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেমা হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়॥'

সার্বভৌম মীমাংসা করে দিল। বললে, 'প্রভু, তুমি কৃষ্ণরূপে ভারতীকে দর্শন দিচ্ছ বলেই ভারতী তার কৃষ্ণপ্রেমের গুণে তোমাকে দেখছে কৃষ্ণরূপে। এক দিকে তোমার কৃপা, অপর দিকে ভারতীর প্রেম। তুমি যদি কৃপা না করো কে তোমাকে দেখে? আর যদি দর্শকের প্রাণে প্রেম না থাকে, তা হলে কৃষ্ণ সামনে উপস্থিত থাকলেও তাকে দেখে তার সাধ্য কী।'

'বিষ্ণু, বিষ্ণু।' উচ্চারণ করলেন প্রভু। বললেন, 'এ যে তুমি অতিস্তুতি করছ। অতিস্তুতি নিন্দারই নামান্তর।'

কাশীশ্বর গোঁসাই ঈশ্বরপুরীর আরেক সেবক। সেও এসে উপস্থিত হল। তাকেও প্রভু গ্রহণ করলেন সসম্মানে।

নদ নদী যেমন সমুদ্রে এসে মেলে, তেমনি সকল ভক্ত মিলল এসে মহাপ্রভুতে।

'এবার যদি অভয় দাও,' সার্বভৌম বললে প্রভুকে, 'আরেক কথা নিবেদন করি।'

'করো। কিন্তু যাচ্ঞা যোগ্য হলেই পূরণ করব, নচেৎ নয়।'

'মহারাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন।'

কানে হাত দিলেন প্রভু, নারায়ণ স্মরণ করলেন। বললেন, 'অন্যায় কথা বলো কেন? আমি সংসারত্যাগী বিরক্ত সন্ন্যাসী, রাজদর্শন বা স্ত্রীদর্শন উভয়ই আমার পক্ষে বিষতুল্য।' 'সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন। স্ত্রীদরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥'

'তুমি যা বললে তা আমি জানি।' বললে সার্বভৌম, 'প্রতাপরুদ্র রাজা বটে কিন্তু সে ভক্তোত্তম। সে জগন্নাথের সেবক।'

'হোক। তবু সে রাজা, সে বিষয়ী। কাঠের তৈরি নারীমূর্তি স্পর্শ করলেও মনের বিকার ঘটে, তেমনি রাজার আসক্তি না থাকলেও তার বেশে-বাসে আড়ম্বরে চিত্তচাঞ্চল্য অসম্ভব নয়।' প্রভু

রুষ্ট হলেন: 'অমন কথা আর মুখে আনবে না। যদি বলো তো আমি নীলাচল ছেড়ে চলে যাব।'

সার্বভৌম ভয় পেল। রাজাকে জানাল মহাত্যাগী সন্ন্যাসী রাজদর্শনে অনিচ্ছুক।

প্রতাপরুদ্র কটক ছেড়ে পুরীতে সোজা উপস্থিত হল। সঙ্গে নিল রামানন্দকে। রামানন্দ রাজার হয়ে মিনতি করবে প্রভুকে, প্রভুর মন গলাবে।

'আমি রাজাকে বললাম, বিষয়কর্ম আমার আর ভালো লাগছে না, যদি অনুমতি করেন পুরীতে গিয়ে চৈতন্যচরণে অবস্থিত হই।' বলতে লাগল রামানন্দ। 'আর রাজা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তোমার নামে তাঁর প্রেমাবেশ হল! বললেন, তুমি যে বেতন পেতে তাই পাবে, বিষয়কর্ম থেকে ছুটি দিলাম তোমাকে, তুমি গিয়ে সেই পরমকৃপালু ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করো। আরো বললেন, আমি ছার, অধম, এ জন্মে আমার অধিকার নেই তাঁকে দর্শন করি। কিন্তু বলো, কোনো জন্মেও কি আমি ধন্য হব না দর্শনে? প্রভু,' সজলচোখে বললে রামানন্দ, 'রাজার সে কী আর্তি!'

'রায়, ভক্তের প্রতি যার প্রীতি, তার প্রতিই ভগবান প্রসন্ন।' বললেন প্রভু, 'তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ। রাজা যখন তোমাতে প্রীতিমান তখন তাকে ভাগ্যবান বলতে হয়। ভক্তের আরাধনা করে সে কৃষ্ণের প্রসাদ অর্জন করবে।'

মহাদেব কী বললেন পার্বতীকে? বললেন, 'হে দেবি, সমস্ত দেবদেবীর আরাধনার চেয়ে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, আর বিষ্ণুর আরাধনার চেয়েও শ্রেষ্ঠ তার ভক্তের আরাধনা।'

কৃষ্ণপ্রীতির একমাত্র হেতু প্রেমভক্তি। আর প্রেমভক্তির মূল মহৎ-কৃপা। কৃষ্ণভক্তেরাই মহৎ। তাদের কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথ নেই। 'মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি হয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে

রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥' সেই হেতু যারা কৃষ্ণের ভক্তের ভক্ত তারাই ভক্তুতম।

'রায়, কমললোচনকে দেখলে?' জিগগেস করলেন প্রভু। 'গিয়েছিলে মন্দিরে?'

'এখন যাই, দেখে আসি।' উঠল রামানন্দ।

'সে কী, তুমি জগন্নাথ দর্শন না করে আগে এখানে এসেছ?'

'কী করব, মন আগে আমাকে এখানেই টেনে এনেছে। চরণ রথমাত্র, হৃদয়ই সারথি। হৃদয় এ দিকেই অভিমুখী।'

'না, না, যাও, শিগগির দর্শন করো।'

প্রভু এখনও বিমুখ, প্রতাপরুদ্র ম্লান হয়ে গেল। বললে, 'জগাই-মাধাই পর্যন্ত উদ্ধার পাবে, প্রতাপরুদ্রই বাদ পড়বে একা। জগৎ উদ্ধার হবে ঠিকই কিন্তু প্রতাপরুদ্র জগতের বাইরে। সকলের প্রতিই তিনি কৃপা করবেন নির্বিচারে আর আমি সকল ছাড়া। তবে এক কথা জেনে রেখো,' সঙ্কল্পে দৃঢ় রাজার কণ্ঠস্বর: 'তাঁর যেমন প্রতিজ্ঞা রাজদর্শন করব না—আমারও তেমনি প্রতিজ্ঞা, তাঁর দর্শন না পেলে আত্মহত্যা করব। যদি তাঁর কৃপাই না পাই, কী হবে আমার রাজমুকুটে, বিলাস বৈভবে?' 'কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ।'

'প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহো না পারে মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥'

'তুমি অধীর হয়ো না।' সার্বভৌম চাইল আশ্বাস দিতে: 'তুমি পাবে প্রভুর করুণা। যিনি প্রেমাধীন তিনি গাঢ় প্রেমকে কী বলে অস্বীকার করবেন?'

তা হলে এস এক কাজ করা যাক। রথযাত্রার দেরি নেই, রাজবেশ ছেড়ে প্রতাপরুদ্র তাতে যোগ দিক। প্রভু যখন রথের

আগে প্রেমাবিষ্ট হয়ে নাচবেন, রাজা একাকী ভাগবত পড়তে পড়তে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে, আর প্রভু তখন বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করে ধরবেন।

গোপীনাথ রাজাকে বললে, গৌড়দেশ থেকে প্রায় দুশো ভক্ত প্রভুর সঙ্গে মিলতে আসছে পুরীতে। রাজা আদেশ দিলেন সকলের স্থান করে দাও। আহারের ব্যবস্থা করো, আদর-অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটি না হয়।

অট্টালিকার ছাদে গিয়ে উঠল রাজা। সঙ্গে সার্বভৌম আর গোপীনাথ। কীর্তন করে যারা আসছে, তাদের মধ্যে যে কয়জনকে পারো, চিনিয়ে দাও।

'ঐ স্বরূপ দামোদর। ইনি প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর।'

'আর উনি?'

'উনি গোবিন্দ। প্রভুর অঙ্গসেবক।'

'আর ঐ যার গলায় মালা দিল, সেই অমিততেজ মহান্ত কে?' বিস্ময় মানল রাজা।

'উনি অদ্বৈত আচার্য। প্রভুর মান্য পাত্র। সর্বশিরোধার্য।'

একে একে সকলকে চিনিয়ে দেওয়া হল। এরা সকলেই চৈতন্য-জীবন, চৈতন্যগত-প্রাণ।

রাজা বললে, 'বৈষ্ণবের এত তেজ কখনো দেখিনি, শুনিনি এমন প্রেম-সঙ্কীর্তন। এ কী করে সম্ভব হল?'

'এই প্রেম-সঙ্কীর্তন শ্রীচৈতন্যের সৃষ্টি।' বললে সার্বভৌম, 'এই কৃষ্ণনামকীর্তনই কলিকালের ধর্ম।'

'অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম-প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন॥
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই তো সুমেধা, আর কলিহত জন॥'

যে সঙ্কীর্তন-প্রধান যজ্ঞে প্রভুর ভজন করে, সেই সুবুদ্ধি, সুমেধা,

আর বাকি সকলে কুবুদ্ধি, কলিহত। যত রকম যজ্ঞ আছে তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্তনই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

রাজা জিগগেস করলে, 'শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্যদেবই যদি কৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতেরা তার প্রতি বিমুখ কেন?'

'যার প্রতি প্রভুর কৃপা হয় সেই প্রভুকে চিনতে পারে কৃষ্ণ বলে।' বললে ভট্টাচার্য, 'আর যার প্রতি কৃপা নেই সে পণ্ডিত হলেও, শাস্ত্র প্রমাণ নিজের চোখে দেখলেও, পারে না চিনতে। ভগবানকে ভগবান বলে অনুভব করতেও ভগবানের কৃপা দরকার।'

ব্রহ্মারও স্তব তাই বলে। কৃষ্ণ সর্বব্যাপক, সর্বদা সর্বত্র পরিস্ফুট, অন্তরে-বাহিরে নিরন্তর জাগ্রত, তাঁর মহিমা অনাচ্ছাদিত, তবু চোখে দেখলেও লোকে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। ভগবানের কৃপাশক্তিতেই ভগবান দৃষ্টিগোচর, অনুভবগ্রাহ্য। নইলে অব্যক্তকে কে দেখে, অপরিমেয়কে কে অনুভব করে? একমাত্র তাঁর অনুগৃহীত-জনই পারে তাঁকে দেখতে, পারে তাঁকে অনুভব করতে। বিচারে পাবে না, বিচিন্তায় পাবে না, পাবে না পাণ্ডিত্যে, যোগাভ্যাসে। একমাত্র করুণায় তাঁর প্রকাশ-প্রসাদ।

'দেখ, দেখ', রাজা চঞ্চল হয়ে উঠল, 'এরা সব জগন্নাথ না দেখে আগেই চৈতন্যের বাসার দিকে ছুটেছে।'

'এই তো স্বাভাবিক। প্রেমের এই তো গতি-মতি। যার প্রতি প্রাণের অত্যন্ত টান, সেই চৈতন্য ছাড়া এদের আর কোনো অনুসন্ধান নেই।' সার্বভৌম হাসল। 'আগে প্রভুর সঙ্গে দেখা করে শেষে প্রভুকে নিয়েই এরা দর্শন করবে জগন্নাথকে।'

'ভবানন্দের ছেলে ঐ বাণীনাথকে দেখছ?' রাজা কৌতূহলী হল। 'পাঁচ-সাত জন মুটের মাথায় করে মহাপ্রসাদ নিয়ে চলেছে।'

'হ্যাঁ, প্রভুর বাসায় নিয়ে যাবে। গৌড়দেশ থেকে যারা এসেছে, যাদের দেখলেন কীর্তনে, তাদের জন্যে।'

রাজা অবাক মানল। 'সে কী? যেদিন তীর্থস্থানে পৌঁছুনো যায়, সেদিন মুণ্ডন আর উপবাস করাই বিধি। তবে এরা তা না করেই অন্নাহার করবে কেন?'

'রাগমার্গে যারা আছে, ইষ্টের প্রীতিসাধনই যাদের ধর্ম', বললে সার্বভৌম, 'তারা ওসব বিধি-বিধান মানে না। প্রভুর হাতের প্রসাদ নিলে যদি প্রভু প্রীত হন, তা হলে উপবাসে আর তাঁর কোন প্রীতি? আমি তো প্রভাতে শয্যায় বসেই প্রভুর হাতের প্রসাদ নিলাম। প্রাতঃসন্ধ্যা করিনি, স্নান করিনি, এমন কি বাসিমুখ ধুইনি— প্রসাদের চেয়ে আর কী আছে বলুন সদাচার? ভগবান কৃপা করে যার হৃদয়ে ভক্তির প্রেরণা জাগান, তার আর কিসের লোকধর্ম, কিসের বেদবিধি?'

যে ভগবানে অনন্যচিত্ত, যে জাতরতি, বাইরে তার বৈগুণ্য বা দুরাচরতা দেখা গেলেও অন্তঃস্থিত ভক্তির প্রভাবে সে সুশোভিত। বাইরে কলুষচিহ্নে কলঙ্কিত হলেও চাঁদ কখনো অন্ধকারের কাছে পরাস্ত হয় না। তার অন্তরজ্যোতিতে সে চিরদিন প্রদীপ্ত থাকে।

রাজা নামল অট্টালিকা থেকে, আদেশ দিল, সকলের যেন স্বচ্ছন্দ হয় সর্বত্র। আর, আপনারা যান, কাশী মিশ্রের আবাসে বৈষ্ণবমিলন দেখে আসুন। সে মিলনে প্রতাপরুদ্র অনুপস্থিত।

মিশ্রের আবাসে স্থান কম কিন্তু বৈষ্ণব অসংখ্য। তবু কী আশ্চর্য, স্থানের অভাব হল না। নিজের কাছেই প্রভু সকলকে বসালেন, শ্রীহস্তে মালাচন্দন দিলেন। অদ্বৈতকে বললেন, 'তোমাকে পেয়ে আজ আমি পূর্ণ হলাম।'

'ঈশ্বরের এই-ই স্বভাব।' বললে অদ্বৈত, 'যদিও নিজেই তিনি পূর্ণ, তবু ভক্তসঙ্গেই তাঁর সুখোল্লাস।'

দামোদর পণ্ডিতকে বললেন, 'দামোদর, তোমার উপরে আমার সগৌরব প্রীতি, কিন্তু তোমার ছোট ভাই শঙ্করের উপর আমার কেবল শুদ্ধ প্রেম। তুমি শঙ্করকে আমার কাছে রাখো।'

দামোদর বললে, 'শঙ্কর আমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু, প্রভু, তোমার কৃপায় ও এখন আমার বড় ভাই।'

শিবানন্দ সেনকে দেখে প্রভু বললেন, 'আমাতে তোমার অনুরাগ তেমনি গাঢ়ই আছে।'

তাতে আর সন্দেহ কী। দণ্ডবৎ হয়ে ভূতলে পড়ল শিবানন্দ। হে অনন্ত, বহু বহুকাল আমি এই সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত আছি, এখন, এতদিন পরে তট পেয়েছি, তুমিই আমার সেই তট। আর তুমি? তুমিও পেয়েছ তোমার দয়ার সর্বোত্তম পাত্র। সে পাত্র আমি—আমি ছাড়া আর কে? আমিই নীচের নীচ, পতিতের পতিত, শূন্যের শূন্য। আমার মত ভক্তিহীন দীন আর কে আছে?

একবার নীলাচলে আসতে একটা কুকুর সঙ্গী হয়েছিল শিবানন্দের। অনেক পয়সা দিয়ে পার করিয়েছিল খেয়া। একদিন রাতে বাসায় ফিরে জানল সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কুকুরকে কেউ দেয়নি একমুঠো। কোথায় কুকুর? কুকুর নিরুদ্দেশ। সেই রাতে উপবাসী রইল শিবানন্দ। পরদিন প্রভুর চরণদর্শন করতে এসেছে, দেখল প্রভুর কাছটিতে বসে আছে আর প্রভুর দেওয়া প্রসাদী নারকেল খাচ্ছে। আর বলছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

কুকুরের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করল শিবানন্দ, আর বললে, 'আমার অপরাধ মার্জনা করুন।'

'মুরারি গুপ্ত কোথায়?' প্রভু ব্যাকুল হলেন।

বাইরে পড়েছিল মুরারি, দন্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ধরে, কাছে এসে দাঁড়াল। আমি মানুষ নই, আমি পশু, আমি দীনাতিদীন, অপদার্থ।

প্রভু আলিঙ্গনের জন্যে হাত বাড়ালেন, মুরারি পিছু হটল।

প্রভু যত এগোন, মুরারি ততই সরে যায়। বলে, 'আমার এই পাপকলেবর তোমার স্পর্শযোগ্য নয়।'

এমন কথা বোলো না। প্রভু আলিঙ্গন করলেন মুরারিকে। সযত্নে সস্নেহে তার গা থেকে ঝেড়ে দিলেন ধুলোবালি।

'কিন্তু হরিদাস? হরিদাসকে তো দেখছি না।' প্রভু উন্মনা হয়ে উঠলেন: 'সে কি আসেনি পুরীতে?'

'এসেছে।' কে একজন বললে, 'পথপ্রান্তে পড়ে আছে।'

'সে কী কথা! তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

'ওঠ, ওঠ, প্রভু তোমাকে ডেকেছেন।' ভক্তেরা ডাকতে লাগল হরিদাসকে: 'শিগগির চলো।'

হরিদাস বললে, 'আমি নীচ জাতি। মন্দিরের কাছে থাকবার আমার অধিকার নেই।'

'না, না, চলো, তোমাকে ডেকেছেন প্রভু।'

'নির্জন বাগানের মধ্যে যদি স্থান পাই তা হলে সেখানে পড়ে থাকি।' বললে হরিদাস, 'যেখানে থাকলে জগন্নাথের সেবকরা আমাকে, আমার ছায়াকেও ছুঁতে পাবেন না, সেই রকম জায়গা পেলে থাকি।'

প্রভু শুনলেন এই দৈন্যের কথা। কাশী মিশ্রকে বললেন, 'কাছাকাছি একটি নির্জন কুটির ঠিক করো, সেইখানে হরিদাস থাকবে।' বলে নিজেই আনতে গেলেন হরিদাসকে।

আলিঙ্গনের জন্যে হাত প্রসারিত করলেন প্রভু।

হরিদাস বললে, 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি নীচ অস্পৃশ্য, হীনজাতি।'

'তোমাকে স্পর্শ করতে এসেছি পবিত্র হতে।' প্রভু হরিদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন: 'তুমি সর্বক্ষণ নামকীর্তন করছ, তার অর্থ সর্বক্ষণ সর্বতীর্থে স্নান করছ, যজ্ঞ করছ, দান করছ, তপস্যা করছ। চতুর্বেদ অধ্যয়ন করছ নিরন্তর। তুমি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী থেকেও পবিত্রতর।'

'ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥'

দেবহুতি বলছে কপিলদেবকে, 'যার মাত্র জিহ্বাগ্রে তোমার নাম, সে যদি কুক্কুর-মাংস ভোজীও হয়, সেই গরীয়ান, সেই সদাচারী, সেই তপস্যা করেছে, হোম করেছে, তীর্থস্নান করেছে, সেই সত্যিকার বেদাধ্যায়ী।'

নির্দিষ্ট কুটিরে হরিদাসকে নিয়ে গেলেন গৌরসুন্দর। বললেন, 'তুমি এখানে থাকো, এখানেই নামকীর্তন করো। প্রত্যহ এখানে এসে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। মন্দিরের চূড়া দেখবে এখান থেকে, চূড়ার চক্র দেখবে। তাতেই হবে। তোমার জন্যে আসবে প্রসাদান্ন।'

স্থিতি ভাগবতী প্রীতিতে। এ প্রীতি স্বাভাবিকী, তর্ক-বিচারের অপেক্ষা রাখে না। নিজের রসেই রসময়ী। নিজের মাধুর্যেই আনন্দমদিরা। কোনো বিষয় বা বাসনা দ্বারা এ ছিন্ন নয়, খণ্ডিত নয়। অন্য তাৎপর্য তার কাছে অসহ্য, অপ্রাসঙ্গিক। এ প্রীতি সঙ্গোপনে রাখবার মত রহস্য। শুধু আনন্দাশ্রু বর্ষণেই যার উদ্ঘাটন। আর এ প্রীতিই সমস্ত সদগুণের আশ্রয়। এর উদ্যম-উৎসর্গ একমাত্র ভগবানের প্রীতিবিধানে। যাতে ভগবানের প্রীতি নেই তাতে বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই ভক্তিমানের। সমস্ত জীবনের ব্রতই ভগবৎ-বিনোদ।



৪৯

প্রভু সমুদ্রস্নান করে এলেন। ভক্তরাও স্নান সেরে জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াদর্শন করে প্রভুর গৃহে এসে জড়ো হল। এবার পাত পেতে বসে পড়ো।

যার যে স্থান সঙ্গত, তাকে সে স্থানে বসালেন প্রভু। নিজেই পরিবেশন করতে লাগলেন।

প্রভুর হাতে অল্প অল্প আসে না। একেক পাতে দু' তিনজনের মত ঢেলে দিচ্ছেন।

দিলে কী হবে, সবাই হাত তুলে বসে আছে।

'এ কি, খাচ্ছ না কেন? কী হল?'

'তুমি না বসলে কেউ খাবে না।' বললে স্বরূপ গোঁসাই, 'তুমি বোসো। আমি পরিবেশন করছি।'

'তার আগে হরিদাসকে প্রসাদ পাঠাও।' বললেন প্রভু, 'হরিদাসকে অভুক্ত রেখে আমি·বসি কি করে?'

গোবিন্দকে দিয়ে পাঠানো হল প্রসাদ। হরিদাসের আনন্দ দেখে কে!

নিত্যানন্দকে দক্ষিণে নিয়ে প্রভু ভোজনে বসলেন। সন্ন্যাসীরা এক দিকে ভক্তের দল আরেক দিকে। সন্ন্যাসীদের পরিবেশন করল গোপীনাথ আচার্য, আর ভক্তদের করল তিন জন—স্বরূপ, জগদানন্দ আর দামোদর।

আকণ্ঠ খাও আর হরিধ্বনি দাও।

এইসব ভক্তরা তো নবদ্বীপ থেকে এসেছে। প্রভু তখন স্নানযাত্রা দেখে আলালনাথে গিয়েছেন, ভক্তরা আসছে জেনে তাড়াতাড়ি চলে এলেন নীলাচল। সে সব ভক্তদের আপ্যায়নে কি ত্রুটি হতে পারে?

খাওয়ার শেষে সকলকে প্রভু মালাচন্দন পরিয়ে দিলেন। যাও, এবার গিয়ে বিশ্রাম করো। সন্ধ্যাকালে আবার মিলব আমরা।

সন্ধ্যাকালে সকলে একত্র হয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সংকীর্তন স্বরু করল। চার দলে ভাগ হল কীর্তনীয়ারা। চার দলপতি নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস আর বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বরকে মনে আছে? কাজী-দমনের দিন নগরকীর্তনে ছিল, ছিল জগাই-মাধাইকে কৃপা-প্রদর্শনের সময়। ছিল শ্রীবাসের আঙিনায়। আর শ্রীবাস? তার কাপড় সেলাই করত যে মুসলমান দর্জি, সেও পর্যন্ত কৃপা পেয়েছিল। আর শ্রীবাসের ভাইঝি নারায়ণী। আহা, তার কথা কে ভুলবে?

প্রভুকে মাঝখানে রেখে চার দল কীর্তন করতে লাগল। মহা-মঙ্গলধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাজতে লাগল আট মৃদঙ্গ, বত্রিশ করতাল।

আর মধ্যবর্তী প্রভুর নৃত্য দেখ। এমন ললিতদীপ্ত নৃত্য কেউ কোনোদিন দেখেনি।

দলে-দলে ওড়িয়ারা আসতে লাগল আকৃষ্ট হয়ে।

'বেড়ানৃত্য' সুরু করলেন এবার। তার মানে নেচে নেচে মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। চার দলের চার বন্ধুর যে কেউ কাছে এসে পড়ছে, তাকেই আলিঙ্গন করছেন। চার বন্ধুই ভাবছে, এ বক্ষপাতে বুঝি একমাত্র আমারই প্রতি পক্ষপাত।

'চারিজনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য প্রকাশ॥'

ব্রজেন্দ্রনন্দন মাধুর্যময়, তাই বলে তাঁর কি ঐশ্বর্য নেই? ঐশ্বর্য না থাকলে তিনি পূর্ণতম ভগবান কী করে? ঐশ্বর্য নেই নয়, ঐশ্বর্য তাঁর মাধুর্যের অনুগত। তাঁর ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পেলেই ঐশ্বর্য মাধুর্যের অন্তরাল থেকে মুখ বাড়ায়, উকিঝুঁকি মারে। সে ক্ষণেক-দেখা ক্ষণেক-অদেখা ঐশ্বর্য বুঝি মাধুর্যকে আরো রমণীয় করে তোলে।

প্রাসাদের ছাদে উঠে রাজা কীর্তন দেখছেন। আর যত দেখছেন, ততই তাঁর উৎকণ্ঠা প্রবল হচ্ছে, কবে আমি তাঁর পদচ্ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াব?

'তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে কিছু বলতে এসেছ।' ভক্ত-সমাবেশ দেখে প্রভু বুঝি একটু চিন্তিত হলেন: 'কিন্তু বক্তব্য কী, তা বলছ না কেন?'

'না বললেও নয়, অথচ বলতে গেলে ভয়।' বললে নিত্যানন্দ, 'তবে ভালো-মন্দ, যোগ্য-অযোগ্য—সব তোমাকে বলা উচিত! শোনো, রাজা প্রতাপরুদ্র বলেছে, তোমার চরণ-দর্শন না পেলে সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।'

'যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী।'

শুনে প্রভুর মন বুঝি একটু নরম হল, কিন্তু বাইরে নিষ্ঠুরতা বজায় রেখে বললেন, 'সন্ন্যাসী হয়ে রাজাকে দর্শন দিলে সন্ন্যাসধর্ম নষ্ট হবে। পরমার্থের কথা ছেড়ে দিই, এই দামোদরই আমার নিন্দা করবে দেখো। বেশ তো,' প্রভু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: 'দামোদর যদি বলে, তা হলে তৎক্ষণাৎ দর্শন দেব রাজাকে। এখন দেখ, দামোদরের কী মত?'

'আমি কোন ক্ষুদ্রজীব, আমি তোমাকে উপদেশ দেব?' বললে দামোদর, 'তবে এটুকু জানি, যে তোমাকে স্নেহ করে, তার প্রতি তুমি আবার স্নেহশীল।' 'যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র। তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥'

তুমি কি লৌকিক বিধিনিষেধের অধীন? তুমি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত। কোন বিধি কোন নিষেধ তোমার ইচ্ছার অন্তরায় হতে পারে?

'তোমাকে সাধ্য কী আমরা বলি তুমি রাজাকে দর্শন দাও। তবে এও ঠিক,' বললে নিত্যানন্দ, 'অনুরাগী লোক তার ইষ্ট না পেলে কখনো কখনো দেহ ছেড়ে দেয়। রাজাও সেই রকম অনুরাগী। এখন তুমিই জানো, তুমি সন্ন্যাসের, না, তোমার ভক্তবাৎসল্যের মর্যাদা রাখবে? প্রীতিও যদি তোমার করুণা না আকর্ষণ করতে পারে তবে হতাশ্বাস জীব যাবে কোথায়? যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীর কথা মনে নেই? ইষ্ট না পেয়ে তার প্রাণত্যাগের কথা?'

'যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ॥'

যমুনার উপবনে গোচারণ করতে করতে রাখালেরা ক্ষুধার্ত হয়েছে। কৃষ্ণকে বললে, আমাদের শান্তি-বিধান করো। কৃষ্ণ বললে, দেখ গে বেদবাদী ব্রাহ্মণেরা স্বর্গকামনা করে আঙ্গিরস যজ্ঞ

করছে, সেইখানে আমার নামোল্লেখ করে অন্ন যাজ্ঞা করো। রাখালেরা তখন যজ্ঞসভায় গিয়ে অন্ন প্রার্থনা করল। ব্রাহ্মণেরা সে প্রার্থনা কানেও তুলল না। সামান্য স্বর্গের আশায় ক্লেশাধীন কর্মেই তারা ব্যস্ত রইল। রাখালেরা ফিরে এল কৃষ্ণের কাছে, বললে তাদের বৈফল্যের কথা। কৃষ্ণ বললে, পরাঙ্মুখ কাকে হতে না হয়? যারা কার্য-সাধন করতে ইচ্ছুক, তাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। তোমরা এবার ব্রাহ্মণ-পত্নীদের কাছে গিয়ে বলো আমাদের ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা। তারা আমাকে ভালোবাসে, সুতরাং আমাতেই বাস করে। আমার নাম শুনলে প্রচুর অন্ন দেবে, কার্পণ্য করবে না।

দ্বিজপত্নীদের কাছে এ কথা বললে, তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। এত দিন তার নামই শুধু শুনেছি, সে এখন কোথায়? কোথায় বসে আছে? চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ খাদ্য নিয়ে তারা কৃষ্ণের উদ্দেশে ছুটে চলল, কারু বারণ শুনল না। সাগরাভিমুখিনী নদী কার বারণ শোনে? প্রাণ বুদ্ধি মন আত্মা, জায়া পুত্র জ্ঞাতি সম্পত্তি যার সম্পর্কীয় বলেই প্রিয়, সে কৃষ্ণের চেয়ে আর আমাদের প্রিয় কে? বহুতর খাদ্য তারা কৃষ্ণে নিবেদন করল।

কেবল একজন আসতে পারেনি। তার স্বামী তাকে ধরে ফেলেছে, বন্দী করেছে ঘরের মধ্যে। তার আর কৃষ্ণের কাছে যাওয়া হল না, খাওয়ানো হল না কৃষ্ণকে।

সে তখন কী করল? ভগবান কৃষ্ণকে হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করে দেহত্যাগ করল।

কৃষ্ণ বললে, 'অঙ্গে অঙ্গে মিলন হলেই যে মানুষের সুখ আর স্নেহ বৃদ্ধি হয়, তা নয়। যারা আমাতে মন সমর্পণ করেছে, তারাই আমাকে পাবে। আমার নাম শ্রবণে, আমাকে দর্শন করে, চিন্তা করে, আমার গুণকীর্তন করে যেমন প্রেম জন্মায়, শুধু আমার নিকটে এসে থাকলেও তেমন জন্মায় না।'

'তবে এক উপায় আছে।' বললে নিত্যানন্দ, 'তোমাকেও রাজদর্শন করতে হয় না, রাজারও প্রাণরক্ষা হয়।'

'কী উপায় ?'

'তুমি কৃপা করে তোমার একখানা বহির্বাস রাজাকে পাঠিয়ে দাও। বহির্বাসকে রাজা তোমার কৃপার নিদর্শন বলেই মনে করবে নিশ্চয়, আর ভাববে, আমার প্রতি যদি প্রভুর কৃপা থাকে তবে কেন আর আমি জীবন বিসর্জন দিই ? আশা ধরে প্রাণ রাখি, হয়তো একদিন চরণলাভের সৌভাগ্য হবে।

'তুমি যা ভালো বোঝ তা করো।'

নিত্যানন্দ গোবিন্দের থেকে প্রভুর একখানি বহির্বাস চেয়ে নিল, পাঠিয়ে দিল সার্বভৌমকে। সার্বভৌম নিয়ে গেল রাজার কাছে। আনন্দে রাজা অভিভূত হয়ে গেল। বস্ত্র যেন স্বয়ং প্রভু, সেই ভেবে পুজো করতে লাগলো রাজা। রামানন্দ রায়কে ডাকিয়ে বললে, চেষ্টা করে দেখ। এ বিরহ আর তো সহ্য হয় না। আরেকবার বলো গে প্রভুকে। তাঁর বস্ত্র পেয়ে আরো আমার উৎকণ্ঠা বেড়েছে।

রামানন্দ বললে, 'এবার একবার প্রতাপরুদ্রকে সাক্ষাৎ করতে দিন।'

'আচ্ছা, তুমিই বিচার করে বলো রাজার সঙ্গে সন্ন্যাসীর কি দেখা করা উচিত ?'

'তুমি তো পরাধীন নও, তোমার কাকে ভয় ? তোমার আবার কিসের বিধি-নিষেধ ?'

'আমি মানুষ, সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করেছি।' বললেন প্রভু, 'আমার সম্পর্কে কেউ প্রতিকূল আলোচনা করে, তাতে বড় ভয় করি। সাদা কাপড়ে বিন্দু পরিমাণ কালির দাগ যেমন স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, তেমনি সন্ন্যাসীর সামান্য দোষও দৃষ্টির আড়াল থাকে না কোনো দিন। সর্বত্র আলোচিত হয়। সুতরাং খুব বেশি সতর্ক হওয়া দরকার।'

'সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্ল বস্ত্র মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥'

রামানন্দ বললে, 'তুমি কত পাপী উদ্ধার করেছ, কিন্তু প্রতাপরুদ্র তোমার ভক্ত, জগন্নাথের সেবক, তার উপর তুমি কেন বিরূপ হবে?'

'পূর্ণ দুধের কলস একবিন্দু সুরাস্পর্শে অপবিত্র হয়ে যায়।' বললেন প্রভু, 'তেমনি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান হলেও, এক 'রাজা' নাম তাকে মলিন করেছে। তবে তোমার যদি আগ্রহ হয়, রাজার ছেলেকে আমার কাছে ডেকে আনো। পিতা ও পুত্রে স্বরূপতঃ ভেদ নেই, রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা হলে রাজা অনায়াসেই ভেবে নিতে পারবে যে, তারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

প্রভুর ইচ্ছায় প্রতাপরুদ্রের ছেলে এল দেখা করতে। কিশোর-বয়স্ক রাজপুত্র, শ্যামবর্ণ, কমলনেত্র, অঙ্গে রত্ন-অলঙ্কার, পরনে পীতাম্বর—দেখেই প্রভুর কৃষ্ণ-স্মরণের উদ্দীপন হল। প্রেমাবেশে তিনি রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। আর অমনি রাজপুত্রে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হল। নাচতে লাগল, কাঁদতে লাগল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে।

কী ভাগ্য রাজপুত্রের! ভক্তের দল প্রশংসা করতে লাগল।

প্রভু বললেন, 'এই বালক মহাভাগবত। একে দর্শন করলেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মৃতি মনে জাগ্রত হয়। যে কৃষ্ণস্মৃতি জাগায় সে বৈষ্ণব ছাড়া আর কী!'

প্রভুই শান্ত করলেন রাজপুত্রকে। বললেন, 'নিত্য আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো।'

রাজা আবার পুত্রকে আলিঙ্গন করল। সে আলিঙ্গনে আস্বাদ করল গৌরহরির স্পর্শ।

এগিয়ে আসছে রথযাত্রার উৎসব। প্রভু বললেন, 'গুণ্ডিচামন্দির এবার আমি মার্জন করব।'

রথযাত্রার দিন জগন্নাথ গুণ্ডিচামন্দিরে যান, সাত-আট দিন থাকেন, আবার ফিরতি রথের দিন চলে আসেন। বাকি তিনশো

সাতান্ন-আটান্ন দিন মন্দির খালি থাকে। তত দিনে কত যে ধুলোবালি সঞ্চিত হয়, তার হিসেব নেই। সেই সম্বৎসরের ধুলোবালি প্রভু নিজ হাতে প্রক্ষালন করবার ভার নিতে চাইলেন।

'মন্দিরমার্জন তোমার কাজ নয়।' বলতে চাইল পড়িছা।

কিন্তু মহাপ্রভুর তো শুধু ভগবদ্‌ভাব নয়, তাঁর আবার ভক্তভাব। তিনি মন্দির মার্জন করবেন কেন? কার জন্যে? জগন্নাথের জন্যে, জগন্নাথ আসবে বলে। এই সেবাই তো ভজন। আর জীবকে ভজন শেখাবার জন্যেই তো প্রভুর ভক্তভাব। আর যেখানে প্রীতি, সেখানে শ্রম শ্রম নয়, কষ্ট কষ্ট নয়, সে কাজে হীনতাও নেই, মলিনতাও নেই।

'না, আমারই যোগ্য কাজ।'

'বুঝছি এও তোমার এক লীলা। আর রাজা হুকুমজারি করেছেন—প্রভু যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে।'

সুতরাং একশো নতুন ঘট আর একশো নতুন ঝাঁটা নিয়ে এস।

ভক্তদের নিয়ে প্রভাতে প্রভু গেলেন গুণ্ডিচায়। স্বহস্তে ঝাঁটা চালিয়ে ধুলোবালি তাড়িয়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন। অবশেষে ঘটে করে ঢালতে লাগলেন জল। বললেন, 'প্রত্যেকে ঝাঁট দিয়ে আবর্জনা আলাদা করে রাখো, কে কত কাজ করেছ, তার পরীক্ষা হবে।'

ভগবান কি শুধু সেবা নেবেনই, দেবেন না এক-আধটু? সেবা পাওয়ার চেয়ে সেবা করায় কি বেশি আনন্দ নয়? তাই অধিকতর আনন্দ পাবার লোভে প্রভু হীনসেবা মেগে নিলেন। যে বড় সেই পারে হীনতম সেবা করতে। প্রভুকে দেখে শেখ সকলে।

কৃষ্ণলীলায়ও তাই করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পা ধুয়ে দেবার কাজ নিয়েছিলেন। সেবার সে-সেবার আনন্দ তিনি নিজে একলাই ভোগ করেছিলেন। কিন্তু এবার

গৌরলীলায় তিনি একলাই ভোগ করলেন না। আরো অনেককে ভাগ করে দিলেন। এবারে তাঁর কৃপা বেশি অকৃপণ। বেশি নিরর্গল।

'প্রভু কহে—কে কত করিয়াছে মার্জন।
তৃণধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥'

হল পরীক্ষা। দেখা গেল, প্রভুর সঙ্গে কেউ পারেনি এঁটে উঠতে। প্রভুর সংগৃহীত আবর্জনাই বেশি।

'সভার ঝাটিকা বোঝা একত্র করিল।
সভা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥'

এবার তবে জল আনো। জল ঢালো। জল আনা-ঢালা অধিকতর পরিশ্রমের কাজ, তাই প্রভু পাঁচজনকে রেহাই দিলেন। তারা হল অদ্বৈত, পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ আর দামোদর। অন্যে জল এনে ঢেলে দেবে আর তোমরা তা দিয়ে প্রক্ষালন করবে। তোমাদের পরিশ্রমের কিছু লাঘব হোক।

প্রথমত মূল মন্দির—জগমোহন পরিষ্কৃত হল। ক্রমে ক্রমে ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, পাকশালা, প্রাঙ্গণ—কিছুই বাকি রইল না। প্রভু নিজ বস্ত্রে সিংহাসন মার্জন করলেন। তার পর জল ঢালার সময় কী উৎসাহ! 'পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ। শূন্য ঘট লঞা যায় আর শতজন।' কেউ জলঘট এনে মহাপ্রভুর হাতে দিচ্ছে, কেউ বা ছল করে ঢেলে দিচ্ছে পায়ের উপর। ঘটে ঘটে ঠোকাঠুকি করে কত ঘট ভেঙে যাচ্ছে, আবার চলে আসছে নতুন ঘট। আর জল ঢালা, ঘর ধোয়ার সঙ্গে অবিরল কৃষ্ণনাম।

মন্দির নির্মল শীতল হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এ যেন মন্দির নয়, প্রভু যেন তাঁর নিজের হৃদয়খানিই বাইরে এনে মেলে ধরেছেন জগন্নাথের বিশ্রামের জন্যে।

'জল ভরে ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরি-ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণ নাম হইল সঙ্কেত সর্বকামে॥'

কে একটা লোক প্রভুর পায়ে জল ঢেলে সেই জল পান করে ফেলল। প্রভু রুষ্ট হলেন, স্বরূপকে ডেকে বললেন, 'দেখ এর ব্যবহার। ঈশ্বরমন্দিরে আমার পা ধোয়াল আর সেই জল কিনা পান করল নিজে। অপরাধে আমার কী গতি হবে?'

লোকটার ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিল স্বরূপ গোঁসাই।

কোথায় পালাবে, সুবুদ্ধি সরল লোকটা ফিরে এল প্রভুর কাছে। বললে, 'আমি অজ্ঞ, মূর্খ, ব্যবহার জানি না, আমাকে ক্ষমা না করলে চলে কী করে?'

প্রভু তুষ্ট হলেন। ক্ষমায় করুণায় বদান্য হলেন।

শোধন ক্ষালনের পর সুরু হল কীর্তন। উদ্দণ্ড নৃত্য। 'আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়।'

কিন্তু এ কী হল? অদ্বৈতের ছেলে গোপাল নাচতে-নাচতে অচেতন হয়ে পড়েছে। শ্বাস নেই। অদ্বৈত নৃসিংহের মন্ত্র পড়ে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, তবু চেতনা আসছে না। সবাই কাঁদতে সুরু করেছে। তাকিয়ে রয়েছে প্রভুর দিকে।

'গোপাল, ওঠ।'

প্রভু গোপালের বুকে হাত রেখে ডাকতেই চোখ মেলল গোপাল।

এবার চলো, নরেন্দ্র-সরোবরে গিয়ে স্নান করি। শুধু স্নান নয়, সুরু হল জল-ক্রীড়া। সেই ক্রীড়াতেও অধিকতম পটুত্ব গৌরচন্দ্রের।

এবার ভোজন। কৃষ্ণের সেই পুলিন-ভোজন।

'আমাকে লাফরা-ব্যঞ্জন দাও,' বললেন প্রভু, 'আর পিঠাপানা অমৃতগুটিকা ভক্তদের পরিবেশন করো।'

প্রভুর পাশে বসে সার্বভৌম খাচ্ছে, হাসাহাসি করছে।

'কই তোমার সেই আগের জড়-ব্যবহার ?' জিগগেস করল গোপীনাথ।

'আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। এ সম্পদসিদ্ধি আমার মহাপ্রভুর প্রসাদে।' বললে সার্বভৌম।

'মহাপ্রভু বিনা কেহো নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ-হরি॥
কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে॥'

অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ যথারীতি ক্রীড়া-কলহ করছে। 'গালাগালি বোলাবুলি' করছে। সে এক অমৃতের ঝড় অমৃতের বৃষ্টি।

অদ্বৈত বললে পরিহাস করে, 'অবধূতের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে আছি, না জানি কোন গতি হয়।'

'কেন, প্রভু খাচ্ছেন না ?'

'তিনি তো সন্ন্যাসী, তাঁর অপচয় নেই। দূষিত অন্ন খেলেও সন্ন্যাসীর দোষ হয় না। কিন্তু আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমার অনুপায়।' বললে অবধূত, 'আমি না জানি কোন দুর্গতিতে দগ্ধ হই। জন্মকুলশীল আচার জানি না, এমন একজনের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে আছি, কী না জানি আছে অদৃষ্টে!'

'তুমি আর কথা বোলো না', বললে নিত্যানন্দ, 'তুমি অদ্বৈত আচার্য, অদ্বৈতবাদের গুরু, আর অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সমস্ত শুদ্ধভক্তির বিঘ্ন। এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুতে তার স্বীকৃতি নেই। ভগবানের বিগ্রহকেও মায়া মনে করে। এ হেন লোকের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খাচ্ছি, অপঘাত না ঘটে।'

প্রত্যক্ষে নিন্দা, প্রচ্ছন্নে হয়তো প্রশংসা। যে অশেষগুণান্বিত, শীলকুলের যে ধার ধারে না সেই অনাদি, জন্মরহিত ভগবানের সঙ্গে

এক পঙক্তিতে ভোজন করা সদাচারের পরাকাষ্ঠা। আর কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বৈত নেই ভেদ নেই বলে যে অদ্বৈত, যে এক কৃষ্ণের উপাসনায় সকল দেবতার উপাসনা হয়ে যায়, তার সঙ্গে একত্র ভোজন করলে কে জানে ভক্তিসিদ্ধান্ত সংক্রামিত হয়ে যেতে পারে!

রথযাত্রার আগের দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব। স্নানযাত্রার পর থেকে মন্দির প্রায় পনেরো দিন বন্ধ। জগন্নাথের 'বেশ' পরিবর্তন হবে। হবে নবীন অঙ্গরঞ্জন। রথযাত্রার আগের দিন বিগ্রহের চক্ষুদান করা হয়, তাই তার নাম নেত্রোৎসব। আর এই নেত্রোৎসবের দিনই মন্দিরের দরজা খোলে, সেই দিন থেকেই দর্শন দেন জগন্নাথ।

কতদিন তোমায় দেখিনি, আজ তুমি চোখ মেলে তাকাবে আমার মুখের দিকে—এত সুখ আমি রাখি কোথায়?

জগন্নাথদর্শনে চললেন মহাপ্রভু।

আগে আগে লোক সরিয়ে কাশীশ্বর যাচ্ছে, পিছনে জলকরঙ্গ নিয়ে গোবিন্দ। প্রভুর ঠিক সামনে পরমানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী। একপাশে অদ্বৈত, আরেক পাশে স্বরূপদামোদর। আর আগে-পিছে এখানে-ওখানে অন্যান্য ভক্ত।

আজ মন্দিরে বিপুল ভিড়। ব্যাকুলতার আতিশয্যে ভোগমণ্ডপে দাঁড়িয়ে কারু দর্শন করার অধিকার নেই। কিন্তু কে জানে—প্রভু দর্শন-লোভে মর্যাদা লঙ্ঘন করে চলে এলেন ভোগমণ্ডপে।

দেখলেন জগন্নাথকে।

যত দেখেন, ততই চোখে তৃষ্ণা জাগে। নেত্রের আর সাফল্য কী! কৃষ্ণদর্শনই একমাত্র সাফল্য।

গোপীরা কী তপস্যা করেছিল, যার ফলে দুই নয়নে কৃষ্ণের রূপ তারা পান করছে। যে রূপ লাবণ্যের সারস্বরূপ, যে রূপ অসমোর্ধ্ব, যে রূপ অনন্যসিদ্ধ, যে রূপ প্রতিক্ষণে নবায়মান, যে রূপ যশ আর শ্রী আর ঐশ্বর্যের একান্তধাম।

'ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম।' তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধ সময়ও

যুগ বলে মনে হয়। তা ছাড়া চোখের আবার আচ্ছাদন কেন? কেন অনন্তকাল নিষ্পলক হয়ে চেয়ে থাকতে পারব না তোমার দিকে?

রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের কল্পলতা আর গোপীরা তার পত্রপুষ্প। যদি কৃষ্ণলীলায় লতা জলসিক্ত হয় তা হলে পত্রপুষ্পেরই বেশি সুখ। গোপীর যে প্রেম তা তার নিজের সুখের জন্যে নয়, কৃষ্ণের সুখের জন্যে। তার প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নেই, তার ভগবানে কামার্পণ। 'নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥' গোপীভাবামৃতেই কৃষ্ণ সহজ-আকৃষ্ট। রাগানুগামার্গেই কৃষ্ণের সহজ বিচরণ। দেহাভিমানী হোক আর দেহাভিমানশূন্যই হোক জ্ঞানী-গুণীদের পক্ষে ভগবান সুখলভ্য নয়। তিনি শুধু ভক্তিমানদের পক্ষে সুখলভ্য। সুতরাং গোপীভাব অঙ্গীকার করে রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করো।

বনমধ্যে গোপিকাকে নিয়ে এল কৃষ্ণ। গোপিকা বললে, 'আমি আর চলতে পারি না, আমাকে বহন করে নিয়ে চলো।'

কৃষ্ণ বললে, 'কাঁধে ওঠ।'

গোপিকা যেই কাঁধে উঠতে উদ্যত হল অমনি কৃষ্ণ অন্তর্ধান করল।

কৃষ্ণ আত্মারাম, নিজে-নিজেই খেলা করে। কামিনীর বিভ্রম তাকে আকর্ষণ করে না, তবু কামী পুরুষের দৈন্য আর কামিনীর দুরাত্মতা দেখিয়ে প্রেয়সীর সঙ্গে ক্রীড়ামত্ত হয়।

পরিত্যক্তা গোপিকা অনুতাপ করতে লাগল: হা নাথ, হা প্রিয়তম, মহাবাহো, আমি দুঃখিনী, আমি কিঙ্করী, আমাকে দেখা দাও। আমি বিরহকাতর ভক্ত, আমাকে উপেক্ষা কোরো না।

অন্বেষণকারিণী অন্যান্য গোপীরা এসে দেখল তাদের সখী প্রিয়-বিচ্ছেদে বিমূঢ় হয়ে আছে। কেন, কী হল? দুরাত্মতাহেতু মাধব তাকে অবমানিত করে চলে গিয়েছে।

যাক, তবু সেই সম্ভোগপতি কৃষ্ণকেই আমরা খুঁজে ফিরব।

যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল বনমধ্যে ঘুরতে লাগল সকলে। অন্ধকার হয়ে এলে নিবৃত্ত হল, কিন্তু গৃহের কথা কারু মনে এল না। * তারা কৃষ্ণবিষয়েই আলাপ করতে লাগল, যমুনা-পুলিনে বসে গাইতে লাগল কৃষ্ণগুণগান।

হয়তো গুণগান শুনে কৃষ্ণ এসে দেখা দেবে।

কে এই গোপীরা ?

গোপীরা পরোঢ়া, কৃষ্ণের পরকীয়া বল্লভা। রুক্মিণী সত্যভামা কালিন্দী জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী, পট্টমহিষী। তারা স্বকীয়া, পতি-আজ্ঞা-তৎপরা, শুদ্ধৈকনিষ্ঠ পাতিব্রত্যে নির্বিচলা। আর ব্রজাঙ্গনারা পরকীয়া কান্তা। পরকীয়া আবার দুরকম। কন্যা ও পরোঢ়া। যারা কুমারী বা অবিবাহিত অবস্থায় কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত তারা 'কন্যা,' আর যারা বিবাহিত হয়েও কৃষ্ণসম্ভোগের জন্যে লালসাবতী তারা 'পরোঢ়া'। পরোঢ়াই কৃষ্ণকান্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, রুক্মিণী ঐশ্বর্যে ও সত্যভামা সৌভাগ্যে অধিকা হলেও সৌন্দর্যে মাধুর্যে রসে-রূপে বিলাসে-লালসে পরোঢ়ারাই সর্বাতিশায়িনী। পরোঢ়ারাই সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা।

'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥'

স্বকীয়াভাবের চেয়ে পরকীয়া ভাবে কান্তারসের উচ্ছ্বাস অধিকতর। পরকীয়াতেই প্রেমের সর্বাধিক স্ফূর্তি। স্বকীয়া-কান্তার সঙ্গে মিলনে আনন্দ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আনন্দ-চমৎকারিতা কই ? স্বকীয়া তো অনায়াসলভ্যা, অভ্যাসগৃহীতা, তার সঙ্গে মিলনে কই সেই উত্তাল তরঙ্গ ? তার সঙ্গে মিলনে বাধা নেই, লজ্জা নেই, তাই উৎকণ্ঠাও নেই, অস্থিরতাও নেই। যা স্থির তাই বুঝি প্রাণহীন। যা সহজ তাই বুঝি বিস্বাদ। তা ছাড়া স্বকীয়ামিলন ধর্ম ও সমাজের অনুমোদিত, অভিপ্রেত। তাই তাতে অভিনবত্ব নেই, বিস্ময়াবেশ নেই, নেই কোনো উচ্ছ্বাসের অবকাশ। নিরাকুল নিরুদ্বেগ আনন্দ শীতল, দুর্বল, স্তিমিত।

কিন্তু পরকীয়া? সে নিকষিত হেম। সে প্রেমের জন্যে প্রেম। সর্বত্যাগী প্রেম। লজ্জা ঘৃণা ভয় বাধা, সমস্ত সমাজ সংসার অতিক্রম করা বিশুদ্ধারতি। লোকধর্ম বেদধর্ম সমস্ত সে জলাঞ্জলি দিতে পারে, উপেক্ষা করতে পারে সমস্ত আর্যপথ, সমস্ত স্বজন ভবন ব্যবস্থা-শৃঙ্খলা। যত বাধা তত তীব্রতা তত দ্রুততা। এ মিলন সকলের কাছে অবৈধ বলে নিন্দার্হ, অসমর্থিত। তারই জন্যে এ বুঝি বেশি লোভনীয়, বেশি রুচিকর। বহু প্রয়াসে বহু বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে আসার পর বহু উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার শেষে যে মিলন তার স্বাদে অপূর্ব মদিরতা, অখণ্ড চমৎকৃতি। স্বকীয়াতে সেই অতিরিক্ত উপভোগ কই? তাই পরকীয়াকান্তার সঙ্গমেই রসের উৎকর্ষ। 'চৌরী পিরীতি হয় লাখগুণ রঙ্গ।'

এ পরকীয়া-ভাব একমাত্র ব্রজধামে। এ বৈকুণ্ঠে নেই, গোলোকে নেই, নেই বা দ্বারকায়। নেই বা কোনো জনসমাজে।

আসলে কৃষ্ণের সকল প্রেয়সীই স্বকীয়া। ব্রজসুন্দরীরাও কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। তাই তারা কৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা। তারা তাদের দেহ-মন-জীবন তাদের ইহকাল-পরকাল সর্বস্বই কৃষ্ণকে দিয়েছে, তাদের কৃষ্ণার্পণ নিঃশেষ অর্পণ—শুধু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া কৃষ্ণ-ইচ্ছায় কৃষ্ণকে উপপতি বানিয়েছে, ছল করে গোপীদের বিবাহ-কৃত পতিলাভ ঘটিয়েছে। যোগমায়া দ্বারা এই ভানের অবতারণা। কৃষ্ণের নিত্যকান্তা হয়ে পরোঢ়ার মত ব্যবহার করা। যেহেতু তাতেই রসের বিবৃদ্ধি।

আর সেই ভাবের শেষ সীমা রাধিকায়।

ধর্মস্থাপন ও অধর্মবিনাশের জন্যে যাঁর আবির্ভাব তিনি পরদারাভি-মর্শনের মত প্রতিকূল আচরণ করবেন এ কেমনতরো কথা? যাঁরা তেজস্বী তাঁদের পক্ষে কিছুই দোষের নয়, সর্বভুক বহ্নিতে কোনো দোষ-স্পর্শ নেই, নেই মালিন্যস্পর্শ। যিনি গোপীদের, তাদের পতিদের, সকল প্রাণীর দেহে-মনে বিরাজমান থেকে নিরন্তর রমণ করছেন, তাঁর আবার পরদার কে, কিসেরই বা পরদারাভিমর্শন? প্রকট

লীলায় রসাস্বাদনের বৈচিত্র্যের জন্যে আত্মারাম পুরুষ নিজের মায়াতেই একটি পরকীয়া ভান বিস্তার করেন। এই ভান' হেতু গোপীরা তাদের পতিকে অস্বীকার করতে পারেনি আর কৃষ্ণে সঙ্গত হবার সময়ও জানতে পারেনি যে তারা আসলে কৃষ্ণেরই স্বরূপকান্তা। এই স্বরূপসম্বন্ধের জ্ঞানটি যোগমায়ার কৌশলে আবৃত ছিল বলেই পরকীয়া অভিমানে এই উল্লাস-উৎকর্ষ।

'সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপেগুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা ॥'

প্রভুর অন্তরই রাধিকার ভাবমূর্তি। রাধিকার মতই তাঁর ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপবাক্য। আকাশে নীলমেঘ দেখে তাকে কৃষ্ণ মনে করে খণ্ডিতা নায়িকার মত তর্জন গর্জন করেন, কখনো বা কুঞ্জে অভিসার করেন, কখনো বা রচনা করেন বাসকসজ্জা। কখনো বা তিরস্কার করছেন উদ্ধবকে, কখনো বা বিলাপ করছেন প্রেমোন্মাদের মত।

'জ্ঞানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময়।
সর্বাঙ্গে রাধিকা স্বপ্নেহ রাধিকা
সর্বত্র রাধিকাময় ॥'



৫০

রাত থাকতে উঠে স্নান করলেন প্রভু। পার্ষদদের নিয়ে দেখতে গেলেন পাণ্ডুবিজয়।

হাতে ধরে শিশুকে যে হাঁটতে শেখানো হয়, তার নাম পাণ্ডু। জগন্নাথকে মন্দির থেকে রথের উপরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার নাম পাণ্ডুবিজয়।

বিগ্রহকে কী করে হাঁটায়?

মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত তুলোর বালিশ পাতা হয়েছে। পাণ্ডাদের কেউ বিগ্রহের কাঁধ ধরেছে, কেউ কটি, কেউ পা, কেউ বা পট্টডুরি। এক বালিশ থেকে আরেক বালিশে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, বিগ্রহ যেন হেঁটে চলেছে। পায়ের চাপে বালিশ ফেটে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে, তুলো উড়ছে চারদিকে। এ কি, বিগ্রহকে কেউ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, না, জগন্নাথ নিজে হেঁটে চলেছেন? বিশ্বম্ভরকে চালায়, এমন সাধ্য কার? যিনি সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, তিনি নিজের ইচ্ছেতেই চলমান। 'বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার? আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥'

'মণিমা! মণিমা!' প্রভু উচ্চধ্বনি করে উঠলেন।

ওড়িয়া ভাষায় মণিমা অর্থ সর্বেশ্বর। জগন্নাথই সর্বাধিপতি। জগন্নাথই মহামহিম।

কিন্তু এ কে পথে ঝাড়ু দিচ্ছে? জল ছিটোচ্ছে ধুলোতে? নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখ। এই আমাদের রাজা প্রতাপরুদ্র।

রাজা হয়ে তুচ্ছ-সেবা করছে। তা হলে আর কথা কী! তা হলেই তো জগন্নাথের কৃপাভাজন হয়ে গেল।

আর যে জগন্নাথের কৃপাভাজন, সে তো প্রভুরও কৃপাভাজন।

'মহাপ্রভু পাইল সুখ সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে॥'

রথের সাজসজ্জা দেখ—হেমময় সুমেরু-আকার রথ। রথের মধ্যে শত শত শাদা চামর, শত শত উজ্জ্বল দর্পণ, আর রথের উপরে চাঁদোয়া, অগণন পতাকা। কত যে বাজনা বাজছে, ঘাগর থেকে ঘণ্টা, তার লেখাজোখা নেই। কত চিত্র, কত পট্টবস্ত্র, কত আবরণ-আস্তরণ। এক রথে জগন্নাথ, আর দুই রথে বলরাম আর সুভদ্রা।

অদর্শনের পনেরো দিন জগন্নাথ নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সঙ্গে ক্রীড়া

করেছেন, এখন ভক্তদের খুশি করবার জন্যে রথে চড়ে বেরিয়েছেন বিহারে। রথযাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য তাই জগন্নাথের বৃন্দাবনবিহার।

জনসমুদ্রে তুফান উঠেছে, লক্ষকণ্ঠে উঠেছে জয়ধ্বনি। রথরজ্জু ধরে টানছে ভক্তরা। রথ কখনো দ্রুত চলছে, কখনো ধীরে, কখনো বা টানলেও চলছে না। সমস্ত চলাচল সমস্ত গতাগতি জগন্নাথের ইচ্ছায়। 'ক্ষণে স্থির হৈয়া রহে, টানিলে না চলে। ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে ॥'

মহাপ্রভু নিজগণকে একত্র করে স্বহস্তে মালাচন্দন পরিয়ে দিলেন। কীর্তনীয়াদের চার-সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান হল স্বরূপদামোদর, তার দোহার পাঁচজন,—দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘবপণ্ডিত আর গোবিন্দানন্দ। এ দলের প্রধান নর্তক অদ্বৈত। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস, পঞ্চ দোহার—গঙ্গাদাস, ছোট হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ আর শ্রীরামপণ্ডিত। প্রধান নর্তক নিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মুকুন্দ, পঞ্চ দোহার—বাসুদেব ঘোষ, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত আর বল্লভ সেন। প্রধান নর্তক বড় হরিহাস। চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান গোবিন্দ ঘোষ, আর পঞ্চ দোহার—বিষ্ণুদাস, মাধব, বাসুদেব দত্ত, অন্য রাঘব, অন্য হরিদাস। প্রধান নর্তক বক্রেশ্বর। প্রতি সম্প্রদায়ে ছ'জন করে মৃদঙ্গ-বাদক।

এরা ছাড়া আরো তিন সম্প্রদায় প্রস্তুত। কুলীনগ্রামের, শ্রীখণ্ডের আর শান্তিপুরের। কুলীনগ্রামের দলের নর্তক-নেতা রামানন্দ আর সত্যরাজ, শ্রীখণ্ডের নরহরি আর রঘুনন্দন, আর শান্তিপুরের অচ্যুতানন্দ।

তা হলে মোট সম্প্রদায় সাত। তার মধ্যে চার সম্প্রদায় রথের আগে, দুই সম্প্রদায় দুই পাশে, আর এক সম্প্রদায় পিছনে চলল। 'সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।' মাদল বাজাচ্ছে চৌদ্দ, গান গাইছে বিয়াল্লিশ, আর নাচছে সাত। ওই সাত জায়গাতেই

মহাপ্রভু ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, হরি-হরি, বলতে লাগলেন—জয় জগন্নাথ। 'সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি। জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥' রথের কোথায় অগ্র, কোথায় অন্ত, দু জায়গাতেই ঘুরছেন। এ তো সামান্য কথা, একই সময়ে সাত জায়গায় বিলাস করছেন। প্রত্যেকে ভাবছে, আমার প্রতিই প্রভুর বিশেষ কৃপা, আছেন আমার দলে সংশ্লিষ্ট হয়ে, কিন্তু এ কে বুঝছে, আরেক দলেরও এই ভাবনা।

'শ্রীবৈষ্ণবঘটামেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্তনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল॥'

বৈষ্ণবদল যেন মেঘসমারোহ। যেমন বৃষ্টি ঝরে তেমনি ঝরছে প্রেমাশ্রু। মেঘ তো শুধু জল ঝরায় কিন্তু বৈষ্ণবনেত্র অমৃত ঝরাচ্ছে।

যার শুদ্ধ ভক্তি, সেই অন্তরঙ্গ ভক্তই এই লীলা দেখতে পারে;

দেখতে পেল প্রতাপরুদ্র।

কাশী মিশ্রকে বললে, 'মিশ্র, এ কী দেখলাম! প্রভু সাত জায়গায় একই সময়ে বিরাজ করছেন।'

তোমার ভাগ্যের সীমা নেই।' বললে কাশী মিশ্র, 'তাই তুমি দেখতে পেলে ও মহিমা। প্রভু কৃপা করেছেন তোমাকে।'

'চৈতন্যের চুরি' সার্বভৌমও টের পেয়েছেন। রাজা যেই তাকে ইসারা করে বোঝালেন, সার্বভৌম সায় দিল।

কৃপা ছাড়া আর গতি কী! কৃপা ছাড়া ব্রহ্মাদি দেবতারাও ঈশ্বরের মহিমা জানতে পারে না। রাজার তুচ্ছ-সেবাই বুঝি সে কৃপাকে আকৃষ্ট করেছে। 'রাজার তুচ্ছ-সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন। সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥'

সাক্ষাতে দর্শন দেননি, কিন্তু পরোক্ষে দিলেন। 'সাক্ষাতে না দেখা দেন, পরোক্ষে এত দয়া। কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের মায়া॥'

কখনো এক মুর্তিতে নাচছেন, কখনো বা বহু মূর্তিতে, বহু স্থানে। রাসলীলায় যেমন করেছিলেন বৃন্দাবনে। দু'-দু' গোপীর মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেন দু'দিকের দু'জনেরই কণ্ঠালিঙ্গন করে, প্রত্যেকে ভাবল, কৃষ্ণ শুধু আমার কাছেই আছে, আমার হয়ে, এও সেই রকম। স্থাবর-জঙ্গম, সমস্ত কিছুকে প্রেমতরঙ্গে ভাসালেন। সাত সম্প্রদায়কে একত্র করে স্বয়ং কীর্তন আরম্ভ করলেন।

কৃষ্ণদর্শনলালসায় গোপীরা কাঁদতে লাগল অবশেষে। তখন মদনমোহন মন্মথমন্মথ কৃষ্ণ তাদের সামনে অবির্ভূত হল।

গোপীদের দেহে প্রাণ ফিরে এল। সকলে উঠে বসল। কেউ কৃষ্ণের হাত ধরল, কেউ বা কৃষ্ণের বাহু তুলে নিল কাঁধের উপর। কেউ কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল নিল হাত পেতে। কেউ বা কৃষ্ণের পাদপদ্ম টেনে নিয়ে রাখল স্তনদ্বয়ে। প্রণয়কোপে বিহ্বলা হয়ে কেউ ভ্রূকুটি রচনা করে ওষ্ঠাধর দংশন করতে লাগল। কেউ বা কটাক্ষবিক্ষেপে মন দিল। কৃষ্ণকে দেখা কি কারু শেষ হয়, না, দর্শনে তৃপ্তি আসে? কারুই নেত্রপিপাসার শান্তি হল না। কেউ বা কৃষ্ণকে নয়নপথে হৃদয়ে নিয়ে গিয়ে আলিঙ্গনের অনুভবে পুলকাঞ্চিত হয়ে নিমীলিতচক্ষু যোগীর মত বিরাজ করতে লাগল। কোথায় তবে আর বিরহ-সন্তাপ? গোপীকুলশোভিত হয়ে কৃষ্ণ তখন যমুনা পুলিনে প্রবেশ করল। বিকাশোন্মুখ কুন্দমন্দারের সৌরভসংসর্গে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এল অলিদল। শারদ জ্যোৎস্না বালুকার বিস্তীর্ণ শয্যায় দিয়েছিল গা ঢেলে। গোপীরা তাদের কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত উত্তরীয়াঞ্চল পেতে প্রাণবল্লভের আসন করে দিল। ত্রিলোকে যত শোভা আছে সমস্ত অঙ্গীভূত করে কৃষ্ণ বসল সেই আসনে।

অনঙ্গবর্ধন হাসলাস্যবিভ্রমে গোবিন্দকে সম্মাননা করে বললে গোপীরা: 'কেউ ভজনা করলে ভজনা করে, কেউ ভজনা না করলেও ভজনা করে, কেউ বা একেবারেই ভজনা করে না, এর অর্থ কী?'

কৃষ্ণ বললে, 'যে ভজনা পাবার জন্যে ভজনা করে সে তো স্বার্থসাধক, তার ধর্মও নেই, সৌহার্দ্যও নেই। ভজনবিমুখ সন্তানকে পিতামাতা অকপটে প্রতিপালন করে, ভজনা না পেয়েও যে ভজনা করে সে ধর্ম ও সৌহার্দ্য দুইই লাভ করে। যে কারু ভজনা করে না সে হয় আত্মারাম আপ্তকাম নয়তো অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহী। আমি তো যে আমাকে ভজনা করে তাকেও করি না। আমাকে ভজনা না করলেই সে নিরন্তর আমাকে চিন্তা করবে। লব্ধ ধন নষ্ট হলে ধনহীন যেমন ধনচিন্তায়ই নিমগ্ন থাকে, অন্য চিন্তা বিস্মৃত হয়, তেমনি অহর্নিশ আমারই চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকবে বলে আমি অন্তর্হিত হয়েছিলাম। আমার অদর্শনই আমাকে তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে। গোপনে থেকে, দূরে গিয়ে আমি তো তোমাদেরই ভজনা করছি, আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের সাজে না। আমার সঙ্গে তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য। দুর্জর গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করেছ তোমরা। দেবতার আয়ু পেলেও আমি তোমাদের প্রতিদান দিতে পারব না। তোমাদের আপন সুশীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হব।

ভগবানের এই মনোহর বাক্য শুনে গোপীরা বিরহতাপ পরিত্যাগ করল। পরমানন্দে পরস্পর বাহুবন্ধনে মিলিত হল। সেই সব স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত হয়ে আরম্ভ করল রাসলীলা। গোপীমণ্ডলমণ্ডিত যোগেশ্বর কৃষ্ণ দু'-দু'জনের মধ্যে প্রবেশ করে এর-ওর কণ্ঠধারণ করল। প্রত্যেকে মনে করল কৃষ্ণ শুধু আমার কাছেই আছে। রাসমণ্ডলে প্রিয়সঙ্গতা কামিনীদের বলয়নূপুরকিঙ্কিনীধ্বনি তুমুল হয়ে উঠল। মণিমালামধ্যে ইন্দ্রনীলের মত কৃষ্ণ শোভা পেতে লাগল। গোপীরাও নানা নৃত্য ভঙ্গিমায় মেঘচক্রে তড়িন্মালার মত দীপ্ত হয়ে উঠল, তাদের কবরী ও কাঞ্চী শ্লথ হয়ে পড়ল। কৃষ্ণস্পর্শে শিহরিত হয়ে তারা গান করতে লাগল। কেউ বা স্কন্ধার্পিত পদ্মগন্ধ বাহু আঘ্রাণ করে চুম্বন করল, কেউ বা নিজের কপোল রাখল কৃষ্ণকপোলে, কেউ বা কৃষ্ণের

সর্বমঙ্গলকর করকমল টেনে এনে রাখল স্তনের উপর। বিহারশ্রান্তা স্রস্তাভরণা গোপীদের মুখ কৃষ্ণ আপন করতলে মুছিয়ে দিতে লাগল।

জগন্নাথকে দেখে প্রভু স্তুতি করলেন জোড়হাতে।

'দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাথ।
উর্ধ্বমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥'

যিনি বেদজ্ঞদের পূজনীয়, যিনি গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের কল্যাণকর, সেই গোবিন্দকে—সেই কৃষ্ণকে নমস্কার।

দেবকীনন্দন দেবের জয় হোক। যদুবংশপ্রদীপ কৃষ্ণের জয় হোক। মেঘশ্যামল কোমলাঙ্গের জয় হোক। পৃথ্বিভারনাশী মুকুন্দের জয় হোক।

যিনি জনগণনিবাস, যিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে অধিষ্ঠিত, দেবকী-গর্ভে জন্ম নিয়েছেন বলে যাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত, যাদব-প্রধানরা যাঁর সেবকরূপ সভাসৎ, বাহুবলে যিনি অধর্মকে বিতাড়িত করে স্থাবরজঙ্গমের দুঃখ হরণ করেন, সেই কৃষ্ণ তাঁর সুস্মিত শ্রীমুখে ব্রজবনিতাদের পরম প্রেম উদ্দীপিত করে সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান।

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই, গৃহস্থও নই, ব্রহ্মচারীও নই, বানপ্রস্থও নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু আমি নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্র গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস।

হুঙ্কার করে প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। ঘুরতে লাগলেন চক্রবৎ। মনে হল জ্বলন্ত কাষ্ঠ যেন স্বর্ণবলয় রচনা করে চলেছে। পদতলে টলমল করছে পৃথিবী। প্রেমবিহ্বল প্রভুকে দেখবার জন্যে চারদিক থেকে লোক ভিড় করে আসছে। সে ভিড় ঠেকাবার জন্যে পার্ষদেরা মণ্ডল করে দাঁড়াল। এক মণ্ডল যথেষ্ট নয়, তিন মণ্ডল করে দাঁড়াল। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ প্রধান, দ্বিতীয়ে গোবিন্দ

কাশীশ্বর, তৃতীয়ে পাত্রমিত্রসহ স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র। প্রভুর ভাবময় পবিত্র দেহ না জনতার পীড়নে আহত হয়।

পাত্র হরিচন্দনের কাঁধে হাত রেখে প্রতাপরুদ্র দেখছে প্রভুকে। হঠাৎ তাদের সামনে শ্রীবাস এসে দাঁড়াল। এমন প্রেমাবেশ, খেয়াল নেই কার দৃষ্টি সে অবরোধ করছে। হরিচন্দন তার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললে, 'এক পাশে সরে যান দয়া করে।'

শ্রীবাস উদাসীন, গাত্রস্পর্শ অনুভবও করছে না।'

বার-বার ঠেলতে লাগল হরিচন্দন।

ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীবাস হরিচন্দনকে চড় মেরে বসল।

হরিচন্দনও উত্তেজিত হয়ে কিছু রূঢ়বাক্য বলতে যাচ্ছিল, প্রতাপরুদ্র তাকে নিবৃত্ত করল। বললে, 'তুমি ভাগ্যবান, তাই এই স্পর্শ পেলে। আমি ভাগ্যহীন। আমি অকৃতার্থ।'

প্রভুর দেহে নব-নব সাত্ত্বিক বিকার অভিব্যক্ত হতে লাগল। যেন নব-নব কলেবর ধরলেন। রোমাঞ্চ, কম্প, স্বেদ, স্বরভেদ, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ আর প্রলয়—এই অষ্ট-সাত্ত্বিকের উদ্দীপনা। সমস্তই কৃষ্ণবিরহের বিপ্লব।

তাণ্ডবের শেষে প্রভু বললেন স্বরূপকে, 'স্বরূপ, গান গাও।'

প্রভুর মনোগত ভাব কী বুঝতে পেরেছে স্বরূপ। সে গান ধরল:

'সেই তো পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ॥'

যে প্রাণবল্লভের বিরহে কামাগ্নিতে পুড়ে মরছিলাম এখন এখানে পেলাম সেই প্রাণবল্লভকে।

এ রাধিকার কথা। কুরুক্ষেত্রে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হল তখন শ্রীমতী ভাবল: এই, এই আমার সেই প্রাণনাথ, যার বিরহে বৃন্দাবনে দগ্ধ হচ্ছিলাম, এখন তাকে পেয়ে আমার দেহ-মন শীতল হল। মহাপ্রভুর রাধাভাব, তাই জগন্নাথের মুখের দিকে চেয়ে ভাবছেন, এই আমার সেই মধুমত্তম যার জন্যে বৃন্দাবনে স্মরখরশরে

বিদ্ধ হয়ে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করেছি, কৃষ্ণের একদিন দেখা পাব তারই আশায় দেহ রেখেছি এত দিন, কিন্তু আজ আমার কী সৌভাগ্য, সমস্ত সত্তা শীতলতায় স্নান করে উঠল।

এই আনন্দে রথের অগ্রে নৃত্যে মাতলেন গৌরহরি। তাঁর নয়ন-হৃদয় শুধু জগন্নাথে নিমগ্ন।

গৌর যদি জগন্নাথের—শ্যামের নয়ন সম্মুখে না থাকেন, তা হলে রথ অচল হয়ে থাকে, আর যদি গৌর আবার আসেন নয়নপথে তা হলেই রথ সচল হয়। মহাবলী গৌরের মাধুর্য-শক্তিতেই রথ নিয়ন্ত্রিত।

'গৌর যদি আগে না যায়, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এই মত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥'

প্রভুর ভাবান্তর হল। কুরুক্ষেত্রে নয়, বৃন্দাবনে যদি এ মিলন হত!

তখন তিনি হাত তুলে সেই অনবদ্য শ্লোক পড়লেন: 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ।' কোনো নায়িকা বলছে তার সখীকে: 'যিনি আমার কৌমার্য হরণ করেছেন, তিনিই এখন আমার পতি। সেদিনের সেই চৈত্ররাত্রি আজও উপস্থিত। সেই মালতী ফুলের সুগন্ধ নিয়ে কদম্ববনে বইছে সেই মন্দানিল। সেই আমিও তেমনি আছি। তবুও সেই রেবা-তীরে বেতসী-তরুতলে যে প্রেমকৌশলকেলি করেছিলাম, তারই জন্যে আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত। যেহেতু গৃহের এই নির্বিঘ্ন মিলনে সব নিরুত্তাপ মনে হচ্ছে। লোক আমরা সেই একই আছি, কিন্তু স্থান এক নেই, পরিবেশটিও ভিন্ন, সুতরাং সেই সুর চলে গিয়েছে বলে স্বাদও চলে গিয়েছে।

বার-বার পড়ছেন। যেন রাধাভাবে বলছেন, সখি, সেই আমিও আছি, কৃষ্ণও আছে, আমাদের মিলনও হয়েছে, কিন্তু বৃন্দাবনে

নিভৃতে নিকুঞ্জে সেই যে আমাদের ক্রীড়া হত—তারই জন্যে আমার চিত্ত পিপাসিত। এই কুরুক্ষেত্রের মিলনে সেই আনন্দ অনুপস্থিত।

'সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥'

যদিও তুমি এখানে আছ, এখানে লোকে লোকারণ্য, হাতি ঘোড়া রথধ্বনি। এখানে নানা অস্ত্র-শস্ত্রের সমারোহ, এখানে তোমার রাজবেশ। এ আমার মনঃপূত নয়। আমার বৃন্দাবনই স্বর্গ। সেখানে লোকারণ্য না থাক, পুষ্পারণ্য আছে। হাতি-ঘোড়া না থাক, ভ্রমর-কোকিল আছে। অস্ত্র-শস্ত্রের চেয়ে তোমার বেণু কত সুমধুর। আর রাজবেশ নিয়ে আমার কী হবে? কী হবে মণিমুক্তায়, রাজমুকুটে? বৃন্দাবনে কেমন তুমি সাজতে বনফুলে, ভালে ও কপোলে অলকা-তিলকা—সেই অনেক বেশি মনোহর ছিল। ঐশ্বর্য নয়, মাধুর্যেই আমার অধিক বাঞ্ছা। এখানে সে সুখের এক কণাও নেই। তুমি আমাকে আবার বৃন্দাবনে নিয়ে চলো। ব্রজই আমার সদন, আর তুমিই ব্রজের জীবনস্বরূপ।

'অন্যের 'হৃদয়' মন　　　　আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়,　　　　করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥'

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ যখন নির্জনে গোপীদের সঙ্গে মিলিত হল তখন গোপীদের আনন্দ দেখে কে! তারা অনিমেষলোচনে কৃষ্ণকে দেখতে চাইল কিন্তু চোখ যে নিষ্পলক হতে জানে না। চক্ষুদ্বয়ের পক্ষ্ম-নির্মাতা বিধাতাকে তারা তিরস্কার করতে লাগল। তখন চোখ দিয়ে কৃষ্ণকে হৃদয়স্থ করে তাকে আলিঙ্গন করে তার ভাবে বিহ্বল হয়ে রইল।

তখন অনাময় কৃষ্ণ জিগগেস করল, 'তোমরা কি আমাকে আর মনে করো? না কি অকৃতজ্ঞ জ্ঞানে অবজ্ঞা করছ আমাকে? ভগবান

জীবদের একবার সংযুক্ত করেন আবার বিযুক্ত করেন—এই তাঁর লীলা। বাতাস যেমন মেঘ তৃণ ও তুলাকে একবার ঘনবদ্ধ করে আবার বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দেয়। তেমনি ভগবানই আমাকে তোমাদের থেকে বিযুক্ত করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। যদি বলো আমিই ভগবান, তা হলে আর কথা কী, আমাকে ভক্তি করলেই পেয়ে যাবে অমৃতত্ব। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ এতই গরীয়ান যে আমাকে বহু দূর থেকে টেনে নিয়ে আসতে পারে তোমাদের কাছে।'

'কিন্তু আমরা যে গৃহাসক্ত, সংসারকূপপতিত—আর কোন সুদূর বৃন্দাবনেই আমাদের গৃহ।' বললে গোপীরা।

'সংসারকূপ থেকে উত্তরণের অবলম্বনই আমি।'

'জানি।' গোপীরা বললে, 'তাই হে অগাধবোধ যোগেশ্বর, তোমার চরণারবিন্দ গৃহসেবিনী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হোক।'

'তাই হবে। কিন্তু তোমাদের সংসারকূপ কোথায়, কোথায় তোমাদের গৃহের মমতা? দেহ-গেহ ধর্ম-কর্ম সমস্তই তো তোমরা আমার জন্যে বিসর্জন দিয়ে বিনা বেতনের কিঙ্করী হয়েছ। 'দেহস্মৃতি নাহি যার সংসারকূপ কাঁহা তার?' তোমরা তো নিজের সুখ চাও না কোনোদিন, চাও শুধু আমার সুখ।'

'তাই তো বলি, বৃন্দাবনে ফিরে চলো। সেইখানেই তোমার সহজ ভাব, নিঃসঙ্কোচ আনন্দ। আমরা যে বৃন্দাবন-বৃন্দাবন করছি সে গৃহাসক্তির জন্যে নয়, তোমার জন্যে। এখানে বড় বাধা, বড় কুণ্ঠা, অনেক আড়ষ্টতা। বৃন্দাবনেই প্রাণখোলা সারল্যের হাওয়া। স্বচ্ছন্দসেবা। চলো ব্রজপুরে চলো।'

নৃত্য করতে করতে প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাছে এসে পড়েছেন, আর তখুনি তাঁর প্রেমবিবশ দেহ মাটিতে ঢলে পড়বার উপক্রম করল। সসম্ভ্রমে রাজা তাঁকে ধরে ফেললেন—যেন আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে না আহত হন।

রাজার স্পর্শে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হল। তখন ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: 'ছি ছি, আমার বিষয়ীস্পর্শ হল। আমার সঙ্গীরা গেল কোথায়?'

দেহরক্ষী নিত্যানন্দ নিজেই প্রেমবিহ্বল। আর গোবিন্দ আর কাশীশ্বর সেই মুহূর্তে কোথায় না জানি সরে গিয়েছিল। নইলে প্রতাপরুদ্র ধরতে যাবে কেন?

প্রভুর ধিক্কারে রাজার ভয় হল। তখন তাকে আশ্বাস দিল সার্বভৌম। বললে, 'আপনি ভাববেন না। আপনার উপর প্রভু প্রসন্নই আছেন। মনে হচ্ছে লোক-সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁর এই তিরস্কার।'

'তথাপি আপনগণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান॥'

রথ তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে নিয়ে যাবেন সেই আগ্রহে রথের পিছনে গিয়ে প্রভু মাথা দিয়ে রথ ঠেলতে লাগলেন। আর তাতেই রথ হড় হড় করে চলতে লাগল। 'ঠেলিলে চলিল রথ হড় হড় করি। চৌদিকের লোক উঠে বলি হরি হরি॥'

গুণ্ডিচাবাড়ির পথে রথ এসে দাঁড়াল বলগণ্ডিতে। এইখানে জগন্নাথকে ভোগ নিবেদন করা হবে। এবার বিজাতীয় ভিড়। প্রভু তাঁর গণদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী বাগানে প্রবেশ করলেন আর ক্লান্ত হয়ে ঘরের দাওয়ায় পড়ে রইলেন। পরিশ্রমে ঘন ঘর্ম ঝরছে, সুগন্ধি শীতল বায়ু তাঁকে স্নিগ্ধ সেবা করতে লাগল। বহু বহু বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতে বসল ভক্ত আর কীর্তনিয়ার দল।

সার্বভৌমের উপদেশে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ ছেড়ে ছদ্মবেশ পরল, বৈষ্ণব সাজল। হাতজোড় করে সমস্ত ভক্তের নীরব আদেশ নিয়ে সাহস করে প্রভুর পায়ে গিয়ে পড়ল, 'নৃপতি নৈপুণ্যে' করতে লাগল পদসেবা। মাটিতে চোখ বুজে প্রেমাবেশে শুয়ে আছেন প্রভু, অনুভব করছেন কে তাঁর পা টিপছে। শুধু পা টিপছে না, রাম-লীলার শ্লোক শোনাচ্ছে।

'বলো, বলো, আরো বলো।' অপার সন্তোষে প্রভু উচ্চে বললেন বার-বার।

তার পর রাজা পড়ল সেই কথামৃতের শ্লোক। তোমার কথা তাপিতজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের দ্বারা সংস্তুত, কলুষহারী, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলদায়ক, সর্বত্র সর্বকল্যাণহেতু, অমৃতনিস্যন্দী। তোমার কথা যাঁরা কীর্তন করেন, প্রচার করেন, তাঁরাই দানীশ্রেষ্ঠ।

যেই এই শ্লোক শোনা, অমনি প্রভু উঠে বসে রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিলে। আলিঙ্গন ছাড়া আমার আর কিছুই দেবার নেই। তুমি নাও আমার আলিঙ্গন।' 'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥'

জানলেন না কে এ বৈষ্ণব। তবু 'ভূরিদা' বলে, বহুদাতা বলে, সংবর্ধনা করলেন। অনুসন্ধান বিনাই কৃপা করে বসলেন। 'অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল।' অর্থাৎ কৃপা এত শক্তিমান যে ষড়ৈশ্বর্যবান স্বয়ং ভগবান তার হাতের পুতুলের মত রাজাকে আলিঙ্গন করে ফেললেন। বিচার করে দেখলেন না। প্রসন্নতাই কৃপাকে ডেকে নিয়ে এল। কৃপা যন্ত্রী, যন্ত্রমাত্র ভগবান।

'এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥'

বললেন, 'কে তুমি আমার এমন উপকার করলে? আচম্বিতে পান করালে কৃষ্ণামৃত?'

রাজা বললে, 'আমি তোমার দাসের-অনুদাস। আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্য করো।'

'তবে এই তুমি আমার ঐশ্বর্য দেখ।' বললেন প্রভু, 'তবে কাউকেও তা বোলো না।'

কী দেখল রাজা তা রাজাই জানে।

তবু, কে এ দর্শনের অধিকারী, জানেন না প্রভু? জানেন, কিন্তু

ভাব দেখান তিনি জানেন না। বৈষ্ণব বলে জানেন, রাজা বলে জানেন না। 'রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ। অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস।'

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে রাজার। প্রভুকে প্রণাম করলেন প্রাণভরে। রাজার ভাগ্যকে ভক্তরা প্রশংসা করতে লাগল। জোড়হাতে ভক্তদের বন্দনা করে বিদায় নিল প্রতাপরুদ্র।

'বলগণ্ডি' ভোগের প্রসাদ, নি-সকড়ি প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। বাগানেই পঙক্তি রচনা করে প্রভু বসালেন ভক্তদের। নিজেই পরিবেশন করতে লাগলেন। কিন্তু প্রভু নিজে না বসলে কেউ যে হাত লাগাতে পারে না। তখন বসলেন প্রভু। সকলে আকণ্ঠ তৃপ্তি করে খেল। তবু অনেক বেশি হল খাবার, প্রায় হাজার লোকের মত। দীনহীনদের ডাকো, ওদের বসিয়ে দাও প্রসাদ দিয়ে। দলে দলে বসে গেল কাঙালেরা। প্রভু বললেন, বলো হরিবোল। খাও আর বলো জগন্নাথ খাওয়াচ্ছেন। কাঙ্গালেরা খাচ্ছে আর হরি-হরি বলছে।

'কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি॥
'হরি হরি' বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥'

বলগণ্ডি থেকে রথ আবার যাত্রা করবে, কিন্তু, কী আশ্চর্য, টানলেও রথের চলবার নাম নেই। শ্যাম বুঝি বলছেন—আমার গৌর কোথায়? রথ যাচ্ছে না দেখে রাজা পাত্র-মিত্র নিয়ে চলে এল, নিজে হাত দিল কাছিতে, তবু রথ নড়ে না। মহামল্লরা এসে দড়ি ধরল, তবু না। মত্তহস্তী এনে লাগাও। তবু যে-কে সে।

উদ্যানে বসে প্রভু শুনলেন রথের অচলত্বের কথা। নিজ-গণ নিয়ে প্রভু এলেন বেরিয়ে। দেখলেন মত্তহস্তী রথ টানছে, রথ তবু অনড়-অটল। অঙ্কুশের ঘায়ে হাতি আর্তনাদ করছে, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ

করছে, তবু রথ পূর্ববৎ। চারদিকের লোক হাহাকার করছে, রথের কী হল!

প্রভু বললেন, 'হাতি সরিয়ে দাও।'

হাতির দল সরে গেল।

ভক্তদের বললেন, 'তোমরা কাছিতে হাত দাও, আমি পিছন থেকে ঠেলছি মাথা দিয়ে।'

রথ কি কারু চেষ্টায় চলে? রথ চলে জগন্নাথের ইচ্ছায়।

চলেছে, রথ স্নুরু করেছে চলতে!

'আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিবা মাত্র ধায়।
আপনে চলয়ে রথ—টানিতে না পায়॥'

সকলে জয়-জয় করে উঠল। জয় জগন্নাথ। জয় গৌরহরি।

রহস্যটা কী? রথ চলেছে কোথায়? রথ চলেছে বৃন্দাবনে। 'পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে। বিলসিব রাত্রি দিবসে॥' কিন্তু জগন্নাথ যাবেন কেন যদি বৃন্দাবনবিহারিণী রাধা না তাঁকে নিয়ে যায়? তাই তিনি রথ থামিয়ে দিলেন। কেমন তুমি না গিয়ে পারো? আমি রাধার ভাববিগ্রহ, আমার শক্তিতে তুমি সচল হবে। প্রভু অগ্রসর হলেন। মল্ল দরকার নেই, দরকার নেই মত্তহস্তী। সব বিদায় করে দাও। আমার প্রেমের শক্তিতে কৃষ্ণ যাবেন ব্রজধামে। মাথা দিয়ে রথ ঠেলতে লাগলেন প্রভু। সাধ্য কী রথ দাঁড়িয়ে থাকে। রাধার শক্তিতে কৃষ্ণ সঞ্চালিত হলেন।

'চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার।'

পাণ্ডুবিজয় শেষ হল, রথ এসে পৌঁছুল গুণ্ডিচা-বাড়িতে। বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। যার যেই সিংহাসনে বসলেন একে একে।

নর্তন-কীর্তন স্নুরু হল।

সন্ধ্যারতি দেখে প্রভু 'আইটোটায়' গেলেন বিশ্রাম করতে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এসেছে, এই প্রভুর জ্ঞান। আর রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা হচ্ছে—এই প্রভুর রসমগ্নতা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে করলেন জলকেলি।

অদ্বৈতে-নিত্যানন্দে জল ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। হেরে গিয়ে গালাগালি করছে অদ্বৈত। বিদ্যানিধির যুদ্ধ হচ্ছে স্বরূপের সঙ্গে। আর মুরারি গুপ্তের সঙ্গে বাসুদেবের। এ দিকে শ্রীবাস আর গদাধর খেলছে, ও দিকে রাঘব পণ্ডিত আর বক্রেশ্বর। কিন্তু দেখ, দুই গম্ভীর পণ্ডিত, সার্বভৌম আর রামানন্দ, তারাও বাল-চাঞ্চল্য করছে। গোপীনাথকে বলছে, 'এরা দুই প্রামাণিক সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত, এদের কি শোভা পায় চপলতা? নিষেধ করো।'

গোপীনাথ বললে, 'তোমার কৃপাসিন্ধুর একটি বিন্দু যদি উছলে ওঠে তা হলেই মেরু ও মন্দরের মত পর্বত ডুবে যেতে পারে। সার্বভৌম আর রামানন্দের মত দুটি ছোট পাহাড় ডুবে যাবে—তাতে আর বিস্ময় কী। সমস্ত অভিমান ভেসে গিয়েছে এদের। এরা এখন বালক ছাড়া আর কিছু নয়। যারা ভক্তিবিরুদ্ধ নীরস তর্ক করত তারা এখন কৃষ্ণলীলামৃত পান করছে।'

অদ্বৈতকে এনে জলের উপর শোয়ালেন প্রভু। অদ্বৈত অনন্তদেব হল। আর তার উপর প্রভু শুলেন। প্রকটিত করলেন শেষশায়ী নারায়ণের লীলা।

আইটোটার কাছাকাছি জগন্নাথবল্লভ পুনর্যাত্রা পর্যন্ত বাগানে কাটালেন নয় দিন। নিত্য জগন্নাথ-দর্শন। নিত্য নরেন্দ্র-সরোবরে স্নান, নিত্য বনলীলা—চলতে লাগল নিত্য ভজনকীর্তন।

নিত্য বৃন্দাবনবিহার। প্রভুকে দেখে বৃক্ষবল্লী প্রফুল্ল হল, ভৃঙ্গ পিক গাইতে লাগল, সমীরণ শীতল ও সুখস্পর্শ হল। প্রতি বৃক্ষতলে নৃত্য করলেন প্রভু। গাইতে লাগল বাসুদেব। বক্রেশ্বরকে নাচতে বললেন। কারু আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না।

'দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র জলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার ॥'

আমাদের নিজ দেহের স্মৃতি পর্যন্ত নেই, দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা আমরা কী ভাবব? আমরা যোগসিদ্ধ নই যে তোমার চরণচিন্তা করে উদ্ধার খুঁজব। আর কিসের থেকে উদ্ধার? সংসারকূপ থেকে? আমরা কি সংসারকূপে পড়েছি? আমরা পড়েছি বিরহসমুদ্রে। আর তিমি-মাছকেও যে খায় সে তিমিঙ্গিল, কাম-তিমিঙ্গিল আমাদের গিলেছে। তোমার চরণচিন্তা করে ক্ষুদ্র সংসারকূপ পার হওয়া যায়, কিন্তু এই দুস্পার বিরহসমুদ্র উত্তীর্ণ হব কী করে? চরণ নয়, তুমি এসে আমাদের হাত ধরো, আমাদের বুকে তুলে নাও, পার করে দাও এই দুঃখের পারাবার।

প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয় প্রিয়াসঙ্গবিনা
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে তার এই দশা হবে
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ ॥'

আমি মরলে সেও মরবে, তা হলে মরণেও আমার শান্তি হবে না —এই ভেবে প্রিয়-প্রিয়া অনন্ত বিরহ সয়েও বেঁচে থাকে। দুঃখেও প্রিয়হিত কামনা করে। মঙ্গলের জন্যে সেবা করে নারায়ণকে। নিজের সুখ কে চায়? চায় শুধু প্রিয়চিত্তবিনোদন।

স্বরূপ-দামোদর প্রভুতে আবিষ্ট হয়েগান করে আর প্রভু রাধাবেশে মাটিতে বসে অধোমুখে নখের আঁচড় কাটেন। পাছে অঙ্গুলিতে ক্ষত হয়ে যায় স্বরূপ বাধা দেয়। কতক্ষণ বসে থাকবেন, উন্মাদ ঝঞ্ঝায় প্রভুর হৃদয়স্থ আনন্দসিন্ধু উত্তাল হয়ে ওঠে। ভাবপুষ্প ফুটে ওঠে শরীরে, কাঞ্চনাচলে। যে প্রেম দেখল সেই কৃষ্ণ প্রেমে সিঞ্চিত হল। অন্য পরে কা কথা, জগন্নাথও প্রেমসুখে টলমল করতে লাগল।'



৫১

'কাল হোরা পঞ্চমী।' কাশী মিশ্রকে বললে প্রতাপরুদ্র, 'বিরাট করে উৎসবের আয়োজন করো। যেন মহাপ্রভুর চমৎকার হয়।'

এ উৎসব লক্ষ্মীর বিজয়-উৎসব।

নীলাচলে লক্ষ্মীকে রেখে জগন্নাথ সুন্দরাচলে একা গেছেন এরই জন্যে লক্ষ্মীর অভিমান। যেখানে জগন্নাথের মন্দির অবস্থিত সেটা নীলাচল, আর যেখানে গুণ্ডিচাবাড়ি অবস্থিত সেটা সুন্দরাচল।

দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা, পঞ্চমীতেই লক্ষ্মী রাগ করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। রাগ করলেও সাজগোজ করতে ছাড়ে না। পালকি চড়ে বেরিয়ে আসে সমারোহে। বেরিয়ে সিংহদ্বারের কাছে এসে বসে। দাসীদের হুকুম দেয় জগন্নাথের চাকরদের বেঁধে আনতে। দাসীরা চাকরদের তুমুল গালাগাল দিতে সুরু করে। গালাগালে যখন কিছু হল না তখন সুরু করল প্রহার। চাকরেরা করজোড়ে ক্ষমা চাইল, বললে, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে জগন্নাথকে ফিরিয়ে আনব, কথা দিচ্ছি। প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুক্তি দিল চাকরদের।

এই লক্ষ্মীর বিজয়। প্রতি বৎসরই হয় এই লীলাভিনয়। এবার প্রভু দেখবেন বলে বেশি ঘটা।

প্রভাতে উৎসব দেখতে এসেছেন গৌরহরি। কান্তের সামান্য ঔদাস্যেই প্রেমবতী লক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হয়েছে। সুবর্ণের চৌদোলা করে বেরিয়ে আসছে লক্ষ্মী, বাজছে নানা বাদ্য, রথের সামনে দেবদাসীরা নাচছে নানা ছন্দে, কারু হাতে বা ব্যজন-চামর, জলের ঝারি, পানের কৌটো। সিংহদ্বারে ক্রুদ্ধ মুখে বসল লক্ষ্মী। দাসীরা জগন্নাথের ভৃত্যদের বেঁধে

নিয়ে এল লক্ষ্মীর কাছে। সুরু করল কটূক্তি, সুরু করল প্রহার। উঠল রঙ্গরসের তরঙ্গ।

দাসীদের প্রাগলভ্য দেখে মহাপ্রভুর খুশি আর ধরে না।

রসতত্ত্ববেত্তা স্বরূপ দামোদরকে মহাপ্রভু জিগগেস করলেন, লক্ষ্মীর প্রেমের তাৎপর্য কী? সুন্দরাচলে যাবার সময় লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিলেন না কেন জগন্নাথ?

রথযাত্রা-লীলা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা থেকে বৃন্দাবন-গমন-লীলা। ব্যাখ্যা করলেন দামোদর। সুন্দরাচলে যে লীলা তা বৃন্দাবনলীলা। আর এই বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নেই।

কেন নেই?

বৃন্দাবন ঐশ্বর্যলেশশূন্য শুদ্ধ মাধুর্যের ধাম। শুদ্ধ মাধুর্যের অধিকারিণী একমাত্র ব্রজগোপী, লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মীতে ঐশ্বর্যের সমারোহ। বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুগত। লক্ষ্মী তো দেবী, সে আনুগত্যে অসম্মত। সে যে বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর অধিকার নেই। হোক না লক্ষ্মী অঙ্গসংশ্রয়া, হোক না সে বক্ষোবিলাসিনী। সে যে অহঙ্কৃতা, ঐশ্বর্যারূঢ়া। লক্ষ্মীর মধ্যে গোপীপ্রেমবিলাস কই? লক্ষ্মী লক্ষ্মীদেহেই কৃষ্ণমঙ্গল কামনা করে, 'গোপিকা-অনুগা' হয়ে ভজন করে নি। চায় না গোপীদেহ, নেয়নি গোপীদের অনুগতি। তাই প্রেমিকা-প্রেয়সী হয়েও লক্ষ্মী রাসবিলাসে কৃষ্ণসঙ্গ পেল না। কী করে পাবে? শুধু রাণী হলেই কি চলে? শ্রীচরণের দাসীও হতে হয়।

বৃন্দাবন-ক্রীড়ার সহায় ব্রজগোপী। যে শুধু কৃষ্ণ সুখে সুখী। যার প্রেমে আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, অভিমান নেই। যার তৃপ্তি কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্যময়ী। 'নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার।'

'বৃন্দাবন ক্রীড়ায় সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥'

কৃষ্ণের তিনশ্রেণীর প্রেয়সী। লক্ষ্মী, মহিষী আর গোপিকা। লক্ষ্মীরা পরব্যোমে, মহিষীরা দ্বারকা-মথুরায়, আর গোপিকারা ব্রজে, আর ব্রজাঙ্গনারাই কান্তাশ্রেষ্ঠ। তাদের সর্বঢালা ভালোবাসা। নিজের অস্তিত্বকেও পর্যন্ত বিস্মরণে বিসর্জন দেওয়া। পরব্যোমে ঐশ্বর্যের প্রতিপত্তি, দ্বারকায়-মথুরায় মাধুর্য থাকলেও ঐশ্বর্য দ্বারা সঙ্কুচিত, কিন্তু ব্রজে কেবলমাধুর্য।

রাধাই বহুগোপী। বহু কান্তা ছাড়া রসপুষ্টি হয় না। নানা বর্ণ নানা ভঙ্গি নানা স্বভাব। ধীরা মন্থরা প্রখরা মুখরা পীবরা গম্ভীরা—বহুতরা। কেউ স্বপক্ষ কেউ বিপক্ষ কেউ সুহৃৎপক্ষ কেউ তটস্থপক্ষ। বহুলতা—বিচিত্রতাই রসের ধর্ম। আর বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষই তো রাস। 'বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥' কিন্তু কৃষ্ণ কন্দর্পদর্পহা আর গোপিকারা কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণস্বরূপা। গোপিকার সুখের পর্যাবসান কৃষ্ণসুখে।

'দেখ দেখ লক্ষ্মীর মান দেখ।'

এ এক নতুন রকমের মান। এ রোষ। মান তো স্নিগ্ধ, রোষ কটু, তপ্ত। মানে তো কান্তা ভূষণ ছাড়ে, মলিন বসনে অধোমুখে বসে মাটিতে নখের আচড় কাটে। সে মান দেখেছি সত্যভামায়। স্বর্গ থেকে নারদ পারিজাত নিয়ে এল। দিল কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণ তা দিল রুক্মিণীকে। তাই দেখে সত্যভামার মান হল। মুখে বলা হয়, আমিই তোমার আদরিণী, আদরের রাণী, কিন্তু পারিজাতের বেলায় আর সত্যভামা নয়! তখন রুক্মিণীতেই বেশি রুচি। সত্যভামা ম্লানমুখে মূক হয়ে রইল। এ রোষ নয়। রোষ না হলেও এ ঈর্ষা। এ ঈর্ষামান। ঈর্ষামানও সহেতুক।

কিন্তু গোপীমান? গোপীমান অহেতুক।

কৃষ্ণ রাধিকার কুঞ্জে না গিয়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়েছে। রাধিকার মান হয়েছে। কিন্তু এ মান চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যে ঈর্ষার মান নয়, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে মনোমত সেবা করতে পারবে না, সুখ দিতে

পারবে না, সেই শঙ্কায় মান। এ মানের তুলনা নেই। এ রসের নিধান। এই শুদ্ধতম প্রেমের প্রকাশক।

'গোপীমান নদী শতধার।' বহু বিচিত্র রসস্রোতে সে মান অভিব্যক্ত।

মন্দ, মধ্য আর প্রৌঢ়—তিন রকম প্রেম। মন্দ প্রেমে কখনো বিস্মৃতি বা অন্যমনস্কতা আসে। যে প্রেমে কষ্টে হলেও বিরহ সহনীয় তা মধ্য। আর যে প্রেমে বিরহ সহনাতীত তাই প্রৌঢ়। ব্রজে মধ্য ও প্রৌঢ় প্রেম, মন্দ অনুপস্থিত।

মানে কোনো নায়িকা ধীরা, কেউ বা অধীরা, কেউ বা ধীরাধীরা। কান্তকে দূরে দেখে যে মানিনী আসন ছেড়ে ওঠে, কাছে এলে বসতে আসন দেয়, হৃদয়ে কোপ মুখে মধুর বাক্য, আলিঙ্গন করতে এলে আলিঙ্গন করে, পরিহাসে প্রত্যাখ্যান করে শেষ পর্যন্ত, সে ধীরা। অধীরা কী করে? তাড়না করে তিরস্কার করে, কখনো বা বন্ধন করে ফুলডোরে। আর ধীরাধীরার কখনো স্তুতি কখনো নিন্দা কখনো বক্রোক্তি, কখনো বা ঔদাসীন্য।

অন্যভাবের থেকে দেখলে নায়িকা আবার মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভা। মুগ্ধা শুধু মুখ ঢেকে কাঁদে, আবার কান্ত কিছু বিনয়বাক্য বললেই প্রসন্ন হয়। মধ্যা কখনো কোমলা কখনো কর্কশা। আর প্রগলভা, ভাবোদ্গমাভিজ্ঞা, তাড়নতৎপরা। কখনো বা সম্ভোগব্যাপারে উদাসীনা।

নায়িকাদের আবার তিনভাব। প্রখরা, সমা আর মৃদু। যে দুর্লঙ্ঘ্যভাষিতা অর্থাৎ যার বাক্য খণ্ডন করা যায় না সে প্রখরা। খণ্ডন করা যায় আবার যায় না সে সমা। আর যার বাক্য খণ্ডন করা যায় সে মৃদু।

যে যে-ভাবেরই নায়িকা হোক গোপিকার স্বভাব নির্দোষ। কারুরই স্বসুখানুসন্ধান দোষ নেই। তাই ভক্তপ্রেমাধীন প্রেমময়বপু কৃষ্ণ গোপিকার শুদ্ধ প্রেমরসগুণে বশীভূত। যে প্রেমে কামগন্ধ নেই

স্বসুখবাসনা নেই সে প্রেমে রসময়দেহ রসাস্বাদক কৃষ্ণের অশেষ সন্তোষ।

'বলো বলো আরো বলো।' দামোদরকে উত্তেজিত করলেন মহাপ্রভু।

'গোপীদের ঠাকুরাণী রাধিকা। নির্মল উজ্জ্বল রসের আকর। অধিরূঢ় মহাভাব সদা রাধার প্রেম। বিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবাণ হেম॥'

শেষ সীমার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হলেই অনুরাগ 'মহাভাব' নাম ধরে। তার অধিরূঢ় অবস্থা কখন? চোখের পলক পড়লে সেই ক্ষুদ্র সময়ের জন্যে যে অদর্শন তাও অসহ্য মনে হয়। মিলনে কল্পপরিমিত সময়কে মনে হয় অল্পপরিমিত আর বিরহে ক্ষণকালকে মনে হয় অনন্তকাল। যখন নায়কের সুখ তখনো তার আর্তি আশঙ্কা করে নায়িকার খেদ আর নিজের সুখ না দুঃখ সে সম্পর্কে বিস্মৃতি। সেই অধিরূঢ় মহাভাবই রাধিকার। আর দশবাণ হেম—দশ বার আগুনে পোড়ানো হয়েছে যে সোনা সেই সোনার মত অমলিন। শুধু কৃষ্ণসুখে সুখী।

রাধা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণের দর্শন পায় নানা-ভাব-বিভূষণে শোভান্বিত হয়ে ওঠে। জাগে মৌগ্ধ্য ও চকিত, ললিত ও বিলাস। কুট্টমিত, বিব্বোক, মোট্টায়িত, কিলকিঞ্চিত। জেনেও না-জানার ভাব করে জিজ্ঞাসার নাম মৌগ্ধ্য। প্রিয়তমের সান্নিধ্যে, যেখানে ভয়ের কারণ নেই সেখানেও গুরুতর ভয়ের ভাব দেখানোর নাম চকিত। ললিতে অঙ্গবিন্যাসভঙ্গির লাবণ্যস্ফূর্তি। প্রিয়সঙ্গমে আননে ও নয়নে যে আনন্দকৌমুদী তাই বিলাস। অঙ্গস্পর্শে হৃদয়ে আনন্দ হলেও ব্যথিতের ভাব করে ক্রুদ্ধ প্রত্যাখ্যানের নাম কুট্টমিত। কান্তের প্রতি বা কান্তদত্ত উপহারের প্রতি যে অনাদর তাই বিব্বোক। আর মোট্টায়িত হচ্ছে কান্তের কথা শুনে বা মনে করে বাইরের দুঃখকে হৃদয়ের স্থায়ী আনন্দ দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা।

হর্ষে যদি গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাত ভাবের একত্র উদয় হয় তা হলেই কিলকিঞ্চিত।

রাধার কিলকিঞ্চিতভূষিত মুখখানি দেখে কৃষ্ণ যে আনন্দ পায় তা সঙ্গমসুখ থেকে কোটিগুণ বেশি এবং তা বাক্যের অগোচর।

শ্রীবাস পরিহাস করে বললে, 'জগন্নাথের এ কেমন ব্যবহার? বৃন্দাবনের সম্পদ তো শুধু ফুল আর কিশলয়, গিরিমাটি আর শিখিপুচ্ছ। সেখানে কে যায় নীলাচল ছেড়ে? এই ভেবেই লক্ষ্মীর অস্বস্তি। জগন্নাথের রুচির এমন বিকৃতি হল কী করে? তাঁকে উপহাস করবার জন্যেই নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করে বসেছে। আমাকে ছেড়ে কোথায় গেল সেই বনবাদাড়ে। তা ছাড়া, তোমার গোপীরা কী করে? দুধ জ্বাল দেয়, দধি মন্থন করে। আর আমার লক্ষ্মী ঠাকরুণকে দেখ, কেমন রাণীর মত বসেছে রত্নসিংহাসনে।'

'দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে॥'

দামোদর বললে, 'বৃন্দাবনে সম্পদের যে সিন্ধু আছে তার এক বিন্দু বৈকুণ্ঠ, এক বিন্দু দ্বারকা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকান্তাগণ সকলেই লক্ষ্মী, কান্ত পরম পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, সব বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সব ধেনুই কামধেনু। ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, সহজ কথাই গান, সহজ গমনই নৃত্য। আর বংশীই প্রিয় সখী, বলে দেবে কোথায় সঙ্কেত-স্থান, কখন মিলন-মুহূর্ত। আর চিদানন্দই চন্দ্র-সূর্য। চিদানন্দই খাদ্য, চিদানন্দই আস্বাদ্য।'

'বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ সম্পদ তার এক বিন্দু॥
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী তাহাঁ বৃন্দাবনধাম॥
চিন্তামণিময়-ভূমি রত্নের ভুবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ॥

কল্পবৃক্ষলতা যাহাঁ সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাহাঁ চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহো না মানে অন্য ধনে॥
সহজ লোকের কথা যাহাঁ দিব্যগীত।
সহজ গমন করে নৃত্য-পরতীত॥
সর্বত্র জল যাহাঁ অমৃত-সমান।
চিদানন্দজ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহাঁ মূর্তিমান॥
লক্ষী জিনি গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাহাঁ প্রিয় সখীকাজ॥'

রাধার শুদ্ধরস-কথা শুনে প্রভু নৃত্য সুরু করলেন। নিত্যানন্দ বুঝলেন প্রভুর এ রাধাবেশ উপস্থিত। তিনি তো বলদেব, তাই প্রভুর এ ভাব দেখে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে দূরে সরে গেলেন।

গৌরহরি আর নিত্যানন্দ 'একই স্বরূপ—দুই ভিন্নমাত্র কায়।' 'দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।' 'আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।' গুরু, সখা ও ভৃত্য তিনরূপে নিত্যানন্দ লীলা করছে, যেমন ব্রজে করেছিল। নিজেকে কৃষ্ণের কলার কলা বলে মানে। তার একমাত্র কাজ কৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণ করা। তারও বলরাম ভাবাবেশ উপস্থিত হল।

কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া প্রভুকে ধরে কে, সামলায় কে। তাই প্রভুর নাচও থামে না, আবেশও ঘোচে না। এদিকে কীর্তনের দল শ্রান্তিতে এলিয়ে পড়েছে, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন।

শেষকালে স্বরূপই প্রভুর মনোযোগ আকর্ষণ করাল, ভক্তদল আর পারছে না নাচতে-গাইতে। ভক্তশ্রম দেখে প্রভু ক্ষান্ত হলেন।

জগন্নাথের ফের পাণ্ডুবিজয় হল। অর্থাৎ রথ থেকে নেমে এলেন মন্দিরে। এক গাছি পট্টডুরি ছিঁড়ে গেল। পথে যে তুলোর বালিশ পাতা হয়েছিল তাও অনেক ফেটে গিয়েছে। মহাপ্রভু

কুলীনগ্রামের জমিদার সত্যরাজ খান আর রামানন্দ বসুকে আদেশ করলেন, প্রতি বছর তোমরা পট্টডোর তৈরি করে আনবে। জানবে এই তোমাদের জীবনের ব্রত।

সত্যরাজ আর রামানন্দের আনন্দ দেখে কে।

এই ছেঁড়া ডোর নিয়ে যাও। তোমাদের ডোর যেন এর চেয়ে শক্ত হয়। এই পট্টডোরেই অনন্তদেবের অধিষ্ঠান। দশমূর্তি ধরে অনন্তদেব কৃষ্ণের সেবা করে। ছত্র, চামর, পাছুকা, গৃহ, আসন, শয্যা, উপাধান, বসন, যজ্ঞসূত্র আর আরাম—এই দশ মূর্তি।

একদিন মন্দির থেকে বেরিয়ে নিজগৃহে এসে প্রভু নামকীর্তন করছেন, অদ্বৈত এসে প্রভুর পুজো করতে বসল। সুগন্ধি জলে পাত্ত ও আচমন দিল, চন্দন লেপে দিল সর্বাঙ্গে। গলায় মালা দিল, মাথায় তুলসীমঞ্জরী। তু'পায়ে প্রণাম করে করজোড়ে প্রভুর স্তুতি করতে লাগল।

পূজা-পাত্রে যে সব পুষ্প-তুলসী অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে অদ্বৈতকে আবার পুজো করলেন প্রভু। তুমি যে হও সে হও, তোমাকে প্রণাম। রাধে কৃষ্ণ, রমে বিষ্ণো, সীতে রাম, শিবে শিব। যাসি সাসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমস্ততে। রাধা হও কৃষ্ণ হও রমা হও বিষ্ণু হও সীতা হও রাম হও শিব হও তুর্গা হও, যাই কেননা হও, তোমাকে নিরন্তর প্রণাম। তন্ত্রের এই মন্ত্র পড়ছেন প্রভু আর মুখবাত্ত করছেন আর হাসছেন।

প্রভুকে অদ্বৈত ভোজনে নিমন্ত্রণ করল একদিন।

প্রভু যা খেতে ভালোবাসেন তাই নিজ হাতে রান্না করল অদ্বৈত। কিন্তু ভাবনা ধরল যদি প্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসীরাও এসে হাজির হয়! অন্য লোক সঙ্গে থাকলে প্রভু ভালো করে খান না। যেন আজ একলা আসেন। যেন তাঁকে পেট ভরে খাওয়াতে পারি একা-একা।

মধ্যাহ্নে প্রভু তাঁর ভক্তদের নিয়ে স্নান করতে গেলেন। হঠাৎ

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সুরু হল। ধুলোয় ছেয়ে গেল দশদিক। কে কোথায় যাবে পথ খুঁজে পায় না, ঝড়ের দাপটে এখানে-ওখানে ছিটকে পড়ল। প্রভু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

অদ্বৈতদের অঞ্চলে সামান্য ছিটেফোঁটা। ভোগ সাজিয়ে তার উপর তুলসীমঞ্জরী দিয়ে এক মনে ধ্যান করতে লাগল অদ্বৈত, প্রভু যেন একলা আসেন, একেশ্বর হয়ে আসেন। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলতে বলতে প্রভু একাই উপস্থিত হলেন। একলা এসেছ? না এসে উপায় কী! তুমিই তো এ সব ঝড়বৃষ্টি করালে। তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে কৃষ্ণ যে সর্বদা উৎসুক, তোমার হুঙ্কারে-ক্রন্দনেই তার অবতরণ।

'এ কি, কত শাক করেছ!' প্রভু বললেন সবিস্ময়ে।

'দশ রকম করেছি। জানি, শাকেই তোমার সব চেয়ে বেশি প্রীতি।'

'কেন, দধি-দুগ্ধে আমার অরুচি নাকি?'

'না না, তাও আছে বৈ কি।'

যা দেন যত দেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু অস্বীকার করলেন না। প্রেমরসে আহার করতে লাগলেন।

'প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সে-ই পায় সর্বথায়॥
আচার্য! তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন॥'

প্রভুর ভোজনের পর ইন্দ্রের স্তব করতে লাগল অদ্বৈত। বললে, 'আজ জানলাম, ইন্দ্র, তুমিও বৈষ্ণব।'

'হঠাৎ ইন্দ্রকে এত আপ্যায়ন কেন?' জিগগেস করলেন প্রভু।

'তা শুনে তোমার লাভ কী?'

'আমি বুঝেছি।' হাসতে লাগলেন প্রভু : 'ইন্দ্রকে দিয়ে এই সব ঝড়বৃষ্টি করালে। যাতে আমি একা আসি। আর সকলের সঙ্গে এলে আমাকে ইচ্ছামত খাওয়াতে পারবে না তার জন্যেই এই উৎপাত। বলো, তাই না? কিন্তু আমি ভাবছি ইন্দ্রকে আদেশ করতে পারো এত শক্তি তোমার আসে কোত্থেকে? যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাকে তুমি চালিত করো, তোমার এ কোন শক্তি?'

'আমার শুধু ভক্তি-শক্তি।' অদ্বৈত হুঙ্কার করে উঠল : 'সর্বকাল-সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।'

এক দিন প্রভু জিগগেস করলেন ভক্তদের, 'সকলের কুশল তো?'

কুশলের অর্থ কী?

'যার ভক্তি আছে তারই নিত্য কুশল।' বললেন প্রভু, 'ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল। ভক্তি বিনে রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥'

'কিন্তু যে দরিদ্র?'

'তারও কুশল ভক্তিতে। বললেন প্রভু, 'অন্ন-খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত। বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সেই সে ধনবন্ত ॥'

কেউ ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করতে এলে প্রভু বলেন, 'যাও, আগে গিয়ে লক্ষেশ্বর হও। আমার ভিক্ষা শুধু লক্ষেশ্বরের বাড়িতে।'

বিপ্র কেঁদে পড়ে : 'সহস্রই জোগাড় হয় না তা লক্ষ! তুমি যদি আমার ঘরে গিয়ে ভিক্ষা না করো আমার গার্হস্থ্য দগ্ধ হয়ে এখনিই ছারখার হয়ে যাক।'

প্রভু হাসলেন : 'লক্ষেশ্বর কাকে বলি জানো?'

'কাকে?'

'যে প্রতিদিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।'

'তাই নেব। তুমি এসে ভিক্ষা নাও আমার ঘরে। বুঝেছি চৈতন্যচন্দ্রের এই শিক্ষা দিনে অন্তত লক্ষ নাম নিতে হবে।'

'ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥'

রথযাত্রার পর চারমাস থাকলেন পুরীতে।

জন্মাষ্টমীতে গোয়ালার বেশ ধারণ করলেন প্রভু। কাঁধে করে দই-দুধের ভাঁড় নিয়ে এলেন উৎসবক্ষেত্রে। প্রতাপরুদ্র, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম, তুলসী, পড়িছা পাত্র-ও গোয়ালা সেজেছে। দইয়ে দুধে হলুদের জলে উঠেছে স্নান করে।

'শুধু পোশাক ধরলেই কি গোয়ালা হওয়া যায়?' অদ্বৈত বললে, 'লাঠি খেলতে হয়। কে না জানে গোয়ালারাই সব চেয়ে বড় লেঠেল।'

এই কথা? মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ লাঠি খেলতে লাগলেন। কখনো মাথার উপরে, কখনো পিঠের দিকে, কখনো শরীরের দুই পাশে, কখনো বা দু' পায়ের মধ্যে ঘোরালেন লাঠি, কখনো বা শূন্যে তুলে ঘুরন্ত লাঠি লুফে নিলেন কৌশলে। কখনো বা শূন্যে এত বেগে ঘোরালেন যে মনে হল, লাঠি কোথায়, একটা বুঝি চক্র ঘুরছে।

প্রতাপরুদ্রের আদেশে পড়িছা এসে প্রভু ও তাঁর স্বগণদের মাথায় জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র বেঁধে দিল। কানাঞি খুটিয়া নন্দ সেজে এল আর জগন্নাথ মাহিতী সাজল যশোদা। তাদেরকে ব্রজাবেশে পিতা-মাতাজ্ঞানে প্রণাম করলেন গৌরগোপাল।

যে দেখল সেই অবাক মানল। দেখল সন্ন্যাসীরা শুধু আধ্যাত্মিক শক্তিতে নয় শারীরিক শক্তিতেও অগ্রগণ্য।

ক্রমে ক্রমে এল মহাপূজা। এল বিজয়াদশমী। লঙ্কা বিজয়ের দিনে বিজয়াদশমী।

ভক্তরা বানরসৈন্য সাজল আর মহাপ্রভু সাজলেন হনুমান। প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা ভেঙে নিলেন স্বহস্তে, প্রাচীরের উপর গিয়ে বসলেন। ভাঙতে লাগলেন প্রাচীর। কোথায়, কই রে তুই রাবণ? তুই জগন্মাতাকে হরণ করে এনেছিস, তোকে সবংশে শেষ করব।

নিত্যানন্দের সঙ্গে নিভৃতে বসে পরামর্শ করলেন প্রভু। এবার তোমরাই সবাই গৌড় দেশে ফিরে যাও, প্রেমভক্তি প্রচার করো, আর প্রতি বৎসর রথের সময় দেখে যেও আমাকে।

যাত্রার দিন ঠিক হল। সবাই কাঁদতে লাগল নীরবে।

আচার্যকে বললেন প্রভু, 'আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দাও। ভক্তিতে জাতি বর্ণের বিচার নেই, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ নেই। আপামর সকলের কৃষ্ণভক্তি।'

'তুমিও যাও গৌড়ে।' নিত্যানন্দকেও আদেশ করলেন প্রভু, 'অনর্গল প্রেমভক্তি দাও। নির্বিচার প্রেমভক্তি। অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন নেই এখানে। কপাট নেই প্রেমের মন্দিরে। সকলের জন্যে দুয়ার খোলা।'

'প্রভু বলে, শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বর চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥'

রামদাস আর গদাধরকে বললেন, 'যাও, মাঝে-মাঝে আমি যাব তোমাদের কাছে, গোপনে থেকে তোমাদের নাচ দেখব।'

শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তোমার বাড়ির কীর্তনে আমি নিত্যি নাচব। আর কেউ পাবে না কিন্তু তুমি দেখতে পাবে। আর এই প্রসাদী বস্ত্রখানা নাও, মাকে দিও। আর এই সব প্রসাদ।' একটু বুঝি বা কাতর হলেন মহাপ্রভু: 'মায়ের সেবা ছেড়ে আমি সন্ন্যাস করেছি, আমাকে ক্ষমা করতে বোলো। মায়ের সেবাই সন্তানের আসল ধর্ম। তা না করে বাতুলের কর্ম করেছি। বাতুল-বালকের মা কি বাতুল-বালককে ক্ষমা করে না? আমার কথা তাঁকে বোলো, তিনি ঠিক আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার সন্ন্যাসে কী দরকার ছিল—প্রেমধন তো আমার নিজেরই সম্পত্তি। জানো, আমি রোজ তাঁকে দেখতে যাই নবদ্বীপ, তিনি আমাকে দেখেও দেখেন না। ভাবেন গাঢ় চিন্তার ফলে আমাকে নয়, আমার ছায়াকে শুধু দেখছেন। কত দিন বালগোপালের ভোগ খেয়ে এসেছি, আমাকে দেখেও তাঁর দ্বিধা গেল না, এত সব কে খেল? পাত শূন্য কেন? তবে কি গোপাল খেল? না কি উঠোনের কুকুর? না কি আমিই ভোগ সাজাতে ভুলে গিয়েছি?'

একবার স্বরূপদামোদরকে প্রভু জিগগেস করেছিলেন, 'আচ্ছা দামোদর, আমার মাকে যে দেখে এলে তাঁর বিষ্ণুভক্তি আছে?'

'কী বললে? শচীমাতার ভক্তি আছে কিনা?' দামোদর গর্জে উঠল: 'তোমার যে বিষ্ণুভক্তি সব সেই মার শক্তি মার অনুগ্রহ। যাকে বিষ্ণুভক্তি বলে তাই শচীমাতা। সমস্ত ভাববিকার তাঁর দেহে আর শ্রীবদনে সর্বদা হরিনাম। যে শচীমাতা উচ্চারণ করবে জানবে তারও দুঃখ থাকবে না।'

প্রভু দামোদরকে আলিঙ্গন করলেন: 'তুমি আমার মনের কথাই প্রকাশ করলে। আমার ভক্তিসম্পত্তি মার কাছেই পাওয়া। তাঁর ইচ্ছাতেই আমার এই মর্তবিচরণ। তাঁর কাছে আমি চিরন্তন বদ্ধ, তাই তাঁর কাছে আমার নিরন্তর উপস্থিতি।'

রাঘব পণ্ডিতকে বললেন, 'তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি তোমার বশীভূত।'

শুধু নারকেল দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করে রাঘব। নিজের বাড়িতে বিস্তর নারকেল, তবু যদি শোনে কোথাও ভালো নারকেল পাওয়া যাবে, তা যেমন করেই হোক, যত দামেই হোক, ঠিক সংগ্রহ করে আনবে, দেবে কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ স্নিগ্ধ হোক তৃপ্ত হোক। তার বেশি আর চাই কী।

শিবানন্দ সেনকে বললেন, 'তুমি বাসুদেব দত্তকে চালিয়ে নিয়ো। যে দিন যা হাতে আসে খরচ করে ফেলে, কিছু সঞ্চয় করে না। তুমি এর সরকার হয়ে থাকো। এর আয়ব্যয়ের ভাণ্ডারী হও।'

গুণরাজ খান ভাগবতের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে। তার একটি মাত্র উক্তিই তার কৃষ্ণপ্রেম প্রমাণ করেছে। কী সে উক্তি? প্রভু বললেন, 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। প্রেমের গাঢ়তা না থাকলে প্রাণনাথ মুখে আসে না। এই এক বাক্যেই তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি। তোমার কথা কী, তোমার গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়।'

রামানন্দ আর সত্যরাজ খান বললে, 'প্রভু, আমরা গৃহস্থ বিষয়ী মানুষ। আমাদের সাধন কী?'

প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা আর নামসংকীর্তন।'

'বৈষ্ণব চিনব কী করে?'

'যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যায় সেই বৈষ্ণব। সেই সকলের পূজ্য, সকলের শ্রেষ্ঠ। এক কৃষ্ণনামেই সর্বপাপের উচ্ছেদ। নাম থেকেই নববিধ ভক্তি পূর্ণতা পায়। দীক্ষা বা পুরশ্চর্যার কোনো অপেক্ষা করতে হয় না। সম্পূর্ণ উচ্চারণ না করলেও চলবে। জিভে নাম একবার স্পর্শ পেলেই আচণ্ডাল জীবোদ্ধার। নামের মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেম, আনুষঙ্গ ফল সংসারক্ষয়।'

'প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষাপুরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান॥'

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দদাস, পুত্র রঘুনন্দন এল বিদায় নিতে।'

'কে পুত্র কে পিতা ?' জিগগেস করলেন মহাপ্রভু।

'রঘুনন্দনের প্রাকৃত দেহের জন্মদাতা আমি।' বললে মুকুন্দদাস, 'কিন্তু আমার ভাগবতজন্মের জনক রঘুনন্দন। আমার আগে রঘুনন্দনের জন্মেছিল কৃষ্ণভক্তি, ওর থেকেই আমার কৃষ্ণভক্তি শেখা, তাই ওই আমার গুরু, আমার প্রকৃত পালনকর্তা পিতা।'

'ঠিক বলেছ।' সহর্ষে বললেন প্রভু, 'যার থেকে পাওয়া যায় কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু। শোনো মুকুন্দের প্রেমের কথা শোনো।'

ভক্তের মহিমা বলতে পঞ্চমুখ গৌরহরি।

'মুকুন্দ রাজবৈদ্য, মুসলমান রাজা গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক।' বলতে লাগলেন প্রভু, 'একদিন মঞ্চের উপর বসে রাজার সঙ্গে চিকিৎসা সম্বন্ধে কথা বলছে, এক ভৃত্য এসে রাজার মাথার উপর ময়ূরপুচ্ছের এড়ানি পাখা দোলাতে লাগল। ময়ূরপুচ্ছ দেখে মুকুন্দের মনে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হল, মঞ্চ থেকে পড়ে গেল মাটিতে।'

রাজা নিজে নেমে এসে সেবা করতে লাগলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে মুকুন্দকে জিগগেস করলেন, 'হঠাৎ পড়ে গেলে কেন ?'

মুকুন্দ বললে, 'আমার মৃগীরোগ আছে, তাই ও রকম হয় মাঝে-মাঝে।'

রাজা হাসলেন। সর্বতত্ত্ব তাঁর জানা আছে।

মুকুন্দের ইচ্ছে নিত্যি কদম ফুল দিয়ে কৃষ্ণ বিগ্রহকে সাজায়। পুকুর পাড়ে যে কদম গাছ আছে সম্বৎসর তাতে ফুল ফুটিয়ে রাখেন শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করতেই তো ভগবানের আনন্দ।

ধর্মে ধন-উপার্জনই মুকুন্দের কাজ। অর্থাৎ ধর্মপথে থেকে ধর্ম রক্ষা করে ধন-উপার্জন। ধর্মের নামে ব্যবসা করে নয়, ভজনাঙ্গকে পণ্যে পরিণত করে নয়। সাধনভজনের আনুকূল্য না ক্ষুণ্ণ হয়, কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে ধনোপার্জন।

আর রঘুনন্দনের কাজ কী?

রঘুনন্দনের কাজ কৃষ্ণসেবন। 'কৃষ্ণসেবা বিনা ইহার অন্যত্র নাহি মন।'

মুকুন্দদাসের ভাই নরহরিকে বললেন, 'ভক্তসঙ্গে থাকো আর ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথার চর্চা করো।'

সার্বভৌমকে বললেন, 'দারু আর জলরূপে কৃষ্ণ সম্প্রতি প্রকটিত। দারু অর্থ জগন্নাথ আর জল অর্থ ভাগীরথী। দারুব্রহ্ম দর্শন দিয়ে আর জলব্রহ্ম স্নান করিয়ে উদ্ধার করছেন জীবকে। সার্বভৌম, তুমি দারুব্রহ্মের আরাধনা করো।' তাকালেন সার্বভৌমের ভাই বাচস্পতির দিকে : 'আর বাচস্পতি, তুমি জলব্রহ্মের সেবা করো।'

মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'কত বড় ভক্ত মুরারি। কী তার সুদৃঢ় ভজন, কী ভাবনিষ্ঠা, আমার কথায়ও সে তার রামচন্দ্রকে ত্যাগ করল না।'

বাসুদেব দত্ত বললে, 'আমার এক প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো।'

'কী প্রার্থনা?'

'জীবের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।' বললে বাসুদেব, 'তাদের সকলের পাপ আমাকে দাও। আমি চিরন্তন নরকে যাই,

আর সকলের ভবরোগ দূর হোক। সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পাক সকলে।'

প্রভু বললেন, 'তোমার পক্ষে এ প্রার্থনা বিচিত্র নয়, কারণ তুমি সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ। আর ভৃত্যবাঞ্ছা-পূর্তি ভিন্ন কৃষ্ণের অন্যকৃত্য নেই। তবে তুমি পরম বৈষ্ণব, আর পরম বৈষ্ণব যদি কারু মঙ্গল কামনা করে তবে সেও বৈষ্ণব হয়ে যায়। তোমার মঙ্গল কামনায় সর্ব মানুষ বৈষ্ণব হয়ে গেল আর কৃষ্ণ বৈষ্ণবের পাপ ভোগ না করিয়েই দূরীভূত করে দেন। ভক্তদের কর্ম নিঃশেষে দগ্ধ করেন গোবিন্দ।'

প্রহ্লাদ কী বলেছিল? বলেছিল, 'মুনিরা প্রায়ই স্বমুক্তিকামী —তারই জন্যে নির্জনে মৌনাবলম্বন করে তপস্যা করে। পরের মুক্তির জন্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। তারা পরার্থযত্নশীল নয়। কিন্তু আমি এইসব দীনহীন বদ্ধ জীবদের ত্যাগ করে একাকী মুক্ত হতে ইচ্ছুক নই।' 'নৈতান্ বিহায় কৃপণান বিমুমুক্ষে একঃ।'

বিশ্ববন্ধু প্রহ্লাদ আরো বললে নৃসিংদেবকে, 'এই ভ্রান্তদের আপনি ছাড়া রক্ষক কোথায়? স্ত্রীসঙ্গ ও গৃহস্থসুখ—এতে করদ্বয়ের কণ্ডূয়নের মত দুঃখের পর দুঃখই শুধু বাড়তে থাকে। যে অভিলাষ কণ্ডূয়নতুল্য তাকে কে সহ্য করবে, কে প্রশ্রয় দেবে? মূঢ়জনের প্রতিও আপনার অনুগ্রহ, আমার কাজই হচ্ছে সকলের সেবা করা, সকলের মুক্তির উপায় খোঁজা—নিজে পার হতে আমি বিশেষ চিন্তিত নই।'

বাসুদেবও সেই প্রহ্লাদস্বরূপ। আর কৃষ্ণই তো 'নৃণাং কামপুরঃ'—নিখিলজনের কামনাপূর্ণকারক।

'তুমি তো প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্তি বিনু নাহি অন্যকৃত্য ॥

ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনাপাপভোগে হবে সভার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ববল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল?
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥'



৫২

প্রভুর আদেশ পেয়ে নিত্যানন্দ চলল গৌড়ে ফিরে। সঙ্গে রামদাস গদাধরদাস কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত আর রঘুনাথ বেজ।

সমস্ত পরিষদবর্গকে প্রেমময় করে পথ চলেছে নিত্যানন্দ। 'কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত।' প্রথমেই রামদাসের দেহে গোপালের প্রকাশ হল। পথিমধ্যে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রামদাস। আত্মবিস্মৃত হয়ে রইল তিন প্রহর।

গদাধরদাসের রাধাভাব উপস্থিত হল। 'কে দই কিনবে,' 'কে দই কিনবে,' বলে অট্ট অট্ট হাসতে লাগল। রঘুনাথ বৈদ্য-উপাধ্যায় ধরল রেবতীর ভাব। কৃষ্ণদাস আর পরমেশ্বরদাস গোপাল ভাবে বিভাবিত হয়ে উদ্দাম হয়ে উঠল। 'আমি সে অঙ্গদ' বলে লাফিয়ে গাছে উঠে বসল পুরন্দর। পথে-ঘাটে আকাশে-বাতাসে শুধু আনন্দের ঢেউ।

গৌরপ্রেমপাগলের দল চলল এগিয়ে। কখনো বামে কখনো দক্ষিণে, কখন কোন দিকে যাচ্ছে হিসেব নেই, পথের লোককে হঠাৎ জিগগেস করল, 'গঙ্গাতীর কোন পথে?'

'গঙ্গাতীর ?' পথচারী বিস্ময় মানল : 'তুই প্রহরের পথ উলটো চলে এসেছ। এ দিক নয়, ও দিক দিয়ে যাও।'

নির্দেশিত পথ ধরে আবার চলতে লাগল নাম-পাগলের দল। দলের অগ্রে অভিন্নচৈতন্যতনু নিতাই। গৌরাঙ্গবিলাসদেহ। গৌর-রসে গরগর।

'বলতে পারো আমাদের গঙ্গা কতদূর ?'

'সে তো দশ ক্রোশ বামে। এদিকে কোথায় ?'

নিতাই হাসতে লাগল। যতক্ষণ চলছে নামধারা ততক্ষণই গঙ্গা বহমানা।

নিজ দেহসম্বন্ধেই চেতনা নেই, তার কিনা পথের হিসেব থাকবে! 'নিজ দেহ না জানেন পথের কা কথা।' ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ কোথায় চলে গিয়েছে। শুধু চলেছে নামক্রীড়া, নামনর্তন, নামবীর্যবিস্তার।

'অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।' প্রভুর সর্বশক্তিই নিত্যানন্দ। চির অনর্পিত নাম-প্রেম সেধে যেচে বিলিয়ে দিচ্ছে জগজ্জনে। কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে। অদোষদর্শী নিতাই। কে কোথায় পতিত অধম আছে খুঁজে খুঁজে প্রেম বিলোয়। পাপ নিয়ে প্রেম দেয়। অক্রোধ অদম্ভ অকিঞ্চন। অযাচিত কৃপাকারী। কে তোরা প্রেম নিবি, বিনামূল্যে কিনে নিয়ে যা, গোরানিধি বিনামূল্যে বিকিয়ে দেব, হলিই বা না পতিত-দুর্গত, ভয় নেই, কুণ্ঠা নেই, যা গোলোকে গোপন ছিল, নিয়ে যা সেই উজাড় করা প্রেমামৃত। এমন জিনিস আর মিলবে না কোথাও। শুধু কানে শুনলেই হবে, মুখে বললেই হবে, কষ্ট করে এগিয়ে এসে দেখতে হবে না। ধরতে ছুঁতেও হবে না। শুধু একবার বল, হা গৌরাঙ্গ।

'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥
দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার রে।
সে জন আমার হয় আমি হই তার রে॥'

সর্বপ্রথমে গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের ঘরে উঠল নিত্যানন্দ। মকরধ্বজ করকে ডাকল রাঘব, দুয়ে মিলে সপার্ষদ নিত্যানন্দের সেবা করতে লাগল। নিতাইয়ের সর্বদা বিহ্বল অবস্থা। 'বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর।' শুধু হুঙ্কারে-গর্জনে হচ্ছে না, নিতাইয়ের নৃত্য করতে ইচ্ছে হল। কীর্তনে-নর্তনে সুকৃতি মাধব ঘোষ চলে এল সদলে। মাধবেরা তিন ভাই—মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব। তিন ভাইই কীর্তন জুড়ল। আর নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দ হয়ে উঠল। পদভরে টলমল করতে লাগল পৃথিবী। আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়তে লাগল বার-বার। নাচতে-নাচতে যার দিকে তাকায় সেই প্রেমে ঢলে পড়ে।

রাঘবের ঘরে খট্টার উপরে উঠে বসল নিতাই। বললে, অভিষেক করো। ঘটে-ঘটে গঙ্গাজল আনা হল, নানা গন্ধে সুবাসিত করে নিতাইয়ের মাথায় ঢালতে লাগল সকলে। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। উঠল অভিষেক-মন্ত্র। নতুন বসন পরানো হল নিতাইকে, চন্দনে চর্চিত হল শ্রীঅঙ্গ। সতুলসী বনমালায় সজ্জিত হয়ে নিতাই আবার উপবিষ্ট হল। তার মাথায় ছাতা ধরল রাঘব।

নিতাই বললে, 'কদম্বের মালা গেঁথে আনো। কদম্ব আমার প্রিয় ফুল। আর কদম্বের বনেই আমার নিত্য বসতি।'

সবিনয়ে রাঘব বললে, 'এটা তো কদম্বের সময় নয়।'

'না, না, তোমার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখ কোথাও ফুটেছে কিনা কদম্ব।'

অভিভূতের মত বাড়ির অঙ্গনে এসে দাঁড়াল রাঘব। এ কী অভাবনীয়, জাম্বীরের বৃক্ষে অসংখ্য কদম্বফুল ফুটে আছে। যেমন বর্ণ তেমনি গন্ধ। তেমনি শোভাবিস্তার।

সেই কদম্বের মালা গাঁথল রাঘব। ভুবনসুন্দর নিত্যানন্দের গলায় দুলিয়ে দিল।

ভক্তের দল সুবাসে বিভোর হয়ে গেল।

কদম্বগন্ধ ছাপিয়ে এ আবার কিসের গন্ধ আবির্ভূত হল ?

'এ কিসের গন্ধ ?' জিগগেস করল নিতাই।

'মনে হচ্ছে এ দমনক ফুলের গন্ধ।' ভক্তের দল বলাবলি করতে লাগল।

'ঠিকই বলেছ, এ দমনক ফুলের গন্ধ।' বললে নিতাই, 'কিন্তু এ গন্ধ কোত্থেকে এল ?'

'কোত্থেকে এল ?' চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ভক্তেরা।

'তোমাদের কীর্তন শুনতে চৈতন্যগোঁসাই নীলাচল থেকে এখানে এসেছেন।' নিতাই বললে আনন্দগদগদ হয়ে, 'তাঁর গলায় দমনক ফুলের মালা। তারই গন্ধ পাচ্ছ তোমরা। সুতরাং আর সব কাজ ফেলে কৃষ্ণগুণগান করো। গৌরাঙ্গযশে সকলে পূর্ণ হয়ে ওঠো।' প্রেমহুঙ্কার করল নিতাই। তার প্রেমদৃষ্টিপাতে সকলের আত্মবিস্মৃতি ঘটল।

'অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
অধম চণ্ডাল জনার ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥'

সর্বজগতে ভক্তি দান করতে লাগল নিতাই। নিতাই দাতার শিরোমণি। উত্তম-অধম মানে না, অদৃশ্য-অস্পৃশ্য নেই, গৌড়ে প্রেম-বন্যা নিয়ে এল। যত দুঃখী কাঙাল ছিল সকলে প্রেমধনে ধনী হয়ে গেল।

'যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥'

গৌড়ীয় ভক্তেরা দেশে ফিরে গেল। দশজন সন্ন্যাসী থাকল প্রভুর সঙ্গে। আর থাকল গদাধর পণ্ডিত।

সার্বভৌম বললে, 'এবার তবে তুমি আমার ঘরে চলো, নিত্য ভিক্ষা গ্রহণ করবে।'

প্রভু বললেন, 'এটা সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। প্রত্যহ একই ঘরে সন্ন্যাসী ভিক্ষে করে না।'

'তা হলে মাসে অন্তত দশ দিন করো।'

'না, এক দিন।'

সার্বভৌমের অনেক কাতরতার পর মাসে পাঁচ দিন ভিক্ষা করতে রাজি হলেন প্রভু। আর বাকি পঁচিশ দিনের পাঁচ দিন পরমানন্দ, চার দিন দামোদরস্বরূপ আর দু দিন করে বাকি আটজন। মাসভোর সাধুসেবা করতে পারবে সার্বভৌম।

বেশ, তাই সই। তবে আজ তুমি চলো আমার বাড়ি। একা-একা এস। অনেককে একদিনে একত্র নিমন্ত্রণ করতে পারি এমন আমার সাধ্য নেই।

তাই যাব।

সার্বভৌমের মেয়ের নাম ষাঠী, সেই সুবাদে গৃহিণীর নাম ষাঠীর মা। ষাঠীর মাকে খবর দিতেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, তখুনি চড়িয়ে দিল রান্না। সব দ্রব্যই ঘরে আছে, শুধু শাক-সব্জিই আহরণ করতে গেল ভট্টচায।

পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়। এক ঘরে শালগ্রামের ভোগসেবা, অন্য ঘর নিভৃতে প্রভু ভিক্ষা করবেন বলে নতুন নির্মাণ করেছে সার্বভৌম। ঘরের দুই দ্বার। বাইরের দ্বার প্রভুর প্রবেশের জন্য আর ভিতরের দ্বার পাকশালা হতে এসে পরিবেশন করবে বলে।

প্রভু এসে দেখলেন বিরাট আয়োজন। উৎকলে-বঙ্গে যত রকম ভক্ষ্য আছে সমস্ত একত্র করা হয়েছে। নিমশুকতো থেকে সুরু করে চাঁপাকলা সহ ঘন দুধ। কত রকমের শাক আর ঘণ্ট আর ভাজা আর বড়ি। বড়া আর ঝোল। কত রকম পুলি আর পিঠে।

ঘৃতসিক্ত পরমান্ন। সন্দেশ আর দই। সর্বোপরি ব্যঞ্জনের উপর তুলসীমঞ্জরী।

সার্বভৌম প্রভুর পা ধুইয়ে দিল। প্রভু সবিস্ময়ে বললেন, 'দুই প্রহরের মধ্যে এত সব রাঁধলে কী করে? একশো উনুনে যদি একশো জনও কাজ করে তবে এত অল্প সময়ে এত বোধ হয় পাক করা যায় না। তার পর তুলসীমঞ্জরী দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য কৃষ্ণকে উৎসর্গ করেছ। তুমি কী ভাগ্যবান। তোমার সমস্ত উদ্যোগ সফল। মনে হচ্ছে কৃষ্ণ এ সবের আস্বাদ নিয়েছেন, নইলে অন্নব্যঞ্জনের এত সুন্দর বর্ণ কেন, কেন তবে এত সুগন্ধ উঠছে? আমারও কত ভাগ্য আমি এই প্রসাদের অংশ পাব।'

'ভাগ্যবান তুমি সফল তোমার উদযোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ॥
অন্নের সৌরভবর্ণ পরমমোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন॥'

সার্বভৌম বললে, 'যিনি খাবেন তাঁরই শক্তিতে এত সব তৈরি হয়েছে। আমার উদ্যোগ বা গৃহিণীর রন্ধন, এসব কিছুই নয়। যাঁর শক্তিতে ভোগসিদ্ধি তাঁর কিছুই অজানা নেই।'

আসন আগে থেকে পাতা ছিল তা লক্ষ্য করে প্রভু বললেন, 'এ আসন কৃষ্ণের জন্যে পাতা। এ পূজ্য আসন। এ তুলে নাও। আমাকে অন্য পাত্রে অন্য স্থানে প্রসাদ দাও।'

'তুমি এ কী বলছ?' সার্বভৌম আপত্তি করল। 'এ-সব আয়োজন যদি তোমার মনঃপূত হয়ে থাকে, জানবে সমস্তই তোমার ইচ্ছায়। আসন তুলতে যাব কেন? আসনও তোমার ইচ্ছায়। সুতরাং এই আসনেই বোসো।'

'বা, এ যে কৃষ্ণের আসন। কৃষ্ণের আসনে বসি কী করে?'

'যেমন করে তার প্রসাদ পাবে।'

প্রভু সার্বভৌমের মুখের দিকে তাকালেন।

সার্বভৌম বললে, 'কৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন যেমন প্রসাদ, কৃষ্ণে নিবেদিত আসনও তেমনি প্রসাদ। যদি অন্ন খেতে পারো আসনে বসতে অপরাধ কিসের?'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছ। কৃষ্ণের সমস্ত ভুক্তশেষই ভক্তের প্রাপ্য।' 'কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়।'

উদ্ধব কৃষ্ণকে বললে, 'তোমার উপভুক্ত মাল্য, চন্দন, বসনভূষণে সজ্জিত হয়ে তোমার উচ্ছিষ্ট খেয়েই তোমার মায়াকে পরাস্ত করি। যারা নগ্ন, ঊর্ধ্বরেতা, শ্রমণ, শান্ত, শুদ্ধ সন্ন্যাসী ঋষি তারা ব্রহ্মধামে গমন করুক, আমরা সংসারমধ্যে কর্মমার্গে ভ্রমণ করলেও, শুধু তোমার মানবানুকরণ গতি, হাস্যপরিহাস, কর্ম ও বচনাবলী স্মরণ করে, দুস্তর অন্ধকার থেকে অনায়াসে উদ্ধার পাব। আমাদের জ্ঞান-বৈরাগ্যে দরকার নেই।'

'কিন্তু যাই বলো এত খাদ্য আমি খাব কী করে?

'তোমার খাদ্যের পরিমাণ কী তা আমার জানা আছে।' বললে সার্বভৌম, 'নীলাচলে তুমি রোজ বাহান্ন বার খাও, দ্বারকাতে ষোল হাজার মহিষীর মন্দিরে, আর ব্রজে তো তোমার আত্মীয়ের ছড়াছড়ি। তার পর তোমার সখী গোপিনীরা। প্রত্যেকের ঘরে রোজ তোমার দুবেলা বাঁধা আহার। এ সব ছেড়ে দিই। গোবর্ধনযজ্ঞে তুমি যত ভাত খেয়েছ তার এখানকার অন্ন এক গ্রাসেরও কম হবে। দয়া করে এক গ্রাস মাধুকরী তুমি গ্রহণ করো।'

'তুমি তো ঈশ্বর, মুঞি ক্ষুদ্র কোন ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার।।'

স্মিতমুখে প্রভু বসলেন আসনে। অলৌকিক ভোজন করাবার জন্যেই বুঝি এই একক নিমন্ত্রণ।

এমন সময় অমোঘের আবির্ভাব।

অমোঘ সার্বভৌমের জামাই, ষাঠীর স্বামী। কুলীন ব্রাহ্মণ,

শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়ে আছে। যাকে-তাকে যখন-তখন নিন্দা করে, মুখর রসনাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে জানে না। তার সম্বন্ধে সার্বভৌমের সব সময়ে ভয়, কখন কী উৎপাত বাধায়। হাতের কাছে একটা লাঠি এনে রেখেছে, যদি তেমন কিছু বিঘটন করে, প্রহার করবে।

কিন্তু নিজ হাতে পরিবেশন করতে হলে লাঠিতে মনোযোগ রাখা কঠিন।

'বাপরে বাপ! একা একটা সন্ন্যাসী এত খাবে!' হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অমোঘ এসে উপস্থিত: 'এতে অন্তত দশ-বারো জনের পেট ভরে স্বচ্ছন্দে!'

কী, প্রভুর নিন্দে! স্বকর্ণে শুনতে হল! সার্বভৌম চকিতে লাঠি কুড়িয়ে নিল। আর নিমেষে ছুট দিল অমোঘ।

সার্বভৌম ছাড়বে না কিছুতেই। পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু অমোঘের সঙ্গে ক্ষিপ্রতায় পারবে সার্বভৌমের সাধ্য কী।

ধরতে পারল না অমোঘকে। গাল দিতে-দিতে ফিরে এল সার্বভৌম। এসে দেখল নিন্দাসত্ত্বেও আনন্দসুন্দর নেত্রে হাসছেন অনিন্দ্যসুন্দর।

ষাঠীর মা ভেবেছিল অমোঘ ধরা পড়বে আর এ অন্যায়ের প্রতিকার হবে। কিন্তু স্বামীকে রিক্তহাতে ফিরতে দেখে তার দুঃখ দ্বিগুণতর হল। মাথায় বুকে করাঘাত করতে-করতে বললে, 'ষাঠী বিধবা হোক। অমোঘ মরুক।'

'না, না, তোমরা এত কাতর হচ্ছ কেন?' বললেন প্রভু, 'অমোঘ বালক। বালকস্বভাবে সরল কৌতূহলে যা বলেছে তাতে অত ক্ষুব্ধ হবার কী আছে! আর কী আছে দাও, আমি খাচ্ছি পেট ভরে।'

সার্বভৌম আর তার স্ত্রীর সাধ মিটিয়ে খেলেন প্রভু।

আচমন করবার পর সার্বভৌম মুখবাস দিল, মালাচন্দনে ভূষিত করল, পরে দণ্ডবৎ হয়ে বললে, 'প্রভু, আমাকে মার্জনা করো।

আমি তোমাকে নিন্দা শোনাবার জন্যেই আমার ঘরে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম—'

'বা, অমোঘ তো অন্যায় কিছু বলেনি।' প্রভু স্বচ্ছমুখে বললেন, 'আমার পাতের অন্নে সত্যি-সত্যিই তো দশবারো জনের পেট ভরতে পারত। আর অমোঘের কথায় তোমার অপরাধ কী।'

প্রভু বাসায় চললেন, সার্বভৌম তার পিছু নিল। আত্মনিন্দা করতে লাগল। আমার অসাবধান হবার কী হয়েছিল! আমার যদি ভক্তিলেশ থাকত তবে প্রভুর নিন্দা শুনে আমার প্রাণত্যাগ হল না কেন?

প্রভু তাকে শান্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরে ফিরে এসে গৃহিণীকে বললে, 'যে আমার চৈতন্য গোঁসাইয়ের নিন্দা করে তাকে হত্যা না করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নয়তো আত্মহত্যা করব। কিন্তু ব্রাহ্মণদেহ বলে দুটোই অবিহিত। যাই বলো, কখনো ও-নিন্দুকের মুখদর্শন করব না।'

'কিন্তু,' ষাঠীর কথা ভেবে কিছু বোধ হয় বলতে চাইল গৃহিণী।

'তুমি ষাঠীকে বলো ও ঐ অপদার্থটাকে ত্যাগ করুক। পতি যদি পতিত হয় তাকে তার স্ত্রী বিধিমত ত্যাগ করতে পারে।'

'অমোঘ পতিত হয়েছে?'

'ভগবানের নিন্দা করার দরুনই সে পতিত। সে পাতকী।'

'তাকে ত্যাগ করবে ষাঠী?'

'নিশ্চয়ই করবে। কী বলছে শাস্ত্র? পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ। যতক্ষণ স্বামী অপতিত পাতকশূন্য, ততক্ষণই স্ত্রী তাকে ভজনা করবে। নচেৎ নয়, কখনো নয়।'

ষাঠী কাঁদতে লাগল।

নারদ ভাগবতে স্ত্রী-ধর্ম বর্ণনা করছে। পতিশুশ্রূষা, পতির আনুকূল্য ও অনুবৃত্তি, সর্বদা পতির নিয়মধারণ—এই কটি পতিব্রতার লক্ষণ ও ধর্ম। সাধ্বী স্ত্রী সম্মার্জন, উপলেপন, গৃহভূষণ, গৃহের

সৌগন্ধ-সম্পাদন করবে ও প্রত্যহ স্বয়ং সজ্জিত হয়ে বিচিত্র ভোগ্যবস্তু প্রদানে, বিনয়ে, সংযমে, সুনৃতবাক্যে ও প্রণয়-প্রকাশে সর্বদা পতিসেবা করবে। যথালাভে সন্তুষ্টা, অলোলুপা, আলস্যহীনা, প্রিয়বাদিনী, সাবধানা, শুচি ও স্নিগ্ধ হয়ে রমণী পতির ভজনা করবে। যে নারী লক্ষ্মীর মত পতিপরায়ণা হয়ে হরিভাবে পতির সেবা করে সে বৈকুণ্ঠে হরিস্বরূপ পতির সঙ্গে বিহারিণী লক্ষ্মীরই মত আনন্দ পেয়ে থাকে।

এদিকে অমোঘের আর দেখা নেই। কোথায় গেল কে বলবে।

সকালে শোনা গেল রাত্রিতে অমোঘ যেখানে ছিল সেখানে তার ওলাউঠা হয়েছে।

'বেশ হয়েছে।' বলে উঠল সার্বভৌম, 'দৈব আমার সাহায্য করতে এসেছে।'

'তুমি কী বলছ?' গৃহিণী ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'ঠিকই বলছি। যারা মহৎ তাদের যে অবমাননা করে তার আয়ু শ্রী যশ ধর্ম তার সমস্ত কল্যাণ নষ্ট হয়ে যায়। আর এ তো ঈশ্বরেতে অপরাধ। সন্দেহ কী, সেই কারণেই অমোঘ মরতে বসেছে।'

পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে, তাদের দুর্দশা উপভোগ করবার জন্যে দুর্যোধন এসেছে সপরিবারে। সেইখানে গন্ধর্বদের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল। গন্ধর্বেরা ধার্তরাষ্ট্রদের পরাস্ত করে সদলে বেঁধে নিয়ে চলল। যুধিষ্ঠির জানতে পেরে ভীম-অর্জুনকে আদেশ করলেন, ওদের মুক্ত করে নিয়ে এস। ভীম বললে, হস্তী অশ্ব রথ পদাতিকের সাহায্যে যা আমাদের বহু যত্নে ও আয়াসে করতে হত, গন্ধর্বেরা তা সহজে সম্পন্ন করেছে—এ জন্যে আমাদের দুঃখ কী? মহতের অবমাননা করেছিল বলেই তো ওদের এই লাঞ্ছনা, এ আমরা লাঘব করতে যাই কেন?

আবার ভাগবত বলছে, মহতের অবমাননায় মানুষের আয়ু শ্রী যশ ধর্ম স্বর্গলোক স্বীয় বাঞ্ছিত বিষয় ও সমুদয় ইষ্ট বিনষ্ট হয়।

গোপীনাথ ছুটল প্রভুর কাছে।

প্রভু জিগগেস করলেন, 'সার্বভৌম কেমন আছে? তার মনের দুঃখ মিলিয়ে গেছে তো?'

'কই আর গেল! স্বামী-স্ত্রী তো সেই থেকে উপবাস করে আছে। দুঃখের উপর দুঃখ, অমোঘের ওলাউঠা হয়েছে। জীবনের আশা নেই।'

'সে কী কথা?' প্রভু চঞ্চল হয়ে উঠলেন: 'আমাকে এখুনি অমোঘের কাছে নিয়ে চলো।'

আর কথা নেই, প্রভু অমোঘের শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হলেন। অমোঘের বুকে শ্রীহস্ত অর্পণ করলেন। বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় সহজ নির্মল ছিল, ছিল কৃষ্ণের বিশ্রামের যোগ্য স্থান, কিন্তু মাৎসর্যচণ্ডাল এসে বসল বিজয়ীর মত, পরম পবিত্র স্থানকে কলুষিত করে দিল। তুমি সার্বভৌমের সঙ্গ করেছ, সুতরাং তোমার কল্মষের ক্ষয় হয়েছে। আর কল্মষ দূর হলেই জীব কৃষ্ণনামে উন্মুখ হয়। অমোঘ, তুমি ওঠো, কৃষ্ণ নাম বলো, ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন।'

অমোঘ চোখ মেলে চাইল। আশ্চর্য! এ কি, তুমি? তুমিই সেই দীনদয়ার্দ্রনাথ?

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো।'

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ।' অমোঘ উঠে বসল। শুধু উঠে বসল না, দাঁড়াল খাড়া হয়ে। প্রেমোন্মাদে নাচতে লাগল।

সেই প্রেমের তরঙ্গ দেখে প্রভু হাসতে লাগলেন।

নৃত্য থামিয়ে প্রভুর চরণ ধরল অমোঘ। বললে, 'প্রভু, দয়াময়, আমার অপরাধ মার্জনা করো। এই ছার মুখে তোমার নিন্দা করেছি, এই মুখ আর রাখব না।' বলে দু হাতে দু গালে চড় মারতে লাগল প্রাণপণে।

গোপীনাথ নিরস্ত করল শেষ পর্যন্ত।

অমোঘের গায়ে প্রভু ব্যথাহরণ স্নেহস্পর্শ রাখলেন। বললেন,

'সার্বভৌম সম্পর্কে তুমি আমার প্রিয়পাত্র। সার্বভৌমের গৃহের দাসদাসী এমন কি কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। সুতরাং, তোমার কোনো অপরাধ নেই। তুমি শুধু কৃষ্ণ নাম করো, বলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ।'

'প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥
সার্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥'

তারপর সার্বভৌমের বাড়ি এসে সার্বভৌমকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। বললেন, 'কেন তোমরা উপবাস করে আছ? অমোঘ শিশুসমান, পুত্রসমান, তার প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হও? ওঠো, স্নান করো, জগন্নাথকে দর্শন করে এস, পরে আহার করো—আর, তবেই আমার সন্তোষ।'

সার্বভৌম বললে, 'অমোঘকে তুমি কেন বাঁচালে? ওর অপরাধের মার্জনা নেই। ওর মরাই তো উচিত ছিল।'

'কী বলো তার ঠিক নেই। আমোঘ যে কৃষ্ণনাম নিয়েছে। অমোঘ যে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।' প্রভু করুণাকোমল চোখে তাকালেন: 'ওর আর অপরাধ কোথায়?'

জগাই-মাধাই উদ্ধার পেয়েছে, অমোঘও উদ্ধার পেল।

'সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥'

প্রভু ঘোষণা করলেন, 'আমি এবার বৃন্দাবন যাব।'

খবর শুনে প্রতাপরুদ্র বিমর্ষ হল। সার্বভৌম আর রামানন্দকে ডাকাল। বললে, 'প্রভু যদি নীলাদ্রি ছেড়ে চলে যান, বাচব কি করে? তোমরা তাঁকে ধরে রাখবার উপায় করো।'

সার্বভৌম রামানন্দকে নিয়ে প্রভু-সকাশে উপস্থিত হল। বললে, 'এখুনি যাবে কী? কার্তিক মাসে যেও। আবার একবার রথযাত্রা দেখ।'

কার্তিক এলে পরে বললে, 'এখন দারুণ শীত। দোলযাত্রা দেখে যাও।'

আজ নয় কাল, এ মাস নয় ও মাস, এই বলে নিবৃত্ত করতে লাগল। কী করে যেতে দিই, বিচ্ছেদক্লেশ সইব কী করে?

যদিও প্রভু সর্বস্বাধীন তবু ভক্ত-ইচ্ছা ছাড়া চলতে পারেন না। 'ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে।' 'যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু—নহে নিবারণ। ভক্ত-ইচ্ছা-বিনা তবু না করে গমন॥'

আবার বর্ষান্তরে রথের প্রাক্কালে গৌড়ীয় ভক্তেরা নীলাচলে যাবার মন করল। অদ্বৈতের ঘরে আবার মিলিত হল সকলে। নিত্যানন্দ বললে, 'আমিও যাব।' যদিও প্রভুর আদেশ গৌড়ে থেকে প্রেমভক্তি প্রকাশ করি, তবু এ যাত্রায় আবার তাঁকে একটু চোখে দেখবার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। কিছুতেই যে এ প্রেম নিরোধ করতে পারি না।'

নিত্যানন্দের এ প্রেমচেষ্টা কে বোঝে? তার প্রতি প্রভুর আদেশ, গৌড়ে থেকে প্রেমভক্তি প্রচার করো, তবু সে সে-আদেশ অমান্য করল। এই এক অনুরাগ-রঙ্গ। সঙ্গলাভের জন্যে আজ্ঞাভঙ্গ। সকলে এসেছে গৌড় থেকে, আমার নিতাই আসেনি—এতে কি প্রভু খুশী হতেন? কখনো না, বরং ব্যথিত হতেন, উতলা হতেন। সুতরাং প্রভুকে প্রিয়কে আনন্দ দেবার জন্যই এই ব্যতিক্রম। ভক্ত কথা রেখেছে এতে যেমন কৃষ্ণের তৃপ্তি, ভালোবাসার জন্যে ভক্ত কথার অবাধ্য হয়েছে এতে কৃষ্ণের অধিকতর সন্তোষ। রাস-অন্তে গোপীদের কৃষ্ণ ঘরে ফিরে যেতে বললে, কিন্তু সে-আদেশ উপেক্ষা করে তারা কৃষ্ণলগ্ন হয়ে রইল। বুঝল এই লগ্নতা এই লিপ্ততার মধ্যেই কৃষ্ণের বেশি সুখ। তাই গৌরহরিকে সুখী করবার জন্যে নিতাইয়ের এ আজ্ঞালঙ্ঘন। নিতাই সঙ্গে না থাকলে গৌরের সুখ কই? 'সুখ দিতে গৌরাঙ্গ ধনে, কেউ নাই আমার নিতাই বিনে।'

এও কি প্রেমভক্তির প্রকাশ নয়? 'নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে?'

আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই—সবাই চলল। চলল ঘোষেরা তিন ভাই, বাসুদেব মুরারি আর গোবিন্দ। প্রভুর জন্যে বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্য দিয়ে প্যাঁটরা সাজিয়ে চলল রাঘবপণ্ডিত। পট্টডোরী নিয়ে কুলীনগ্রামের খানেরা। শ্রীখণ্ডের নরহরি আর রঘুনন্দন। শিবানন্দের উপর ব্যয়বহনের ভার, পথের তদারকি। সকলের দেয় পথকর সে নিজেই দেবে। সেই জানে কোন পথে শ্রীক্ষেত্র।

এবারে সঙ্গে বৈষ্ণবগৃহিণীরাও চলেছে। চলেছে অদ্বৈতের স্ত্রী, সীতাদেবী, চলেছে মালিনী শ্রীবাসঘরণী। শিবানন্দও সস্ত্রীক চলেছে। আচার্যরত্নও তাই। প্রভুকে ভিক্ষা দেবার জন্যে প্রভুর নানা প্রিয় খাদ্য নিয়েছে সংগ্রহ করে। আচার্যরত্নের গৃহিণী আবার শচীদেবীর বোন, তার প্রতি প্রভুর স্নেহের কথা কে না জানে।

সব শেষে চলেছে শিবানন্দের বালক পুত্র চৈতন্যদাস। প্রভুকে দেখবে, তারও উল্লাস নিরবধি।

প্রথমে তারা রেমুণায় গোপীনাথ দর্শন করল। অদ্বৈত কীর্তন-নর্তন করল। সেবকেরা বহুমানে নিত্যানন্দের বন্দনা করল। সকলে সেখানেই রাত্রি যাপন করবে স্থির করল, সেবকেরা বারো থালা ক্ষীর এনে ধরল ওদের সামনে। নিত্যানন্দ সকলকে ভাগ করে দিল, শোনাল সকলকে মাধব পুরীর কথা, তার জন্যে গোপীনাথের ক্ষীর চুরির কথা। ভক্তের জন্যে ভগবানের চোর সাজা।

ক্ষীরপ্রসাদে তাই বুঝি আজ নতুন স্বাদ, নতুন সৌরভ।

রাত্রি রেমুণায় কাটিয়ে পরদিন সকলে সাক্ষীগোপাল পৌঁছুল। সেখান থেকে আঠারোনালা। প্রভু খবর পেলেন গৌড়ভক্তরা গৌরভক্ত হয়ে এসে পড়েছে। গোবিন্দকে দিয়ে দু গাছি মালা পাঠালেন। একগাছি অদ্বৈতের জন্যে, আরেকগাছি নিত্যানন্দের গলায়।

এত দিন গৌরকীর্তন চলছিল, এখন প্রাণগৌরের সুখের জন্যে সকলে কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করল।

নরেন্দ্র সরোবরের তীরে স্বরূপ মালা হাতে ভক্তদের অভ্যর্থনা করল।

সিংহদ্বারে স্বয়ং প্রভু দাঁড়িয়ে।

ভক্তে-ভগবানে আবার মিলন হল। আবার চলল কীর্তন-বিলাস। আগের মতই চলল গুণ্ডিচা-মন্দির-প্রক্ষালন, রথাগ্রনর্তন। হোরাপঞ্চমী লীলাদর্শন। আগের মতই আবার ঝুলন জন্মাষ্টমী বিজয়াদশমী, দেওয়ালি আর রাসযাত্রা।

চাতুর্মাস্যও কেটে গেল। নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু নিভৃতে যুক্তি করতে বসলেন। বললেন, 'তোমার প্রতি বৎসর নীলাচলে আসবার কী দরকার? তুমি গৌড়ে থেকেই আচণ্ডাল হরিনাম বিতরণ করো এ আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার অভিপ্রেত কাজ, তুমি জানো, অন্যের পক্ষে দুষ্কর, শুধু তুমিই তা সম্পন্ন করতে পারো।'

নিত্যানন্দই মূল ভক্তিতত্ত্ব। নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া ভক্তি লাভ হবে না। 'নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।' 'হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই।'

নিত্যানন্দ বললে, 'প্রভু, তুমি প্রাণ আমি দেহ। দেহ আর প্রাণ কী করে আলাদা থাকে? তবে তোমার অচিন্ত্যশক্তিতে তাও সম্ভব। তাই তুমি যা করাবে তাই করব। আমার আবার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?'

নিতাই আবার তাই গৌড়ে ফিরে চলল। ফিরে চলল আর সকলে।

কুলীনগ্রামীরা জিগগেস করলে, 'প্রভু, আমাদের কর্তব্য কী বলুন।'

'বলেছি তো, বৈষ্ণবসেবা আর নামসঙ্কীর্তন।

'প্রভু কহে—বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥'

'কিন্তু বৈষ্ণব কে?' আবার প্রশ্ন করল সত্যরাজ।

আগের বার সামান্য লক্ষণ বর্ণনা করেছিলেন, এবার প্রভু বিশেষ

লক্ষণ বর্ণনা করলেন। আগের বার বলেছিলেন যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শোনা যায় সেই বৈষ্ণব। এবার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের খোঁজ নাও। যে নিরর্গল কৃষ্ণনাম বলছে সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥'

আবার বর্ষান্তরে তাঁকে যখন এই প্রশ্নই করা হল, তিনি বললেন, এবার বৈষ্ণবপ্রধানের খোঁজ নাও। যাকে দেখামাত্রই মুখে কৃষ্ণনাম এসে পড়ে সেই বৈষ্ণবপ্রধান।

'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥'

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম। যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় সে বৈষ্ণব, যার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হচ্ছে সে বৈষ্ণবতর, আর যাকে দেখলেই অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় সে বৈষ্ণবতম।

শুধু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি থেকে গেল প্রভুর সঙ্গে।

গদাধর পণ্ডিত বিদ্যানিধিকে বললে, 'আমাকে আবার মন্ত্র দিন।'

'আবার কেন?'

'আপনি আমাকে আগে যে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছিলেন তা আমি আরেকজনের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। সেই কারণে চিত্তে ইষ্টদেবতার ভালো স্ফূর্তি হচ্ছে না। কৃপা করে আবার আমাকে মন্ত্র দিন।'

বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতকে আবার মন্ত্র দিল।

ওড়নিষষ্ঠীতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠীতে জগন্নাথকে যে নববস্ত্র দেওয়া হল তা ধোয়া নয়, কোরা, মাড়-দেওয়া। তা দেখে বিদ্যানিধির মন বিগড়ে গেল। মাড়-দেওয়া কাপড় হাতে ধরলেও হাত অপবিত্র হয়, তাই জগন্নাথের সেবকেরা দিল জগন্নাথকে? এ কী অন্যায় কথা।

রাত্রে স্বপ্ন দেখল বিদ্যানিধি। দেখল জগন্নাথ আর বলরাম দু'জনে তাকে প্রচণ্ড চড় মারছে। আমার কী অপরাধ? তোমার অপরাধের অন্ত নেই। আমার মণ্ডবস্ত্রে তুমি দোষদৃষ্টি দিয়েছ। আমার আবার জাত কী! আমার সেবকের আবার জাত কী! কোথায় আমাদের আচার-অনাচার!

যত মার খাচ্ছে ততই যেন আরাম পাচ্ছে বিদ্যানিধি।

প্রভুকে সব ব্যক্ত করতে প্রভু বললেন, 'তোমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যেই এই শাস্তিবিধান।'

কিন্তু আর কত আমাকে নীলাচলে ধরে রাখবে?

আরো এক বৎসর তো চলে গেল।

এবার যাবই বৃন্দাবন। আর বৃন্দাবনে যেতে হলে আমার গৌড়দেশ দিয়েই যেতে হবে। গৌড়দেশে আমার দুই আকর্ষণ—জননী আর জাহ্নবী। দুই করুণাস্রোত। দুই স্নেহাশ্রয়।



৫৩

'এখন বর্ষা', বললে রামানন্দ, 'এখন যাত্রা করলে পথে আপনার অসুবিধে হবে।'

'বিজয়া দশমী আসুক, তখন যাবেন।' বললে সার্বভৌম।

কেউই ছেড়ে দিতে চায় না।

'বেশ, শারদীয় উৎসবের নবমী রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করি।' রাজি হলেন গৌররায়।

ভক্ত-ইচ্ছা বিনা নড়েন কী করে? ভক্তের সম্মতির জন্যে ভগবানকে অনুনয় করতে হচ্ছে। ভগবানের ভক্তপরাধীনতার লীলাই তো গৌরলীলা।

বিজয়া দশমীতে যাত্রা করলেন। সঙ্গে মার জন্যে জগন্নাথের প্রসাদ নিলেন, নিলেন শুকনো প্রসাদী চন্দন আর পট্টডোরী। ওড়িয়া ভক্ত যারা তাঁর সঙ্গ নিয়েছে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠালেন। আর নিজ অন্তরঙ্গদের নিয়ে এলেন কটক পর্যন্ত। বিরহব্যাকুল রামানন্দ এল পালকিতে চড়ে। তার হাঁটবার শক্তি কোথায়?

কটকে এসে নগরের বাইরে এক বকুল গাছের তলায় আসন পাতলেন প্রভু। রাজভবনে রামানন্দ খবর দিতে ছুটল।

রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যাকুল হয়ে এসে প্রণাম করল প্রভুকে। প্রভু তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নাম ধরলেন 'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা'। কিন্তু কিছুতেই গাছতলা ছাড়তে রাজি হলেন না। বললেন, 'আমার দুই আশ্রয়, জননী আর জাহ্নবীকে দেখতে চলেছি গৌড়ে।'

রাজ্যের যে-যে স্থান দিয়ে প্রভু যাবেন সে-সে স্থানের শাসকদের কাছে রাজা পত্র পাঠালেন: 'প্রভুর জন্যে নতুন আবাস তৈরি করবে আর সে সব আবাস প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পূর্ণ করে রাখবে। তোমরা নিজেরা সব তদারক করবে আর রাত্রিদিন প্রভুর সেবায় তৎপর থাকবে। আর তোমরা দুই মহাপাত্র, হরিচন্দন আর মর্দরাজ, নতুন নৌকো মজুত রাখো, স্নানান্তে ঐ নৌকোতে প্রভু নদী পার হবেন। আর যেখানে প্রভু স্নান করবেন সেখানে স্তম্ভ পুঁতে রেখো, সে মহাতীর্থে আমি নিত্যস্নান করব।'

'নিত্যস্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।' যেন প্রাণত্যাগ-কালে আমাকে সেই ঘাটতীর্থে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানে শেষ নিশ্বাস রাখতে পারলেই আমি কৃতকৃতার্থ।

কিন্তু অন্তকালে গৌরচিন্তা কি মনে জাগবে? ব্রহ্মা তাই স্তব করেছিল: হে নাথ, মানুষের হৃৎপদ্ম ভক্তিযোগে শোধিত হলে তোমার নামশ্রবণ দ্বারা তারা তোমার পথ দেখতে পায়, তা হলেই তুমি

তাদের বিশুদ্ধ হৃদয়-সরোজে অধিষ্ঠিত হও। তোমার কৃপার কথা কী বলব! তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ছাড়াও ইচ্ছামত মন দ্বারা তোমার যে-যে মূর্তি কল্পনা করে ধ্যান করে, তুমি তাদের প্রতি দয়পরবশ হয়ে স্বয়ং সেই-সেই রূপই ধারণ করো। প্রতাপরুদ্র প্রার্থনা করছে, আমার আর কোনো ইচ্ছা নেই, আমি যেন মৃত্যুকালে গৌরসুন্দরকেই দেখি।

প্রভুর পথ রাজার আদেশে সুসজ্জিত করা হল। দুপাশে লোক দাঁড়িয়ে গেল সার বেঁধে। রাজ-পরিবারের মেয়েরা হাতির উপর তাঁবু খাটিয়ে বসল। চিত্রোৎপল নদীতে স্নান করলেন প্রভু। প্রভুকে দেখে প্রণামের ঢেউ পড়ে গেল। শুধু প্রণামময় নয় প্রেমময় হয়ে উঠল সকলে।

'প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ কহে, নেত্র অশ্রু বরিষয়॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ-প্রেমা হয় যার দূর দরশনে॥'

নৌকোতে নদী পার হয়ে জ্যোৎস্নারাত্রে চতুর্দ্বার এলেন।

রামানন্দ আর দুই মহাপাত্র সঙ্গে চলল। আর চলল মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর হরিদাস—আরো অনেকে।

কিন্তু গদাধরের কী হল? গদাধর তো গৌর ছাড়া এক তিলও থাকতে পারবে না। নিত্যানন্দ সঙ্গ-ছাড়া হয়েছে, সে পারবে না দূরস্থ থাকতে।

গদাধরও সঙ্গী হতে চাইল।

প্রভু বললেন, 'তুমি তোমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়বে কী করে? তুমি নীলাচলে ফিরে যাও।'

গদাধরের সঙ্কল্প ছিল যাবজ্জীবন শ্রীক্ষেত্রেই বাস করবে। তাই তার অন্যত্র গমন নিষিদ্ধ। সে কথাই মনে করিয়ে দিলেন প্রভু।

গদাধর বললে, 'যেখানে তুমি সেখানেই নীলাচল। তোমার

কাছে থাকলেই আমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস। অন্য ক্ষেত্রসন্ন্যাসে আমার দরকার নেই। গৌরশূন্য শ্রীক্ষেত্রে আমি থাকি না।'

'না, তা কেন? তুমি গোপীনাথের সেবা করো।'

'তোমার চরণ দর্শনেই আমার কোটি বিগ্রহ সেবার ফল।' গদাধর পা বাড়াল।

সমুদ্রতীরে যমেশ্বর টোটায় গদাধরের বাসস্থান। প্রত্যহ সেখানে যান গৌরহরি, গদাধরের মুখে ভাগবত শোনেন।

একদিন কী হল, বালির উপর বসে বলছেন আর শুনছেন কৃষ্ণকথা, দক্ষিণকরে বালির মধ্যে গর্ত করছেন খেলাচ্ছলে। হঠাৎ মোহনচূড়ার অগ্রভাগটুকু দেখা গেল। খোঁড়ো, খোঁড়ো গদাধর। প্রভু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কে যেন লুকিয়ে আছেন। প্রকটিত হবেন তোমার কাছে।

দুজনে ব্যাকুল হয়ে বালি খুঁড়তে লাগলেন। আবির্ভূত হলেন গোপীনাথ।

সন্দেহ কী, গৌরহরিই শ্যামবর্ণ বংশীবদন গোপীনাথ হয়ে দেখা দিলেন। বললেন, গদাধর, এই গোপীনাথের সেবা করো।

গদাধরের দুই প্রতিজ্ঞা। ক্ষেত্রসন্ন্যাস, অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্র কোনোদিন ছাড়ব না; আর, গোপীনাথসেবা, ছাড়ব না এই প্রেমের পারিপাট্য।

যমেশ্বর টোটায়ই গোপীনাথের বিগ্রহ। তারই নিত্যসেবক গদাধর। আর বিগ্রহের নাম টোটা গোপীনাথ।

গদাধর ভেবেছিল এই ভাবেই বুঝি গৌরের সঙ্গে তার নিত্যস্থিতি হবে। নিত্য সান্নিধ্য। প্রভু নীলাচলে চিরকাল বিরাজ-বিহার করবেন আর সে চিরকাল থাকবে প্রভুর ছায়া হয়ে। হায়, তার চাতুরালি টিঁকল না। নীলাচল গৌরশূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষেত্রসন্ন্যাসী গদাধর বাঁচবে কী করে? না, সেও প্রভুর সঙ্গী থাকবে। প্রভু তার ক্ষেত্র, আর সেই ক্ষেত্রেই তার সন্ন্যাস।

প্রভু বললেন, 'আমার জন্যে গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করে গেলে

আমারই অপরাধ হবে। বরং আমার সন্তোষই যখন তুমি চাও, আমি বলছি, তুমি এখানে, শ্রীক্ষেত্রে থেকেই গোপীনাথের সেবা করো।'

গদাধরও নাছোড়বান্দা। বললে, 'বেশ, তোমার সঙ্গে যাব না, আমি একা-একা যাব। তা হলে কোনো অপরাধ লাগবে না তোমাকে। যত অপরাধ সমস্ত আমার।' 'তোমার সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর।'

'কিন্তু যাচ্ছ তো আমার জন্যে।'

'কে বললে? আমি যাচ্ছি আমার শচীমাতাকে দেখতে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সব দায় আমার, আমার একলার।'

একা-একা চলতে লাগল গদাধর। দল-ছাড়া, সেবা-ছাড়া, দর্শন-ছাড়া।

'পণ্ডিতের কৃষ্ণপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়॥'

কিন্তু না, কিছুই সে ছাড়েনি। যেখানে প্রভু সেখানেই শ্রীভূমি আর তাঁর চরণদর্শনেই কোটি গোপীনাথ সেবাফল।

কটকে পৌঁছে প্রভু শুনলেন গদাধরও চলে এসেছে ভিন্ন পথে। বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

গদাধর কাছে এলে প্রভু বললেন, 'তুমি যখন কটক পর্যন্ত এসেছ, তোমার দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে। এক উদ্দেশ্য ক্ষেত্রত্যাগ আরেক উদ্দেশ্য সেবাত্যাগ। তুমি নীলাচলও ছেড়েছ, গোপীনাথেরও সেবা করছ না। তোমার দুই ধর্মই গেছে।'

'সব যাক, তুমি থাকো।' বললে গদাধর।

যদিও গদাধরের আচরণে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ তবু বাইরে প্রণয়রোষ প্রকাশ করছেন, লোকশিক্ষার জন্যে কঠিন হচ্ছেন। প্রভুর জন্যে ভক্ত ধর্মকর্ম ছাড়বে এ প্রভুর অসহ্য। তাই প্রভু বললেন, 'তার মানেই তুমি শুধু নিজের সুখ চাও, আমার সুখ চাও না। তোমার যে দুই ধর্মই গেল তাতে আমার দুঃখের পরিমাপ কে করবে?

যদি আমার সুখ চাও, তা হলে ফিরে যাও নীলাচল।' বলে আর বাক্যব্যয় না করে নৌকোতে উঠে বসলেন: 'আমার দিব্যি যদি আর কিছু বলো—'

গদাধর নদীতটে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

নৌকো থেকে প্রভু সার্বভৌমকে বললেন, 'ওকে নিয়ে যাও স্বক্ষেত্রে—শ্রীক্ষেত্রে।'

সার্বভৌম বললে, 'ওঠো। এই প্রভুর লীলা। ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখতে কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে অস্ত্র ধরবেন না। আর ভীষ্মও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অস্ত্র ধরাব কৃষ্ণকে। ভীষ্মের শরজালে অর্জুন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, অর্জুনের আর পরিত্রাণের পথ রইল না। তখন কৃষ্ণ রথচক্র নিয়ে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হলেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্যে ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন।

আমার কাছে গদাধরের বিচ্ছেদ ক্লেশ অসহ্য হোক, তবু গদাধরের প্রতিজ্ঞা আমি রাখব।

তনুত্যাগ করবার আগে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম স্তব সুরু করলেন: 'বিবিধ ধর্মাদিরূপ উপায় দ্বারা চিত্তসংযমরূপা যে নিষ্কামা মতি সাধন করেছি তা এই ভক্তবৎসল ভগবানে অর্পণ করলাম। ইনি গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সখা, এঁর তমালনীল কলেবর ত্রিভুবন বিমোহিত করছে। পরিধানে পীতবাস, মুখকমল চূর্ণকুন্তলে পর্যাকুল। বালার্কসদৃশ কী অনির্বচনীয় শোভা! আমার আর কোনো কামনা নেই, কেবল এই প্রার্থনা করি, ভক্তবৎসল ভগবানের প্রতিই আমার অচলা মতি হোক। দেখ, রণক্ষেত্রে কৃষ্ণের নিবিড় কেশকলাপ তুরঙ্গক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিজালে ধূসরিত, কমল আনন ঘর্মকণায় অভিষিক্ত, আবার শাণিত-শরজাল এঁর গাত্র বিদ্ধ করে দেহস্থ বর্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে কী সমুজ্জ্বল শোভাই না সৃষ্টি করেছে। এখন এই বাসনা, এঁতেই আমার মন আসক্ত থাক। সখা অর্জুনের প্রতি এঁর কী অসাধারণ

পক্ষপাত। যুদ্ধস্থলে বলেছিলেন, সখে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করো, আমি ক্ষণকাল যোদ্ধাদের অবলোকন করি। ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে বীরদের নিরীক্ষণ করে তিনি সকলের বলহরণ করেছিলেন। এঁর চরণেই আমার মন সংলগ্ন হোক। বিপক্ষপক্ষীয় সেনার অগ্রভাগে আমাদের দেখে অর্জুন স্বজনবধভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করলে ইনি আত্মবিদ্যা দ্বারা তার কুমতি অর্থাৎ 'আমি হন্তা' এই অসার বুদ্ধি নষ্ট করেছিলেন, এঁতেই আমার রতি হোক। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে ইনি এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমি পাণ্ডবদের সাহায্যমাত্র করব, স্বয়ং অস্ত্রধারণ করব না। কিন্তু আমার বাসনা ছিল এঁকে অস্ত্রধারণ করাব। সুতরাং ভক্তবৎসল ভগবান কার কথা রাখবেন, তাঁর নিজের কথা, না, ভক্তের কথা? যাতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তিনি রথ থেকে সলম্ফে নেমে চক্রহস্তে আমার দিকে ধাবিত হলেন। উত্তরীয় অঙ্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ভূমিতলে লুন্ঠিত হতে লাগল, পদভরে কাঁপতে লাগল মেদিনী। শত শরে আমি হরির শরীর ক্ষতবিক্ষত করলাম, অবিরল রুধিরধারায় তাঁর নীলতনু অভিষিক্ত হল।

অর্জুন বার-বার তাঁকে নিবারণ করতে চাইল কিন্তু মুকুন্দমুরারি কিছুতে নিবৃত্ত হলেন না। দ্বিরদের প্রতি কেশরীর মত আমাকে বধ করবার জন্যে প্রধাবিত হলেন। এই ভগবানই আমার গতি হোন। অহো, আমার কী ভাগ্য, এই সেই ভূতভাবন জগন্ময় বিষ্ণু, প্রকাশ্যরূপ ধারণ করে মৃত্যুকালে আমার নেত্রপথে বিরাজ করছেন, অন্তিমকালে এঁতে আমার অভ্রান্ত রতি হোক। এই জগদাত্মা বাসুদেবের জন্ম নেই। ইনি জ্ঞানীদের সৃষ্টি করে প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং অধিষ্ঠানভেদে সূর্য যেমন এক হয়েও নানা-প্রকারে প্রকাশমান তেমনি ইনিও এক হয়ে ব্যক্ত-অব্যক্ত নানারূপে প্রতিভাত। আমি তখন এঁকে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হলাম। এঁর আশ্রয়ে আমার মোহ ও ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হল।'

যাজপুরে এসে প্রভু মর্দরাজ আর হরিচন্দনকে বিদায় দিলেন। রেমুণায় পৌঁছে রামানন্দকে বললেন, 'তুমি এবার ফিরে যাও।'

রামানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ল। প্রভু তাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে বসলেন।

ক্রমে ক্রমে উড়িষ্যার সীমান্তে এসে উপনীত হলেন প্রভু। নদীর পরপারেই যবনরাজার অধিকার। অধিকার পিছলদা গ্রাম পর্যন্ত।

এ প্রান্তের রাজকর্মচারীরা বললে, 'যবনরাজ যেমন মগুপ তেমনি অত্যাচারী। তার ভয়ে নদী কেউ পার হতে চায় না, পার হওয়া মানেই তার খপ্পরে গিয়ে পড়া। তবে আপনি কয়েক দিন এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা অপর প্রান্তের সঙ্গে কথা বলে দেখি কিছু সুবন্দোবস্ত করতে পারি কি না।'

যবনরাজের এক হিন্দু চর গোপনে সব খোঁজ-খবর নিল। তারপর তার মুসলমান প্রভুকে গেল বিবরণ দিতে।

'এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখে এলাম। তার সঙ্গে আরো অনেক সাধুলোক। তারা নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন করছে, নাচছে গাইছে কাঁদছে। লক্ষ লক্ষ লোক দেখতে আসছে সন্ন্যাসীকে। দেখে আর চাইছে না ফিরে যেতে। প্রেমোন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণনামে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে শুনলে বিশ্বাস হত না কিন্তু স্বচক্ষে দেখে মনে হচ্ছে এ বুঝি স্বয়ং ঈশ্বর।' বলে সেই চর নিজের থেকেই 'হরিকৃষ্ণ' বলতে লাগল। সুরু করল হাসতে, কাঁদতে, নৃত্য করতে।

নবাবের মন অন্য-রকম হতে চাইল। বিশ্বস্ত এক কর্মচারীকে বললে, 'তুমি গিয়ে দেখে এস।'

সে কর্মচারীরও একই দশা। তার মুখেও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধিকে বললে, 'আমার রাজা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। না, যুদ্ধ-ভয় নেই, সন্ধি করবার জন্যেই তিনি উৎসুক। যদি অনুমতি করেন তিনি নিজে এসে পার করে নিয়ে যাবেন প্রভুকে।'

উড়িষ্যার প্রতিনিধিরা তো হতবাক। তুর্মদের এই মতি পরিবর্তনের হেতু কী ?

বললে, 'তাঁর ভাগ্য, তিনি নিজে এসে দর্শন করবেন প্রভুকে। যদি নিরস্ত্র হয়ে আসেন, পাঁচ সাত জনের মত ভৃত্য শুধু সঙ্গে আনেন, তবেই বিশ্বাস করা যাবে।'

'তাই হবে।'

হিন্দুবেশ পরে নবাব চলে এল এপার। দূর থেকে প্রভুকে দেখে সেই নবাব আভুমি প্রণাম করল।

প্রভু তাকে প্রভূত সম্মান করে বসালেন। করজোড়ে নবাব বললে, 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। আমি কেন হিন্দুকুলে জন্মালাম না ? হিন্দু হলে তোমার চরণ-সন্নিধান পেতাম।'

মর্দরাজ বিস্ময় মানল। কিন্তু বিস্ময়ের কী আছে ? যাঁর নাম শুনলে চণ্ডাল পর্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়, তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করে নবাবের যে এই দশা হবে তাই তো স্বাভাবিক।

'চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনামশ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥
ইহার যে এই গতি, কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয়॥'

দেবহূতি বলছে কপিলদেবকে, 'আমি তোমাকে কী করে জঠরে ধারণ করেছিলাম ? হে নাথ, তোমার শিশুত্ব আশ্চর্য মায়া। তুমি আপন পদাঙ্গুষ্ঠ পান করতে-করতে একাকী বটপত্রে শুয়েছিলে। দুষ্টদের দমন ও শিষ্টদের জ্ঞান ও বিভূতি দেখাবার জন্যেই ধরেছ এই মূর্তি। যে কুক্কুরমাংসভোজী সেও যদি তোমার নাম শ্রবণ-কীর্তন করে বা তোমাকে আহ্বান বা স্মরণ করে বা নমস্কার করে, তবে সে তক্ষুনি শুচি হয়ে সোমযাগের যোগ্য হয়। সুতরাং তোমার দর্শনেই যে লোক পবিত্র হবে এ আর বক্তব্য কী।'

'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ ভজে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥'

নবাব বললে, 'আমি প্রভুকে নদী পার করে দেবার ব্যবস্থা করছি। দশ নৌকো সৈন্য দিচ্ছি সঙ্গে, কোনো জলদস্যুই পারবে না এগুতে।'

দুষ্ট নদী মন্ত্রেশ্বর পার হয়ে গেলেন প্রভু। নবাব তাঁকে এগিয়ে দিল পিছলদা পর্যন্ত।

নৌকোযোগে একেবারে পানিহাটিতে এসে পৌঁছলেন প্রভু। নৌকোর মাঝিকে বস্ত্র দিলেন একখানা।

রাঘব পণ্ডিত এসে প্রভুকে তার ঘরে নিয়ে গেল। পথে সে কী জনতা! এ কে এল আবার বাঙলা দেশে।

রাঘবের ঘরের রান্না কী পরিপাটি! যা রাঁধে তাই অনির্বাচ্য সুস্বাদু। প্রভু বললেন, 'রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী।' 'প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক। এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।'

দয়াল নিতাই আচণ্ডালে ভগবদভক্তি আর হরিনাম বিতরণ করে সমগ্র বাঙলা দেশ মাতিয়ে দিয়েছে। রাঘবের ঘরে কত বার এসে উঠেছে। একবার তো অকালে জাম্বীর বৃক্ষে কদম্বফুল ফোটাল।

'তুমি নিত্যানন্দকে সেবা করো, তোমার মত ভাগ্যবান কে।' বললেন প্রভু, 'তোমাকে বলি এক গোপন কথা। নিত্যানন্দ ছাড়া আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। যেই আমি সেই নিত্যানন্দ।' 'আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।' 'মহাযোগেন্দ্রেরো যাহা পাইতে দুর্লভ। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইব সুলভ ॥'

মকরধ্বজ কর এল। 'তুমি তো রাঘবেরই শিষ্য। তুমি শুধু রাঘবেরই সেবা করো। রাঘবের প্রতি তোমার যে প্রীতি জানবে তা আমারই প্রতি প্রীতি।'

নিত্যানন্দসঙ্গী গদাধর দাস এল। এল পুরন্দর পণ্ডিত। পরমেশ্বর

দাস। রঘুনাথ বৈদ্য। প্রভু বললেন, 'গঙ্গা স্নান করলে যেমন সন্তোষ হয় সেই সন্তোষ রাঘবের আলয়ে।' 'পাসরিঁলু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া।'

এর পরে প্রভু গেলেন কুমারহট্টে, শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে। ঘরে বসে যে কৃষ্ণধ্যান করছে শ্রীবাস, আচম্বিতে সেই ধ্যানফল সামনে প্রকাশিত হল।

প্রভু বললেন, 'তুমি তো অর্থাগমের কোনোই চেষ্টা কর না। বাড়ি থেকেও যাও না কোথাও। কী করে চলবে তবে?'

'কোথাও যেতে আমার মন ওঠে না।' শ্রীবাস বললে হাসি মুখে।

'কিন্তু কত বড় তোমার পরিবার। কী করে চালাবে?'

'চালাবার যিনি চালাবেন। যার যেমন অদৃষ্ট তেমনি তার ফলভোগ।'

'তা হলে তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও।'

'অসম্ভব। ও আমার আসবে না।' হাসল শ্রীবাস।

'বা, সে কী কথা? সন্ন্যাসও নেবে না, কারু ঘরে ভিক্ষেও করবে না,' রুষ্ট হবার ভাব করলেন প্রভু, 'তা হলে তোমার পরিবারের ভরণ-পোষণ হবে কী করে? উদ্যমহীনের মত বসে থাকলে চলে কার? যদি ধরো, কিছুই তোমার না জোটে, তা হলে তুমি কী করবে? কী করতে পারো তুমি?'

শ্রীবাস হাসতে-হাসতে তিন বার হাততালি দিল। বললে, 'এক-দুই-তিন।'

'তার মানে?'

'তার মানে এক, দুই, তিন,—তিন দিন উপোস করব। তৃতীয় দিনেও যদি অন্ন না জোটে গলায় ঘট বেঁধে গঙ্গায় গিয়ে ডুবব। অন্ন না থাক, জলের তো অভাব হবে না।'

প্রভু হঠাৎ হুঙ্কার করে উঠলেন: 'যারা সর্বতোভাবে আমারই

চিন্তা করে, যারা সর্ব প্রকারে আমাতেই আসক্ত, তাদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি। দুয়ারে আমিই নিয়ে আসি সর্বসিদ্ধি।'

'যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলে তারে॥
সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥'

'শোনো, বলি।' বললেন আবার প্রভু, 'কদাচিৎ যদি লক্ষ্মীও ভিক্ষে করেন তো করবেন, তুমি করবে না। তোমার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে।' 'যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপি দারিদ্র্য নাহিক তোর ঘরে॥'

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তরহীন। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।

দুর্বাসাকে বললেন ভগবান, 'আমি ভক্তাধীন, ভক্তরাই আমার হৃদয় অধিকার করে রয়েছে। আমিই যাদের পরাগতি সেই ভক্তদের ছেড়ে আমি আর কোনো শ্রী স্পৃহা করি না। যারা সমস্ত পরিত্যাগ করে আমাতে শরণাপন্ন হন আমি তাদের কী করে পরিত্যাগ করতে পারি? যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎ পতিকে বশীভূত করে তেমনি সাধু ভক্তরা হৃদয়বন্ধন করে আমাকে শৃঙ্খলিত রাখে। আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় তাদের লভ্য হলেও তারা তা চায় না, তারা সেবাতেই পরিতৃপ্ত থাকে। কোনো নশ্বর অভিলাষেই তারা উন্মুখ নয়। সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও তাদের হৃদয়। তারা আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না, আমারও তাদের ছাড়া অন্য চিন্তা নেই।'

শ্রীবাসের ছোট ভাই রামাইকে ডাকলেন প্রভু। বললেন, 'বড় ভাইকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা করবে। এ সেবা কোনোদিন ছাড়বে না।

আরেক কথা বলে যাই,' তাকালেন শ্রীবাসের দিকে : 'তোমার আর অদ্বৈতের দেহে জরা প্রবেশ করবে না।'

সেখান থেকে গেলেন শিবানন্দ সেনের বাড়িতে। সেখানে এক রাত্রি বাস করে গেলেন বাসুদেব দত্তের গৃহে। এ বাসুদেবই তো জীবলোকের সমস্ত পাপভার নিজে নিতে চেয়েছিল। আমার নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ হয় তো হোক, আর সকলে মুক্তি পাক।

চৈতন্যমত্ত বাসুদেবকে আলিঙ্গন করে প্রভু কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি বাসুদেবের। আমার এ শরীর বাসুদেবের। বাসুদেব আমাকে যেখানে বেচে আমি সেইখানে বিকোই। বাসুদেবের বাতাস যার গায়ে লেগেছে তাকে কৃষ্ণ সর্বদা রক্ষা করেন।'

সেখান থেকে গেলেন সার্বভৌমের ভাই বিদ্যাবাচস্পতি মশায়ের বাড়িতে। বললেন, 'আমাকে গঙ্গাস্নান করাও। আর তুমিও এই জল-ব্রহ্মের সেবা কোরো।'

তাই হবে। কিন্তু এই জনঘট্ট সামলাই কী করে? সমস্ত অরণ্য যে লোকপদপাতে পথ হয়ে গেল। লক্ষ কণ্ঠে উঠল হরিধ্বনি।

প্রভুকে বাচস্পতি প্রচ্ছন্ন করে রাখল।

'তোমার ঘরে ভগবান শ্রীচৈতন্য এসেছেন, কেন তাঁকে গোপন করে রাখছ? তুমি মহা ভাগ্যবান, তাতে সন্দেহ কী, আর আমরা ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ, কিন্তু আমাদের উদ্ধার করবেন বলেই তো তিনি তারক-কারক, আমরা পতিত বলেই তো তিনি পতিতপাবন।'

কতক্ষণ বন্ধ করে রাখবে বাচস্পতি। করুণার সাগর গৌরসুন্দর নিজেই প্রকাশিত হলেন। হরিধ্বনি শুনে কে থাকতে পারে নিশ্চল হয়ে।

'হরি!' বলে সিংহনাদ করে উঠলেন প্রভু। আজানুলম্বিত দুই বাহু তুলে দিলেন ঊর্ধ্বে।

'আমাদের, পাপিষ্ঠদের ত্রাণ করুন।'

প্রভু বললেন, 'তোমাদের কৃষ্ণে মতি হোক।'

'বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥'

কিন্তু এ কী ব্যাপার? কেউ যে ঘরে ফিরে যেতে চায় না। এই মুখ ছেড়ে আর কী দেখব! এই পদদ্বয় ছাড়া কোথায় আর আশ্রয় আছে!

প্রভু নিজেই লুকিয়ে চলে গেলেন কুলিয়া। বাচস্পতিকেও জানালেন না।

বাচস্পতি ঘরে এসে দেখল, প্রভু নেই। ছলনা করে চলে গিয়েছেন গোপনে। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কাঁদতে বসল।

কিন্তু জনতা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। বলাবলি করতে লাগল, 'প্রভুকে ভিতরে লুকিয়ে রেখে বাচস্পতি বাইরে বিচ্ছেদের অভিনয় করছে। শুধু নিজেই আনন্দ লুটবে। আমাদের ছিটেফোঁটাও দেবে না। আমরা যদি উদ্ধার পাই, তা হলে যেন ওঁর বিষম আপত্তি। প্রভু কি ওঁর একলার সম্পত্তি? এই মধুরের হিমালয় কি ওঁর একার প্রাপ্য, একার ভোগ্য?'

একে তো প্রভুর বিরহে ক্লেশ, তার উপরে এই দুর্বাক্য? এই দুর্যশ-বাণী?

এমন সময় একজন এসে খবর দিল প্রভু কুলিয়ায়, মাধব দাসের বাড়িতে।

জনস্রোত ছুটল সেদিকে। গঙ্গার উপরে হাজার-হাজার নৌকো ভাসল। কে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করে, হাজার হাজার লোক ভেসে পড়ল জলে। সবাই পার হল, যে ডুবল সেও চৈতন্যকৃপায় পায়ে মাটি পেল। উত্তীর্ণ হতে পারল না বা দুর্ঘটনা ঘটল এমন কিছুই হল না। সব সুগম-সহজ হয়ে গেল।

'যে প্রভুর নামগুণ সকৃত যে গায়।
সে সংসার-অব্ধি তরে বৎসপদ প্রায়॥'

বাচস্পতিও এল কুলিয়ায়। প্রভুকে নিভৃতে পেয়ে বললে, 'তুমি তো আপন ইচ্ছায় থাকো, চলোও আপন ইচ্ছায়। এদিকে তো আমি মারা যাই। লোকে ভাবছে আমিই তোমাকে ঘরে লুকিয়ে রেখেছি, আমার মত স্বার্থপর আর কেউ নেই। তুমি একবার দয়া করে বাইরে এসে দাঁড়াও। লোকে তোমাকে দেখুক, বিশ্বাস করুক।'

বাচস্পতির ইচ্ছা পূর্ণ করলেন প্রভু। বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সকলে সমবেত কণ্ঠে হরিধ্বনি করে উঠল। দণ্ডবৎ পড়তে লাগল চারদিকে। পরানন্দ কৃষ্ণনামের কীর্তন উঠল, বেজে উঠল মৃদঙ্গ-মন্দিরা-করতাল। সঙ্কীর্তন-আনন্দ-বিহ্বল গৌরসুন্দরও নৃত্য সুরু করলেন। আর নিত্যানন্দ?

'বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ রায়।
কখনো ধরিয়া তারে আপনে নাচায়॥
আপনি কখনো নৃত্য করে তার সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেমরঙ্গে॥'

কুলিয়ার পাপী-তাপী উদ্ধার হয়ে গেল। কুলিয়াতেই চাপাল-গোপাল, দেবানন্দ পণ্ডিত ত্রাণ পেয়েছে। কুলিয়ার আরেক নাম 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট'।

নকুল ব্রহ্মচারীর নৃসিংহদেবে প্রীতি, তাই প্রভু তার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। প্রভু বৃন্দাবনে যাবেন শুনে সে মনে মনে পথ নির্মাণ করছে। রত্নবাঁধা পথ, তাতে নির্বৃন্ত ফুলের শয্যা, পথের দুদিকে কুসুমিত বকুলের শ্রেণী, মাঝে মাঝে দিব্য জলাশয়। তাতে রত্নবাঁধা ঘাট, প্রফুল্ল পদ্ম, সুধাসম জল আর অগণন পক্ষিকাকলি। সর্বত্র সুখস্পর্শ সমীরণ।

এভাবে কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত পথ প্রস্তুত করল। আর মন চলে না, পথ বাঁধা অগ্রসর হয় না। তবে কি প্রভুর এবার বৃন্দাবন যাওয়া হবে না? কানাইয়ের নাটশালা থেকেই ফিরে আসবেন?

মাধব দাসের অঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সুখ-সিন্ধুতে ভাসতে লাগল সকলে। যারা আগে নাস্তিক ছিল তারাও প্রেমরসে বিগলিত হল। সকলের চিত্তবৃত্তি সুখময় হয়ে উঠল।

এক ব্রাহ্মণ এসে বললে, 'প্রভু, আগে-আগে ভক্তিবাদকে বহু নিন্দা করেছি। ব্যঙ্গ করে বলেছি, কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কিসের কীর্তন। এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। তুমি তো সংসার-উদ্ধার-সিংহ, তুমি বলে দাও কেমন করে আমার এ পাপের খণ্ডন হবে!'

প্রভু বললেন, 'যে মুখে বিষ খাই সে মুখেই যদি আবার অমৃত খাই, তা হলে বিষও জীর্ণ হয়ে যায়। যে মুখে আগে নিন্দা করেছ সেই মুখে এখন অভিনন্দন করো, কৃষ্ণ-যশে সমস্ত নিন্দা-বিষ নষ্ট হয়ে যাবে। যে মুখে বৈষ্ণবনিন্দন করেছ সে মুখে এবার বৈষ্ণব-বন্দন করো। নিন্দনই নন্দন হয়ে যাবে।'

'শুন বিপ্র! বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যদি অমৃত গ্রহণ॥
বিষো হয় জীর্ণ, দেহ হয় তো অমর।
অমৃতপ্রভাবে; এবে শুনহ উত্তর॥
না জানিঞা যত তুমি করিলে নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলে ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥
যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণব নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণববন্দন॥
সভা হৈতে ভক্তির মহিমা বাড়াইয়া।
গীত কবিত্ব বিপ্র! কর তুমি গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥'

ভক্তিতেই সর্বপাপের বিমোচন।

কুলিয়ার অপর পারেই নবদ্বীপ। নবদ্বীপ থেকেও জনসংঘট্টের অন্ত নেই।

গঙ্গাস্নানে এসেছেন শচীমাতা। সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া। পারাপারের জন্যে এত লোকের সমাগম কেন? কেন এত কোলাহল? এই হুলুস্থূল?

'মাধব দাসের বাড়িতে কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, দেখতে চলেছি।' বললে কেউ-কেউ।

ভিড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বড় বড় বাঁশ কেটে গড় তৈরি করেছিল মাধব। সে বাঁশগড় একদিনেই চূর্ণ হয়ে গেছে। কারু সাধ্যি নেই সেই লোকঘটা নিবারণ করে।



৫৪

কুলিয়াতে দেবানন্দ পণ্ডিতকে কৃপা করলেন প্রভু।

হৃদয়ে ভক্তি নেই, তবু ভাগবত পড়াত দেবানন্দ। একদিন এমনি পড়াচ্ছে, শ্রীবাস দৈবাৎ উপস্থিত হল। পাঠ শোনামাত্র প্রেমবিকার দেখা দিতেই মূর্ছা গেল শ্রীবাস। প্রেমবিকারের মর্ম না বুঝে সশিষ্য দেবানন্দ শ্রীবাসকে সরিয়ে রাখল একপাশে। এই থেকেই দেবানন্দের অপরাধ।

কিন্তু দেবানন্দের একটা সুকৃতি ছিল, সে বক্রেশ্বরকে শ্রদ্ধা করত। বক্রেশ্বর প্রভুর প্রিয় ভক্ত, কীর্তনসঙ্গী। দেবানন্দ যখন তার সঙ্গ করছে তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ভাগবতী বুদ্ধি।

ঠিক তাই। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ভক্তিহীন দেবানন্দ প্রভুর চরণে এসে পড়ল। জানাল তার দৈন্য-কাতরতা। প্রভু তাকে কৃপা করলেন, প্রকাশ করলেন ভাগবতের স্বরূপ-তত্ত্ব। প্রতিষ্ঠিত করলেন

কৃষ্ণপ্রেম। 'কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।' আর ভক্তসেবা হতেই কৃষ্ণপ্রেম।

'দেবানন্দ, তোমার সব অপরাধ ভঞ্জন হল।'

'কিন্তু প্রভু, এতে আমার সম্পূর্ণ সুখ হল না। আপনি বর দিন, যে কেউ অপরাধী হয়ে এই কুলিয়ায় এসে আপনার কাছে অপরাধভঞ্জনের প্রার্থনা করবে তারই সর্ব অপরাধ মোচন হয়ে যাবে।'

প্রভু বললেন, 'তথাস্তু।'

কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়ার খবর কী?

'শচীমাতার সেবা করেন বিবিধ প্রকার।
সহস্রেক জনে নারে ঐছে করিবার॥
প্রত্যহ প্রত্যূষে গিয়া শচীমাতা সহ।
গঙ্গাস্নান করি আইসেন নিজ গৃহ॥
দিনান্তেই আর কভু না যান বাহিরে।
চন্দ্র সূর্যে তান মুখ দেখিতে না পারে॥
প্রসাদ লাগিয়া যত ভক্তবৃন্দ যায়।
শ্রীচরণ বিনা মুখ দেখিতে না পায়॥
তান কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনিতে না পারে।
মুখপদ্ম ম্লান সদা চক্ষে জল ঝরে॥
শচীমাতার পাত্রশেষ মাত্র সে ভুঞ্জিয়া।
দেহরক্ষা করেন ঐছে সেবার লাগিয়া॥
শচীসেবা কার্য সারি পাইলে অবসর।
বিরলে বসিয়া নাম করেন নিরন্তর॥
হরিনামামৃতে তাঁর মহারুচি হয়।
সাধ্বী-শিখা-মণি শুদ্ধ প্রেমপূর্ণ কায়॥
তব শ্রীচরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা হয়।
তাহান কৃপাতে পাইনু তাঁর পরিচয়॥

তব রূপ-সাম্য চিত্রপট নির্মাইলা।
প্রেমভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
সেই মূর্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদপদ্মে করি আত্ম-সমর্পণ॥
তান সদ্‌গুণ শ্রীঅনন্ত কহিতে না পারে।
এক মুখে মুঞি কত কহিমু তোমারে॥'

শাশুড়ির সঙ্গে ঘাটে এসেছে স্নানের উপলক্ষ্যে। এপার-ওপার এত ভিড় কেন, কেন এত হুলুস্থুল? কে এক সন্ন্যাসী এসেছে—লোকমুখের কথা কানে আসছে দুজনের। কত তার কাহিনী, কত কীর্তন, কত নৃত্যগীত। শচীমাতার মন উচাটন হয়ে উঠল। একবার তার নাম জানতে পাই না? শাশুড়ির শাড়ির আঁচল মুঠো করে চেপে ধরল বিষ্ণুপ্রিয়া। একবার দেখতে পাই না স্বচক্ষে?

গঙ্গার পরিসর এখন কম, ঠাহর করলে এপার থেকে ওপার বুঝি দেখা যায়। আর যে সন্ন্যাসী এসেছে তাকে যে লক্ষ লোকের মধ্যেও দেখা যায় আলাদা করে। সে যে সকলের চেয়ে দীর্ঘাঙ্গ, লক্ষ লোকের মাথার উপরে তার মাথা। জীবের দর্শন যাতে সুলভ হয় তারই জন্যেই তো তিনি এত দীর্ঘাবয়ব হয়েছেন। চোখ তুলে তাকালেই আসবেন নজরে।

শচীমাতা বুঝলেন কে এ সন্ন্যাসী। কিন্তু কী করে যাবেন ওপার? যাবার অনুমতি কই? এত কাছে থেকেও এত দূর? আনন্দে-বেদনায় ভেঙে পড়লেন শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে এল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরে কে?

খবর পাঠালেন প্রভু, জননী ও জন্মভূমিকে দেখতে আসছেন তিনি নবদ্বীপ। আর কাউকে নয়? বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ ছলছল করে উঠল। কী করে দেখবে তাকে? সে যে যুবতী স্ত্রী! যুবতী স্ত্রীর মুখ দেখে না সন্ন্যাসী।

মা'র সঙ্গে কার কথা। মাকে দেখবে বলে কি স্ত্রীকে দেখা চলে?

রাত্রে ঘুম এল না বিষ্ণুপ্রিয়ার। কে জানে তাকে তাঁর মনেই বা আছে কিনা। সেদিনের সেই ঔজ্জ্বল্য তো তার কিছুই নেই। আজ সে ম্লান, শ্রীহীন। দীন দরিদ্র বেশবাস, অঙ্গ আভরণশূন্য। আজ সে আনন্দপূর্ণিমা নয়, আজ সে বিষাদপ্রতিমা। কী করে চিনবেন। না চিনলে অপরাধের হবে না।

চার দিকে রব পড়ে গেল, নবদ্বীপে পৌঁচেছেন প্রভু। রাত্রে আছেন শুক্লাম্বরের বাড়িতে। সকাল হলেই আসবেন মা'র কাছে।

সকাল হলেই গঙ্গাস্নান সেরে মিশ্রভবনের দরজায় এসে দাঁড়ালেন প্রভু। কিন্তু যে দেখল সেই হতবাক হয়ে রইল। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শি কারুরই কোনো বাক্যস্ফূর্তি নেই। কারুরই আর কোনো অভিযোগ নেই, অভিমান নেই। স্বয়ং শচীমাতা স্তব্ধ। প্রসাদপরিপূর্ণ।

এই সেই গৃহ। এই সেই বৃক্ষলতা, ঐ সব পরিচিত জিনিসপত্র। কিন্তু প্রভুর মনে এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই কৌতূহল নেই। তাঁর প্রশান্ত-চিত্ততায় রেখা নেই এতটুকু। এসেছি, কাজ হয়ে গিয়েছে, এবার ফিরে যাই।

ফিরে যাবেন? কিন্তু কোন সাহসে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সন্নিহিত হবে? শত শত লোক যে ভিড় করে আছে। অন্তরালে দাঁড়িয়ে প্রভুকে যে একটু দেখবে চোখ ভরে তারও সুবিধে নেই। তবে কি বিনা দর্শনেই চলে যেতে দেব? কোনো কথা বলব না? ভিক্ষে করে নেব না কিছু চেয়ে?

কিসের লোকাপেক্ষা? সর্বাঙ্গ বস্ত্রে ঢেকে বিষ্ণুপ্রিয়া ছুটে এসে গৌরহরির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

'এ কে?' পিছনে দু'পা হটে গেলেন প্রভু।

এ কে তা কে বলবে? উপস্থিত সমস্ত লোক নীরবে কাঁদতে লাগল।

'ত্রিজগৎ উদ্ধার পেল, আমিই শুধু ভবকূলে পড়ে থাকব?' নতমুখে জিগগেস করল বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রভু সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও। তোমার নামকে সার্থক করো।'

'তাই করব। কিন্তু আমাকে কিছু দিয়ে যাও।'

'কী দেব? কী আমার দেবার আছে?' প্রভু তাকালেন চার দিকে। পরে স্নেহস্বরে বললেন, 'না, আছে। পায়ের দুখানি খড়ম আছে। এই খড়ম দুখানি নাও, তোমার কাছে রাখো। তোমার বিরহক্লেশের শান্তি হোক। আর বৈরাগ্যে থাকো। থাকো আমার কীর্তনানন্দিনী হয়ে।'

চকিতের মত অন্তর্হিত হয়ে গেলেন প্রভু।

'নিত্য সঙ্কীর্তন করে বিহার নদীয়াপুরে
ভোজন-শয়ন-সুখ ছাড়ি।
বৈষ্ণবী মালিনী সীতা নারায়ণী ধাত্রীমাতা
গদাধর জগদানন্দে বেড়ি॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া হরিনাম মন্ত্র দিয়া
সবারে কহিল একে একে।
শুন রে নদীয়া-লোক ছাড়িয়া সংসারশোক
কীর্তন করহ প্রেমসুখে॥
কীর্তন সকল কর্ম কীর্তন সকল ধর্ম
কীর্তন সকল ব্রহ্মজ্ঞান।
কীর্তন আগম বেদ রাজসূয় অশ্বমেধ
কীর্তনশ্রবণ গঙ্গাস্নান॥
কীর্তন সকল তীর্থ কীর্তন আবেশনৃত্য
শিব-শুক-নারদ গোচর।
কীর্তন বৈকুণ্ঠ পদ কীর্তন সমুদ্র নদ
কীর্তন সভার পরাপর॥

কীর্তন শ্রবণ মাত্রে অধর্ম না রহে গাত্রে
কীর্তন-দর্শন পাপক্ষয়।
কীর্তন রসের ভক্তি কীর্তন নর্তক মূর্তি
কীর্তন মার্জনে সব জয়॥
কীর্তন গায়ন সর্ব সে সব হয় গন্ধর্ব
নৃত্যক ইন্দ্রপদ পান।
কীর্তন ভারত পুরাণ তপ জপ ধ্যান দান
কেহ নহে কীর্তন সমান॥'

নবদ্বীপ থেকে চললেন শান্তিপুর। অদ্বৈতের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। বললেন, 'এখানে কদিন বিশ্রাম করব। মাকে পালকি পাঠাও। মা'র হাত থেকে ভিক্ষে নেব এ কদিন। আবার কদিন মা'র সেই নিমাই হয়ে থাকব।'

নবদ্বীপে পালকি পাঠানো হল। চলে এলেন শচী-মা। নিমাই খাবে, আবার আগের মত বসলেন রান্না নিয়ে। কিন্তু এ রান্নায় যা তৈরি হবে তা বুঝি অন্নের চেয়েও বেশি, তা অন্তরের নৈবেদ্য। এ ঈশ্বরকে কোনো আরাধিকার নিবেদন।

আচার্যগৃহে দশদিন থাকলেন প্রভু।

বললেন, 'মা, এইবার বিদায় দাও। উত্তর-পশ্চিমের তীর্থস্থান দেখে আসি, কাশী, প্রয়াগ ব্রজমণ্ডল।'

এবার বুঝি শোকে অভিভূত হবার চেষ্টা নেই শচী-মা'র। প্রভুকে আশীর্বাদ করে শিবিকায় গিয়ে উঠলেন। ফিরে যাই নবদ্বীপ। দেখি গিয়ে নামপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া কী ভাবে তণ্ডুলে হরিনামের সংখ্যাপূর্ণ করছে।

'তিঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥

আপনার দুঃখসুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি ॥'

জীবমঙ্গল আর গৌরাঙ্গসুখ—তাতেই শচীমাতার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি। গৌরাঙ্গবল্লভা বিষ্ণুপ্রিয়ারও সেই ভাব। আত্মসুখ-তাৎপর্য একেবারে নেই, কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্যে সেও প্রভুর সন্ন্যাসাচরণে সুসম্মত। নীলাচলের গম্ভীরামন্দিরে প্রভু যা করছেন নদীয়ায় গম্ভীরামন্দিরে বিষ্ণুপ্রিয়াও তাই করছে—সেই কৃষ্ণ-লীলা-রস-কথার আস্বাদন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বোধহয় বেশি আনন্দ—তার শুধু কৃষ্ণ-গুণগান নয়, তার গৌরকৃষ্ণগুণগান।

'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।' যেখানে নামগান সেখানেই ভগবান। গৌরপ্রেমপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি নদীয়া-নাটুয়া গৌরসুন্দরের আদেশই তো এই নাম-সঙ্কীর্তন।

'শুন সতি বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণবজননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্ত মনে গুণি ॥
কলিকাল সর্পে দংশিবে সর্বজীবে।
সঙ্কীর্তন বিনা কিছু না করল সবে ॥
তুমি না থাকিলে হবে সঙ্কীর্তন বাদ।
নবদ্বীপ লৈয়া হবে বড়ই প্রমাদ ॥'

নামে শুধু নবদ্বীপ রক্ষা নয়, সমস্ত জীবজগৎ রক্ষা।

তাই নামই একমাত্র সাধন। 'কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।' 'নাম সঙ্কীর্তন কর—উপদেশ কৈল।'

অপরাধীর চিত্তেও কৃষ্ণনাম ফলোৎপাদন করতে কুণ্ঠিত নয়।

নামাপরাধ ভজনের বিশেষ বিঘ্ন। নামাপরাধ দশ প্রকার। সাধুনিন্দা, গুরুনিন্দা, বেদনিন্দা, নামে অর্থবাদ কল্পনা করা, নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, নামকে ব্রত দান হোম ইত্যাদির সমান মনে করা, নারায়ণ ও শিবের নামমাহাত্ম্যকে পৃথক মনে করা, শ্রবণবিমুখ শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ করা, নামমাহাত্ম্য শুনেও নামকে প্রাধান্য

না দেওয়া আর নাম শুনতে বা নাম করতে উপেক্ষা দেখানো ও উদ্যমহীন থাকা।

যারা অপরাধী তাদের চিত্তে প্রেমের উদয় হয় না। শুধু নিরপরাধে নাম নিলেই প্রেম জাগে, চিত্ত দ্রব হয়, চোখে অশ্রু আসে। কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে। অপরাধীকে প্রেমাঙ্কুরও দেয় না। কিন্তু চৈতন্যে-নিত্যানন্দে ও সব বিচার নেই। নির্বিচারে প্রেম দেন। নামগুণেই সমস্ত অপরাধ খণ্ডে যায়।

'চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥'

নামের আশ্রয় নিলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, অপরাধ দূরীকৃত হয় আর তার পরে, মেঘমোচনে চন্দ্রোদয়ের মত, সম্ভব হয় প্রেমোদয়।

'অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব অঙ্গ, অশ্রুগঙ্গা বয়॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥'

নাম করতে করতে ভক্তি আর ভক্তি থেকেই প্রেম। আর প্রেম জাগলে কোথায় বা হৃদরোগকাম, কোথায় বা দুর্বাসনা। একমাত্র নামেই আনন্দবুদ্ধি। শুধু চন্দ্রোদয় নয় পূর্ণিমা-উল্লাস।



৫৫

সকলের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভু আবার পরিব্রজ্যা আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল জনতা, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, যেন নদীই

বেগে-বলে বাড়তে বাড়তে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কে এত বড় দলের খাওয়া জোটাবে? আর কে? ভগবান জোটাবেন। যে গ্রামে যখন মধ্যাহ্ন পড়বে সেই গ্রামের লোকেরাই তখন ভগবৎ-প্রেরিত হবে। নিয়ে আসবে খাদ্যভার।

সেদিন ভিক্ষান্তে হঠাৎ মুখশুদ্ধির জন্যে হাত বাড়ালেন প্রভু।

গোবিন্দ ঘোষ কাছে ছিল, সে ছুটল গ্রামের দিকে। কোত্থেকে একটা হরীতকী জোগাড় করে আনল। তার থেকে এক খণ্ড দিল প্রভুকে।

পরদিন দল অগ্রদ্বীপে এসে পৌঁচেছে। ভিক্ষান্তে প্রভু আবার মুখশুদ্ধির জন্যে গোবিন্দের কাছে হাত বাড়িয়েছেন।

গোবিন্দ তখুনি দ্বিতীয় খণ্ড হরীতকী দিল।

প্রভু বিস্ময় মানলেন: 'কাল হরীতকী জোগাড় করতে কত দেরি করেছিলে আর আজ চাওয়া মাত্রই পেয়ে গেলাম?'

'কাল যে হরীতকীটি পেয়েছিলাম তার থেকে কিছুটা আপনাকে দিয়ে বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম।' সরলমুখে বললে গোবিন্দ, 'সেই বাকিটার থেকেই আজ দিলাম এখুনি।'

'তুমি তা হলে সঞ্চয় করেছিলে?' প্রভুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

মুখ শুকিয়ে গেল গোবিন্দের।

'তোমার সঞ্চয়ের স্পৃহা যায়নি এখনো। ঈশ্বরে আসেনি তোমার সমগ্র নির্ভর। সুতরাং', প্রভু কঠিন হলেন: 'আমার সঙ্গ ছাড়ো। তোমার পথ ত্যাগের নয়, সঞ্চয়ের, সংসারের। গোবিন্দ, তুমি গৃহস্থ হও।'

গোবিন্দ কাঁদতে লাগল। কিন্তু প্রভু তাকে সঙ্গে নিলেন না। রেখে গেলেন অগ্রদ্বীপে। প্রভু বললেন, 'তুমি কেঁদো না, তোমাকে দিয়ে অসাধ্যসাধন করাব। দেখাব ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা।'

গঙ্গায় নেমে নাম করছে, কী একটা কালো-মতন জিনিস ভাসতে

ভাসতে এসে গোবিন্দের গায়ে ঠেকল। শ্মশানের পোড়া কাঠ বোধ হয়। স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ফের নামধ্যানে তন্ময় হল গোবিন্দ।

তার হৃদয়ে গৌরহরি উদয় হলেন। বললেন, 'ওটা পোড়া কাঠ নয়। ওটাকে ধরো, ঘরে নিয়ে যাও।'

ধরে ঘরে নিয়ে গেল। সত্যিই তো, কাঠ নয়, কালো একখানি পাথর।

সদলে এলেন একদিন প্রভু। জিগগেস করলেন, 'কি, পেয়েছ যা পাঠিয়েছিলাম?'

'পেয়েছি।'

'ঐ পাথর দিয়ে বিগ্রহ স্থাপন করব।

ভাস্কর এল। নির্মিত হল শ্রীমূর্তি। গোবিন্দের কুটিরে প্রভু নিজ হাতে তাকে স্থাপন করলেন। নাম দিলেন গোপীনাথ। 'অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।'

'গোবিন্দ, তুমি সংসারে থাকো আর গোপীনাথের সেবা করো।' চলে গেলেন প্রভু।

গোবিন্দ বিয়ে করল। একটি ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল। একা গোপীনাথের সেবা করছিল, এবার আবার শিশুর সেবার ভার পড়ল। দুজনকে সমানে সেবা করতে অসুবিধে হতে লাগল। কখনো গোপীনাথকে দুঃখ দিয়ে ছেলের সেবা করে, কখনো ছেলেকে দুঃখ দিয়ে গোপীনাথের সেবা। কে গোপীনাথ কে ছেলে বুঝে উঠতে পারে না।

পাঁচ বছরের হয়েছে, ছেলেটি মারা গেল।

শোকে পাগল হয়ে গেল গোবিন্দ। দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, এই তার প্রতিফল! এ জীবন রাখব না। বিগ্রহের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে রইল। ঠাকুরের সেবা নেই, স্নানাহার নেই, কিছু নেই। থাক উপোস করে। দেখি কে ওকে খেতে দেয়!

'গোবিন্দ, বাবা, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা জল দেবে না?' বিগ্রহ কথা কয়ে উঠল।

অনড় হয়ে পড়ে রইল গোবিন্দ।

'তোমার কি দয়ামায়া নেই?' বললে আবার গোপীনাথ, 'একটা নিরীহ ছেলেকে তুমি না খাইয়ে রাখবে?'

'ছেলে? আমার ছেলে কোথায়?' উঠে বসল গোবিন্দ।

'দৈবে একটা ছেলে মরে গেলে আরেকটা ছেলেকে নিজের হাতে মেরে ফেলতে হয়?'

'তুমি আমার ছেলে? তুমি আমার ছেলে হয়ে আমাকে পুত্রশোক দিলে? বুক খালি করে নিয়ে গেলে ছিনিয়ে?'

'শোনো, তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বলি।' বললে গোপীনাথ, 'যে বাপের দুই ছেলে সেখানে আমি থাকতে পারি না পুত্র হয়ে। এক ছেলে ছিলাম বেশ ছিলাম। তোমার যখন আরেক ছেলে হল, ভাবলাম ছেড়ে চলে যাই—'

'না, না, যেও না তুমি—'

'আমি যদি যেতাম তবে তুমি তোমার দুই ছেলেই হারাতে। আমাকেও পেতে না আর তোমার ছেলেও মারা যেত। এখন সে ছেলে গেছে, আমি আছি; তার মানে, তোমার সে-ছেলেও আছে।' বললে গোপীনাথ।

'সে আছে? সে থাকলে আমার কত কাজ করত। তুমি করবে?' গোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠল।

'বলো কী কাজ?'

'তুমি আমার শ্রাদ্ধ করবে?'

'যখন বলছ নিশ্চয়ই করব। তুমি আমার বাবা, তোমার আদেশ আমি অমান্য করব না।' গোপীনাথ আশ্বাস দিল।

গোবিন্দ দেহত্যাগ করলে বিগ্রহের পদ্মচক্ষু দিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল। পিতার মৃত্যুতে ছেলে শোকার্ত হবে না? ছেলে কি পাষাণ?

নতুন সেবায়েতকে স্বপ্ন দেখাল গোপীনাথ।

'গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি একমাস অশৌচ পালন করব আর হবিষ্যান্ন খাব। আমাকে স্নান করিয়ে কাচা পরিয়ে দাও। আমি আমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, আমি তার শ্রাদ্ধ করব, পিণ্ড দেব নিজ হাতে। সব বন্দোবস্ত কোরো।'

স্বপ্নকথা সকলকে বললে সেবায়েত।

গোবিন্দের শ্রাদ্ধবাসরে সে কী ভীড়! গোপীনাথকে কাচা পরিয়ে আনা হল সভায়। আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল চার দিকে। নিজ হাতে গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিল।

একেই বলে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো।

নিজের ছেলে বেঁচে থাকলে সে আর ক বছর শ্রাদ্ধ করত? গোপীনাথের মতন যে ছেলে সে আবহমানকাল রাখতে পারে প্রতিশ্রুতি।

সদলবলে প্রভু চললেন গৌড়ের দিকে। গৌড়ের কাছে 'রামকেলি' গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের কানে কলরব এসে পৌঁছুল। এত লোকজন কেন, কেন এত কোলাহল? দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দিল নাকি?

না, না, ভয় কিসের? একজন সন্ন্যাসী আর তার শিষ্য-অনুচর।

শিষ্য-অনুচর? কিন্তু অগণন কেন? তাদের স্বার্থ কী পর্যটনে? কিসের লোভে তারা পিছু নিয়েছে? 'বিনা দানে এত লোক যার কাছে হয়। সেই ত গোসাঞি—ইহা জানিহ নিশ্চয়॥' তবেই বোঝ এ সন্ন্যাসী কত বড় নেতা। নিঃস্বার্থে আকর্ষণ করেছে সবাইকে।

হুসেনশার মনে স্বস্তি নেই। সে হিন্দুমন্ত্রী কেশব ছত্রীকে খোঁজ নিতে পাঠাল।

কেশবও আগের মত সায় করল। এক ভিখিরি সন্ন্যাসী তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছে। তাকে দেখতে দু'চার জন অলস কৌতূহলী

একত্র হয়েছে মাত্র। তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তাকে হিংসা করারও মানে হয় না।

'না খায় না লয় কারো না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্তনবিলাস॥
কে বোলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরি গরিব—বৃক্ষের তলবাসী॥'

কিন্তু কেশবেরও অস্বস্তি হতে লাগল। কে জানে বহু লোকজন দেখে হুসেনশা যদি হঠকারিতা করে প্রভুকে আক্রমণ করে বসে। সুতরাং নবাবকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। গোপনে নবাবকে খবর দিল, পালাও।

এত সহজে তটস্থ হবার পাত্র নয় হুসেনশা। আরো দুই হিন্দু-মন্ত্রীকে পাঠাল আসল কথাটা কী জেনে আসতে।

দবির খাস আর সাকর মল্লিক। দাক্ষিণাত্যের রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ, দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলায় চলে এসেছে। বিদ্যাবুদ্ধি-বলে পেয়েছে মন্ত্রীপদ।

কর্নাট দেশের রাজা, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ—সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু। তার পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেবের তিন ছেলে—অমর, সন্তোষ, বল্লভ। অমর গৌড়ের সুলতান হুসেনশার প্রধান মন্ত্রী। উর্দুতে প্রধানমন্ত্রীই দবির খাস। হুসেনশার কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ ওরফে সাকর মল্লিক। আর বল্লভও নবাবের রাজস্ববিভাগে কাজ করে। বল্লভের পুত্রই জীব গোস্বামী।

'কে এ সন্ন্যাসী?'

দবির খাস বললে, 'যিনি আপনাকে রাজ্য দিয়েছেন, যাঁর মঙ্গলেচ্ছায় আপনার সমস্ত কার্যসিদ্ধি হচ্ছে, সর্বত্র জয় দেখছেন, সেই ঈশ্বরই এই সন্ন্যাসী।'

'কী বলছ তুমি?' হুসেনশা আবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আপনার সৌভাগ্যে তিনি আপনার রাজ্যে প্রমূর্ত হয়েছেন।'

'সত্যি ?'

'আমাকে জিগগেস করছেন কেন ? নিজের অন্তরকে জিগগেস করুন। আপনার যেমন অনুভব তেমনি প্রমাণ।' 'তোমার চিত্তে যেই লয় সেই তো প্রমাণ।'

আশ্চর্য, ক্রুদ্ধ হতে পারল না হুসেনশা। বরং বিনত হল। নম্রস্বরে বললে, 'আমারও প্রাণ তাই বলছে। কেন বলছে কে বলবে।' চিন্তাকুল মুখে নবাব অন্তঃপুরে চলে গেল।

কী মতলব নবাবের কে জানে। হয়তো মৌখিক সৌজন্য দেখাচ্ছে, অন্তরে ক্রূরতার ছোরা। দরকার কী। সন্ন্যাসীকে সতর্ক করে দিয়ে আসি। দর্শন যেখানে সহজ তখন সুযোগ ছাড়ে কে ?

দবির আর সাকর বেশ বদলালো। অর্ধরাত্রে চলল প্রভুর সকাশে।

এত রাতেও কেউ ঘুমোয়নি দেখছি। প্রেমের হিল্লোলে নামানন্দের কলরোল করছে।

'কে তোমরা ?' জিগগেস করল হরিদাস।

'আমরা দবির খাস আর সাকর মল্লিক।'

'তোমরাই আমাদের রূপ আর সনাতন গোস্বামী।' এক ডাকে চিনতে পারল নিত্যানন্দ।

'একটিবার কি প্রভুর দর্শন পাই ?'

দন্তে তৃণ ধরল রূপ-সনাতন। গলবস্ত্র হল। কৃষ্ণপ্রেমরসমগ্ন প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল। প্রভু মঙ্গলনেত্রে তাকালেন। বললেন, 'ওঠ, দৈন্য সংবরণ করো।'

'আমরা নীচসঙ্গী, নীচ কাজ করছি।' বিগলিত কণ্ঠে বলতে লাগল দুই ভাই : 'আমাদের দোষ মার্জনা করো এই প্রার্থনা করতেও আমরা লজ্জিত হচ্ছি।'

'নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥'
'মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥'

আমার সমান পাপী, আমার সমান অপরাধী, কেউ নেই। কী আর বলব, হে পুরুষোত্তম, আমাকে ক্ষমা করো এমন প্রার্থনা করতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।

'না, না, সে কী কথা।' প্রভু সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

'আমাদের মত পতিতাধম জগতে আর কেউ নেই। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার তো সহজ ছিল। তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, বাড়ি নবদ্বীপে, তারা নীচসেবা করেনি, করেনি নীচের দাসত্ব। তাদের একমাত্র দোষ পাপাচার। কিন্তু তোমার নিন্দা করতে তোমার নাম করে তারা ফলবান হয়েছে। শুধু নামে কী, নামাভাসেও পাপ চলে যায়।' 'পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার।'

'তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥'

'কিন্তু আমরা? আমাদের সঙ্গম সাহচর্য গো-ব্রাহ্মণদ্রোহীদের সঙ্গে। আমাদের ত্রাণের আর কোনো উপায় নেই। একমাত্র তুমি আছ। আমাদের উদ্ধার করে তোমার বল দেখাও।'

'আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন নাম—তবে সে সফল ॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল ॥'

'যদি দয়ার যোগ্য পাত্র বলে কেউ থাকে তবে সে আমরাই। কবে তোমার নিত্যকিঙ্কর হব? তোমার সেবাবাঞ্ছা ছাড়া আর সব বাসনা কবে বিলুপ্ত হবে?'

প্রভু বললেন, 'তোমাদের দৈন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অদ্বৈতের পাঁচ বছরের দিগম্বর শিশু, অচ্যুতানন্দ, তখন খেলা ভুলে ছুটে এল। ক্রুদ্ধ মুখে হাসতে হাসতে বললে, 'বাবা, তুমি এ কী বললে? চৈতন্যের গুরু আছে? এও বুঝি এক পরম দুস্তর চৈতন্যমায়া, নইলে চৈতন্যের গুরু আছে এ তুমি বলো কী করে? যিনি আত্মক্রীড়, যাঁর থেকে সমস্ত জ্ঞানের প্রচার, তাঁর গুরু আছে এ কী অসম্ভব কথা! তুমি এ অসম্ভব শিখলে কোথায়?'

ছেলের মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল অদ্বৈত। পর মুহূর্তেই ব্যাকুল দুই হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'বাপ, তুই আমার জনক আর আমিই তোর পুত্র। চৈতন্যতত্ত্ব জানাবার জন্যে তুই আমার পুত্ররূপে উদয় হয়েছিস। আমাকে তুই ক্ষমা কর— অমন কথা আর ভুলেও মুখে আনব না।'

আত্মস্তুতি শুনে অচ্যুত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল নম্রমুখে।

সন্ন্যাসী তখুনি দণ্ডবৎ হয়ে পড়ল। বলল, 'এ শিশু তো দেখছি ঈশ্বরশক্তিতে কথা বলছে। শুভলগ্নে আমি অদ্বৈতগৃহে এসেছিলাম, দেখে গেলাম অদ্ভুত মহিমা। তাই আমি আজ পরিপূর্ণ হয়ে চলে যাচ্ছি।' সন্ন্যাসী হরিধ্বনি করে উঠল।

পুত্র কোলে করে আনন্দে কাঁদতে লাগল অদ্বৈত। পুত্রের অঙ্গের ধুলো মাখতে লাগল নিজ দেহে। পরে হঠাৎ নাচতে সুরু করল: 'চৈতন্যের পার্ষদ আমার ঘরে জন্মেছে। আমার ঘর তীর্থ হয়ে গেল।'

এমন সময়ই সর্ব-সুমঙ্গল গৌরসুন্দর আবির্ভূত হলেন।

হুঙ্কার করে উঠল অদ্বৈত। এই তো এসেছেন প্রাণনাথ। সর্বগুরুর গুরু এই তো আমার ইষ্টদেব।

অচ্যুতানন্দ প্রভুকে প্রণাম করল। প্রভু তাকে কোলে তুলে নিলেন। প্রভুও চান না, অচ্যুতও চায় না, তাদের এই সঙ্গস্পর্শে বিচ্ছেদ হয়।

'অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুতো প্রবিষ্ট হৈল চৈতন্য দেহেতে॥'

অচ্যুত যে 'নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান॥' যেমন বাবা তেমনি ছেলে। 'যেন পিতা তেন পুত্র উচিত মিলন।'

যাও, মাকে খবর দাও। দোলায় করে নিয়ে এস শান্তিপুর।

প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবে আছেন শচীমাতা। বিরহ দুঃসহ কিন্তু কৃষ্ণবিরহ আনন্দময়। যা কৃষ্ণসম্পর্কিত তাই মধুর। তার মথুরাগমনও মধুর। আমার কৃষ্ণও যে মথুরায় গিয়েছে।

যেমন যশোদার অবস্থা তেমনি শচীমার। কখনো কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে ডাকছেন, কখনো দড়ি দিয়ে বাঁধতে চাইছেন ননীচোরাকে, কখনো বলছেন, চল্ যাই, যমুনায় স্নান করিয়ে আনি। কখনো হাঁক দিচ্ছেন, এই কৃষ্ণ, শিগগির দুধ দুয়ে দে, বাজারে যাবার বেলা হল।

কে একজন বিদেশী অতিথি এসেছে বাড়িতে।

বিদেশী যখন তখন নিশ্চয়ই মথুরার খবর রাখে। তাকে শচীমাতা জিগগেস করছেন আকুল হয়ে, 'বলো মথুরা কেমন দেখে এলে? আমার রাম আর কৃষ্ণ কেমন আছে? পাপী কংস কেমন চালাচ্ছে তার ব্যবসা? শুনলাম সে নাকি মরেছে। তবে কি উগ্রসেনই রাজা হল? আচ্ছা, চোর অক্রূরের খবর কী? কেমন চুরি করে নিয়ে গেল আমার রাম-কৃষ্ণকে। অক্রূরকে জিগগেস করলেই জানতে পাবে আমার রাম-কৃষ্ণ কোথায়?

এমন সময় লোক এল দোলা নিয়ে। তোমার নিমাই শান্তিপুরে গিয়েছে। তার বৃন্দাবন যাওয়া হয়নি। চলো তাকে দেখবে চলো। রান্না করে খাওয়াবে চলো।

কিন্তু এ কে এসে দাঁড়াল দরজায়?

এ সপ্তগ্রামের রঘুনাথ গোস্বামী। সন্ন্যাসের পর প্রভু যখন প্রথম শান্তিপুরে আসেন তখনই রঘুনাথের ইচ্ছে হয় সেও সন্ন্যাসী হয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যায়। প্রভুই তাকে নিবৃত্ত করেন। বলেন, 'ঘরে বসেই ভগবদ্‌ভজন করো।'

ঘরে বসেই ভগবদ্‌ভজন করছিল রঘুনাথ কিন্তু সর্বক্ষণ মন রয়েছে নীলাচলে। কবে কত দিনে মিলতে পারবে প্রভুর সঙ্গে। কয়েকবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রতিবারেই ধরা পড়ে। বংশের একমাত্র সন্তান, তার বাবা জ্যেঠা কেউই তাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়। ধনজন-স্ত্রী কিছুই তাকে বৈরাগ্যবিরত করতে পারল না। আবার সে বেড়ি কাটল। আবার সে ধরা পড়ল। এবার তাকে ঘরে বন্দী করে রাখা হল, খাড়া করা হল দিনরাতের পাহারা।

'প্রভু শান্তিপুরে এসেছেন, আমাকে একবারটি দেখা করতে দাও।' বাপ-জ্যেঠার কাছে মিনতি করল রঘুনাথ : 'প্রভু যা বলবেন তাই করব।'

প্রথম বার দেখা করেছে, এবার দ্বিতীয় বারও দেখা করতে এল।

প্রভু বললেন, 'তোমার সংসারবিরক্তি দেখে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি বলছি লোক-দেখানো মর্কটবৈরাগ্য না দেখিয়ে তুমি অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করো। স্থির হয়ে নিষ্ঠা করো অন্তরে, বাহ্যিক ব্যবহারে প্রলুব্ধ হয়ো না। সময় এলে আমিই তোমাকে ডেকে নেব।'

'নেবেন?'

'আমি যখন উত্তর-পশ্চিমের তীর্থদর্শন সাঙ্গ করে ফের নীলাচলে ফিরব তখন তুমি চলে এস আমার কাছে।'

'সে কবে?'

'অস্থির হয়ো না। ধৈর্য ধরো। লোকে একেবারে সাধু হয় না। মুগ্ধ না হয়ে বিষয়বস্তু ভোগ করতে পারাও কঠিন।'

'স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অবিচারে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥'

শান্ত হল রঘুনাথ। ঘরে ফিরে গেল। ঘুচে গেল বন্দীদশা। যে শান্ত তার আর প্রহরীর দরকার কী।

দোলায় চড়ে শচীমাতা এসে উপস্থিত হলেন। প্রভু দূরে পড়লেন দণ্ডবৎ হয়ে। স্তব করতে লাগলেন :

'তুমি যদি শুভদৃষ্টি করো জীব প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতিমতি ॥
তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয় তুমি সেই শক্তি ॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি ॥
যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়।
পালহ তুমি সে তোমাতে সে লীন হয় ॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তারাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি ॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিতে তাহা না হয় শোধন ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
তোমার সাদগুণ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥'

শচীমাতা বললেন, 'বাবা নিমাই, তুমি যে আমাকে প্রণাম করো এতে আমার ভয় করে।'

প্রভু বললেন, 'মা, আমি কৃষ্ণভক্তির কাঙাল। আর আমার যদি বিন্দুমাত্র কৃষ্ণভক্তি হয়ে থাকে তা তোমার থেকে।'

সামনেই মাধবেন্দ্র-নির্যাণ-তিথি, সে বিরহ-মহোৎসবে প্রভু উপস্থিত থাকুন। তাই আরো কদিন প্রভু থেকে গেলেন শান্তিপুর।

মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলনকথা ভাবো।

তখনো চৈতন্য অবতীর্ণ হননি, সমস্ত সংসার বিষ্ণুভক্তিশূন্য হয়ে আছে। শুধু মাধবেন্দ্রই ভাসছেন প্রেমসাগরে, পরানন্দরসে, কৃষ্ণসুখে সুখী হয়ে। মেতে আছেন কৃষ্ণযাত্রায়, কৃষ্ণকীর্তনে। দেশের লোক যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত গাইছে, 'ধন বংশ বাড়ুক' এই তাদের একমাত্র কামনা। সন্ন্যাসীরাও শুধু 'নারায়ণে'র বেশি কিছু বলছে না। এমন জায়গা নেই যেখানে কৃষ্ণভক্তি দেখতে পাই। এরা কৃষ্ণের বিগ্রহ পর্যন্ত মানে না, শুধু 'মদ্য মাংস দানবে'র পূজা করে। তার চেয়ে বনে গিয়ে থাকি, বনে অন্তত অবৈষ্ণবের সঙ্গে কথা কইতে হবে না।

ঘুরতে ঘুরতে ঈশ্বর-ইচ্ছায় মাধবেন্দ্র অদ্বৈত-আলয়ে এসে উপস্থিত হল।

অদ্বৈতেরও এক দুঃখ। সমস্ত সংসার বিষ্ণুভক্তিহীন। গীতা-ভাগবতের চেয়েও লোকের মঙ্গলচণ্ডীর গানে বেশি স্ফূর্তি। মহাদম্ভে ষষ্ঠী আর বিষহরির পূজায়ই বেশি আগ্রহ। স্নানের সময়ও একবার গোবিন্দ নাম করে না।

কিন্তু এ কে দাঁড়ালেন দুয়ারে! সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণবলক্ষণ এ কে মহাপুরুষ!

পলকে দুজনে কৃষ্ণকথারসে মত্ত হয়ে গেল। ঘটল দেহবিস্মৃতি! শুধু কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্তন-উল্লাস।

'মাধব পুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্ছা হয় সেই ক্ষণ॥
কৃষ্ণনাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
দণ্ডেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণু ভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইল অদ্বৈত মহাশয়॥'

এত সুখী হল যে অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্যত্ব নিল। 'তার ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।'

সেই মাধবেন্দ্রের আরাধনার দিন আজ। সর্বস্ব নিক্ষেপ করে উৎসবে মাতল অদ্বৈত। শুধু অদ্বৈত কেন, সমস্ত বৈষ্ণবসমাজ।

কেউ বললে, আমি সব চন্দন ঘষব। কেউ বললে, মালা গাঁথব আমি। আমার উপর জল আনবার ভার। আমি সব ধোয়াব-পাখলাব। আমি বৈষ্ণবদের পা ধুয়ে দেব। কেউ ভাণ্ডারী সাজল, কেউ চাঁদোয়া নিশান টাঙাতে লাগল। কেউ বা শুধু মাতল হরিনামে।

প্রভু সব দেখতে লাগলেন। দু-চার ঘর তো চালেই ভরে উঠেছে। পর্বতপ্রমাণ কাঠের স্তূপ। অগুনতি দুধ-দইয়ের ঘড়া। নারকেল বেগুন-পটল, শাকসবজি, পান সুপারিই বা কত! তেল-ঘি নুন-গুড়ও অফুরন্ত।

'এ সম্পত্তি মানুষের নয়।' বললেন প্রভু, 'মনে হয় এ সমস্তই আচার্য মহেশের।'

আচার্য অদ্বৈত মহেশ-অবতার। ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব প্রকাশ করে দিলেন। যে শিবকে না মানবে সে আমাকে পাবে কি করে?

'শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সে বা মোরে পূজে কেনে॥
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইব তাহার॥'

আগে কৃষ্ণকে পূজা করো, পরে মহেশ্বরকে, পরে অন্যান্য দেবদেবীকে।

'অতএব সর্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব দেবে॥'

প্রভু কীর্তনস্থলীতে এলেন। মহানন্দে হরিসঙ্কীর্তন সুরু হল। প্রভুকে মাঝে রেখে মণ্ডলী করে নাচতে লাগল সকলে। মহামল্ল নিত্যানন্দ বাল্যাবেশে নাচতে লাগল। নাচতে লাগলেন বিশ্বম্ভর।

শেষে সকলকে নিয়ে ভোজনে বসলেন। কীর্তনে নটনে ভজনে

ভোজনে প্রভুর সমান রঙ্গ। আই রান্না করেছে, তবে কথা কী! মাধব পুরীর কথা কইছেন আর খাচ্ছেন, তবে আর কথা কী!

'মাধব পুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্বগণ লইয়া॥
প্রভু বোলে, মাধবেন্দ্র আরাধনা তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি॥'

একদিন শান্তিপুরের ওপারে কালনায় এলেন প্রভু, সঙ্গে নিত্যানন্দ। দারুণ গ্রীষ্ম বোধ হচ্ছে, বলে উঠলেন, 'একবার নামকীর্তন করো, শরীর-মন জুড়িয়ে যাক।'

সকলে কীর্তন আরম্ভ করল : 'হরিবোল, জুড়াক হিয়া রে।'

কালনার গৌরীদাস গৌর-নিতাইয়ের পায়ে পড়ল। বললে, 'তোমাদের আর ছেড়ে দেব না, তোমারে এখানে থাকো। নইলে প্রাণে মরব।'

গৌর-নিতাই ঠাকুরঘরে ঢুকলেন।

বেশ হল। এই ভেবে গৌরীদাস বাইরে থেকে দরজায় শেকল টেনে দিল। তা হলে আর পালাতে পারবে না, চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

কতক্ষণ পরে গৌরীদাস এসে দেখল গৌর-নিতাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

এ কী, তোমরা কী করে বাইরে এলে?

দরজা খুলে গৌরীদাস ঠাকুরঘরে ঢুকল। দেখল, যে দুই জীবন্তকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল তারা দুই বিগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌরীদাস ঘরের ভিতর থেকে বললে, 'না, ওরা যাক, তোমরা থাকো।'

তখন বাইরের দুই ঠাকুর ফের ঘরে ঢুকল আর ঘরের দুই বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। চলল ফিরে শান্তিপুর।

হরি অন্তঃকরণে আপনিই সিদ্ধ। তিনিই আত্মা অতএব তিনিই প্রিয়তম। তিনি সত্যস্বরূপ, অন্যান্য অনাত্ম পদার্থের মত মিথ্যা নন। উপাস্যের যত গুণ প্রয়োজন তিনি তৎসমুদায়েই সুসম্পন্ন। তিনি অনন্ত, তাই জীব তাঁর প্রতি চিত্তধারণা দ্বারা নির্বৃত হয়ে তাকেই ভজনা করবে। তাঁকে ভজনা করলে সংসারের হেতুভূতা অবিদ্যারও উপরতি হয়। সংসারবৈতরণীতে পড়ে জীবকুল নিজ-নিজ কর্মজন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করছে। এ দেখে পশুতুল্য কর্মজড় ব্যক্তি ছাড়া কে আর হরিচিন্তা ত্যাগ করে নিন্দনীয় বিষয়চিন্তায় কাল-হরণ করবে? দেহের মধ্যবর্তী হৃদয়দেশে এক প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষ বাস করছেন। কেউ-কেউ ধারণা দ্বারাই তাঁকে চিন্তা করে। তুমিও করো।

তাঁর চারি ভুজে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম শোভা পাচ্ছে। তাঁর বদন সুপ্রসন্ন আর লোচন পদ্মপলাশের মত আয়ত। তাঁর বসন কদম্বকিঞ্জল্কের মত পিঙ্গলবর্ণ। তাঁর বাহু দীপ্তিমান মহারত্নে খচিত, হিরণ্ময় অঙ্গদে সুশোভিত। কিরীটকুণ্ডল মণিপ্রভায় দেদীপ্যমান। তাঁর দুটি পদপল্লব যোগীরা হৃদয়পঙ্কজের কর্ণিকা-আলয়ে রেখে নিরন্তর চিন্তা করে। তাঁর বুক শ্রীচিহ্নাঙ্কিত, স্কন্ধদেশে কৌস্তুভরত্ন, গলদেশে স্থিরশোভা বনমালা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মেখলা অঙ্গুরীয় নূপুর কঙ্কণ ও অন্যান্য আভরণে অলঙ্কৃত। আনন চিক্কণনির্মল আকুঞ্চিত কেশপাশে ও মধুহাস্যে মনোরম। আর কী উদারশোভন তাঁর ভ্রূভঙ্গি! যতক্ষণ মন ধারণাদ্বারা স্থিরভাবে অবস্থিতি করে ততক্ষণ সেই চিন্তামণি ঈশ্বরকেই ভাবনা করো।

যে মানুষ মঙ্গলাভিলাষী সে একমনে সর্বস্থানে ও সর্বসময়ে হরির গুণ শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ করবে। যে সাধুদের আত্মস্বরূপে প্রকাশমান ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটে পান করে, দূষিত হলেও তার অভিপ্রায় পবিত্র হয়ে ওঠে। সেও লাভ করে বিষ্ণুর পাদপদ্ম।



৫৬

শচীমাতার কাছে প্রভু বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি চাইলেন।

'কতবার চেষ্টা করেছি, বৃন্দাবনের নাগাল পেলাম না। মা, তুমি স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও, আমি একবার দেখে আসি।'

মুক্ত মনে অনুমতি দিলেন শচীমাতা।

কিন্তু নিমাইয়ের চোখে জল কেন? অদ্বৈতকে, মুরারিকে, শ্রীবাসকে জিগগেস করলেন শচীমাতা, 'বলতে পারো আমার নিমাই কাঁদল কেন?'

'আমাদের প্রভু যে জননীবৎসল।' সকলে আশ্বস্ত করতে চাইল।

'না, তোমরা বুঝছ না, আমার নিমাই জানিয়ে গেল জন্মের মত এই শেষ দেখা। আর দেখা হবে না কোনোদিন। নইলে বলো, সে কাঁদল কেন?'

বাড়িতে ফিরে গিয়েও শচীমাতার সেই এক কথা! 'নিমাই কাঁদল কেন?'

আর প্রভুর মুখে সেই এক আর্তি। আমার বৃন্দাবন কতদূর? কোথায় সেই নিধুবন? সেই রাসমণ্ডল? কবে আমি বনস্থলীতে গড়াগড়ি দেব? কবে স্নান করব যমুনায়?

মাকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দিলেন প্রভু। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কী দশা?

'বিষ্ণুপ্রিয়া নববালা হাতে লয়ে জপমালা
রুই রুই জপে গৌরনাম।
নবীনা যোগিনী ধনী বিরহিণী কাঙ্গালিনী
প্রণময়ে নীলাচলধাম॥

সর্ব অঙ্গে মাখা ধুলা　　　　লম্বাকেশ এলোচুলা

সোনার অঙ্গ অতি ছুরবল।

বলরাম দাস কয়,　　　　শুন প্রভু দয়াময়,

মুছায়ে দাও দেবা-আঁখিজল॥'

অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সর্বাগ্রে তুলসীসেবা করে ভজন-মন্দিরে ঢোকে। সখীরা তুলসী আর পুষ্পচয়ন করে রেখেছে। সাজিয়ে দিয়েছে পূজোপকরণ। কটরাভরা সুবাসিত চন্দন, নবীন তুলসীপত্র আর মঞ্জরী, মল্লিকা মালতী কুন্দ প্রভৃতি শ্বেতপুষ্প। একখানি সামান্য আসনে বসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। সামনে শ্রীপটমূর্তির পাদপীঠে প্রাণবল্লভের খড়ম। প্রেমানন্দে অনুরাগ ভজন করছে। এ গৌরশূন্য গৌরগৃহই আমার গম্ভীরামন্দির।

'অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসীমঞ্জরী॥
মন্দিরে বসিয়া করেন হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপ তণ্ডুল কিছু রাখেন নিজস্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হইলে একটি তণ্ডুল।
রাখেন সরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখেন পাত্রশেষ।
ভক্ত আইসে সবে পাইয়া আদেশ॥'

এদিকে প্রভু নীলাচলে ফিরে এলেন। গৌড়ীয় ভক্তদের বলে দিলেন, 'আগামী রথযাত্রায় আপনারা কেউ আর পুরী যাবেন না। আমি বৃন্দাবনে যাব।'

নীলাচলে এসেই প্রভু জগন্নাথ দর্শন করলেন। প্রভু ফিরে এসেছেন, চার দিকে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল। ছুটে এল কাশী মিশ্র, রামানন্দ আর সার্বভৌম। ছুটে এল প্রদ্যুম্ন, গদাধর আর বাণীনাথ। এ কী প্রভু? ফিরে এলেন কেন?

'জননী আর জাহ্নবীকে দেখে বৃন্দাবনে যাব এই মনে করে গিয়েছিলাম গৌড়ে,' বললেন প্রভু, 'পথে লক্ষ-লক্ষ লোক জুটল। লোকসঙ্ঘট্টে পথ চলতে পারি না। যেখানে থাকি সে ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়ে ভিড়ের চাপে। সনাতন বললে, যার সঙ্গে এই বিশাল জনসমুদ্র সে তীর্থে যায় কী করে? কথা শোনো, একা-একা যাও। কিংবা বড়জোর একজন সঙ্গে নাও। বেশি লোক দেখলে সকলে ঢঙ বলবে। 'যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটি॥' তাই দলবল রেখে ফিরে এসেছি চুপিচুপি। আর জানো?' বললেন প্রভু, 'রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সঙ্গে দেখা হল। দুইই ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপাপাত্র। রাজমন্ত্রী, রাজপাত্র হলে কী হয়, নিজেদের তৃণ থেকেও ক্ষীণ মনে করে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে ভক্তিতে পরম প্রবীণ, অথচ দৈন্য দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমরা উত্তম হয়েও নিজেদের হীন বলে মানো, আমি তাদের বললাম, তোমাদের কৃষ্ণ উদ্ধার করবেন। দুর্লভ দুর্গম-নির্জন বৃন্দাবন, আমি সেখানে নিঃসঙ্গে যাব। ঢাক বাজিয়ে সৈন্যসমারোহে যাব না। মাধবেন্দ্র পুরীও একা গিয়েছিলেন আর তাঁকে দুগ্ধদানছলে দেখা দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।'

গদাধরকে দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'গদাধরের মনে কষ্ট দিয়েছি তাই এবার বৃন্দাবন ব্যর্থ হল।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই।' গদাধর বললে কুণ্ঠিত হয়ে, 'যেখানে তুমি সেখানেই বৃন্দাবন। সেখানেই গঙ্গা-যমুনা, সেখানেই সমুদয় তীর্থ। শুধু লোকশিক্ষার জন্যেই চলেছ তীর্থে। নইলে তোমার আর কিসের প্রয়োজন?'

'তুমি যাহাঁ যাহাঁ রহ—তাহাঁ বৃন্দাবন।
তাহাঁ যমুনা গঙ্গা সর্বতীর্থগণ ॥
তভু বৃন্দবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে ॥'

গদাধর বললে, 'বর্ষা প্রায় এসে পড়ল। বর্ষার চার মাস নীলাচলে থেকে যাও। তবে আমার কথায় তো কিছু হবার নয়। তুমি স্বেচ্ছাময়, তোমাকে কে নিবারণ করবে?' 'পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন। আপন ইচ্ছায় চল-রহ কে করে বারণ?'

আর সকলেও গদাধরের আবেদন সমর্থন করল।

'বেশ, কাটিয়ে যাব বর্ষা।' স্মিতমুখে বললেন প্রভু। 'তবে প্রতাপরুদ্রকে খবর দাও।'

'আর আমার আলয়ে চলুন, ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।' গদাধর বিনত হয়ে বললে।

'চলো। ভিক্ষাতে তোমার যে স্নেহ তাই তো গোপীনাথের প্রসাদ।' বললেন প্রভু, 'আমাদের আর কাজ কী! আমাদের শুধু আস্বাদন।'

গৌড় নয় ঝাড়খণ্ডের বনপথ দিয়ে যাবেন ঠিক হল। বললেন, 'একাকী যাব। কেউ যদি আমার সঙ্গে যাবার জন্যে অনুসরণ করে, নিরস্ত করবে।'

স্বরূপ দামোদর আর রায় রামানন্দ বাধা দিল। বললে, 'সে কী, একেবারে একা কী করে যাবে?'

'হ্যাঁ, যাব। প্রসন্ন মনে আজ্ঞা দাও। তোমরা প্রসন্ন থাকলেই আমি প্রসন্ন।'

'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, পরতন্ত্র নও।' বললে দামোদর, 'কিন্তু আমরা সুখী হলেই যদি তুমি সুখী তা হলে আমাদের একটিমাত্র কথা শোনো।'

'কী কথা?'

'অন্তত একজন সঙ্গী নাও, একজন আচরণীয় ব্রাহ্মণ।' বললে

রামানন্দ, 'নইলে কে তোমার জন্যে ভিক্ষে সংগ্রহ করবে, রেঁধে দেবে নিজের হাতে? কেই বা বহন করবে জলপাত্র? আমাদের এ অনুরোধটুকু অন্তত রাখো। অন্তত এতটুকু সুখী করো আমাদের।'

'যাই বলো নিজসঙ্গী একজনকেও নেব না। একজনকে নিলে অন্যের মনে কষ্ট হবে। এমন যদি পাও যে নতুন সঙ্গী অথচ সুস্নিগ্ধ ও সরলস্বভাব তা হলে নিতে পারি সহচর করে।'

'তেমনই একজন আছে। বলভদ্র ভট্টাচার্য। যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধু। সর্বতীর্থে অভিমুখী তোমার সেবা করতে পারলে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করবে।'

'তবে চলুক আমার পাশে-পাশে।'

গভীর রাত্রে প্রভু গোপনে পুরী ত্যাগ করলেন।

ভক্তদল যথারীতি ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগল প্রভুকে। স্বরূপ শান্ত ও নিরস্ত করল সবাইকে। প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে দাও। একক অটনই প্রভুর মনোবাঞ্ছা।

প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে প্রভু উপপথে চললেন। রাজপথ ছেড়ে গ্রাম্য-পথে। কটক ডাইনে রেখে ঢুকলেন ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে। শ্বাপদসঙ্কুল লোকালয়হীন দুর্গম অরণ্যে। কী অস্ত্র তাঁর সম্বল? একমাত্র সম্বল কৃষ্ণনাম।

'নির্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণ নাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥'

নামের শক্তিতেই জাগে প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দ জাগলে হিংসা বিদ্বেষ দূরে যায়। গোবিন্দনামে দূরে যায় কুপ্রবৃত্তি। যার মনে হিংসার লেশ নেই তাকে কে হিংসা করবে? নরোত্তম বলছেন, 'শুনিয়া গোবিন্দরব, আপনি পালাবে সব, সিংহরবে যথা করিগণ।' কৃষ্ণনাম সিংহরবের চেয়েও প্রচণ্ড।

তা ছাড়া প্রভু স্বতন্ত্র ভগবান। সপ্ত বিশ্বের একক নিয়ন্তা। হিংস্র জন্তুরও নিয়ন্তা তিনিই। হিংস্রকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন এ আর বেশি কথা কী।

বাঘ শুয়ে আছে, দেখেননি গৌরহরি। প্রেমাবেশে নাম করতে করতে চলেছেন, বাঘের গায়ে পা ঠেকে গেল। বলে উঠলেন, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

. কী হল? চরণ স্পর্শে বাঘের প্রারব্ধ কর্মফল ধ্বংস হল, চলে গেল তার জিহ্বার অসামর্থ্য আর তার জীবাত্মা স্বরূপে অবস্থিত থেকে বলে উঠল, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

'একদিন বনে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥'

মত্ত হস্তিযূথেও জাগল কৃষ্ণস্ফূর্তি। মৃগীরাও কণ্ঠ মেলাল। বাঘের সঙ্গে তারাও চলল প্রভুর আশে-পাশে। যেখানে ক্রোধ-লোভ নেই, হিংসা-দ্বেষ নেই, সেখানে অনন্ত প্রেম। যেখানে অখণ্ড মৈত্রী সেখানে স্বভাববৈরিতাও অসম্ভব। শুধু ব্যাঘ্র মৃগ ময়ূরই নাচছে না, বৃক্ষলতা পর্যন্ত পুলকপুষ্পান্বিত হয়ে উঠেছে।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বোলে, নাচে মত্ত হঞা॥
'হরি বোল' বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥'

ভাগবতে গোপীগীত স্মরণ করো।

'সখি, দেখ দেখ শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলসংসর্গে কেমন শোভা পাচ্ছে। গোবিন্দের বেণুরব শুনে মত্ত ময়ূরের দল নৃত্য করছে। বনের যাবতীয় প্রাণী প্রাণচেষ্টা ত্যাগ করে পর্বতসানুতে এসে দাঁড়িয়েছে। সুখময় বৃন্দাবন ধরিত্রীর কীর্তি বিস্তার করছে।' আবার কেউ বললে, 'হরিণীরা মূঢ়মতি বটে কিন্তু কী আশ্চর্য, বেণুধ্বনি শুনে কৃষ্ণসারদের সঙ্গে একত্র হয়েছে, একত্র হয়ে প্রণয়গাঢ় দৃষ্টিতে কৃষ্ণের উদ্দেশে পূজারচনা করছে। আরো দেখ, ধ্বনি শুনে উৎক্ষিপ্ত কর্ণপুটে গাভীরা দাঁড়িয়ে পড়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে লেহন করছে কৃষ্ণকে, আর দুগ্ধপানরত বৎসদের ক্ষীরগ্রাস মুখেই স্থির হয়ে রয়েছে। পাখিদের দেখ। মুদিত নয়নে সুস্বর বেণুগীত শুনছে, তন্ময়তায় ওরাও বুঝি মুনি হবার যোগ্য।'

বৃন্দাবন কৃষ্ণের নিত্য-আবাস, সেখানে হিংসাবিদ্বেষ অনুপস্থিত। যারা 'নৈসর্গদুর্বৈর' অর্থাৎ যারা স্বভাবতই শত্রুতাভাবাপন্ন তারা এখানে অক্ষুণ্ণ মিত্রতায় বাস করছে একত্র। এখানে মৃগ আর ব্যাঘ্র কারুই দেহাভিমান নেই, নেই খাদ্য খাদকের সম্পর্ক। তারা সবাই কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণপ্রেমবপু। আর স্বপ্রকাশ কৃষ্ণনাম কৃপা করেই তাদের জিভে স্ফুরিত হতে সমর্থ।

মৃগদেহ ত্যাগ করবার সময় ভরত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেছিল আর করেছিল গজরাজদেহধারী ইন্দ্রদ্যুম্ন।

পাণ্ড্যদেশীয় মহীপতি জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন মৌনে ভগবান নারায়ণের ধ্যান করছেন, মহাযশা অগস্ত্য সশিষ্য এসে উপস্থিত হল। মৌনে আছে বলে ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যকে অভ্যর্থনা করতে পারল না। কুপিত হয়ে অগস্ত্য অভিশাপ দিল এ অশিষ্ট ব্রাহ্মণাবমাননাকারী রাজা গজের মতই স্তব্ধমতি, সুতরাং এ গজ হয়েই অজ্ঞানে নিমগ্ন হোক।

দৈবই এই ঘটনার মূল—এই ভাবনা করতে করতে ইন্দ্রদ্যুম্ন গজ-জন্ম প্রাপ্ত হল।

ত্রিকূট পর্বতের উপত্যকায় বরুণের একটি সুরম্য উদ্যান আছে, তাতে সুবৃহৎ সরোবর। একদিন সেই গজরাজ করিণীগণসহ উদ্যানের বৃক্ষলতা দলিত করে ও পশুপক্ষীকে সন্ত্রস্ত করে সেই সরোবরে উপস্থিত হল। সরোবরের জলে নিজে স্নান করল, হস্তিনীদেরও স্নান করাল। শুঁড় দিয়ে জল তুলে নিজের শরীর তো সিঞ্চন করলই, সংসারী পুরুষের মত হস্তিনীদেরও সিঞ্চিত করল। মদোন্মাদে বিহ্বল ও দৈবী মায়ায় মুগ্ধ ছিল বলে অন্যের যে কষ্ট হচ্ছে তা দেখতে পেল না।

সরোবরে এক মহাবল কুমির ছিল। সে গজেন্দ্রের চরণ গ্রাস করল। যূথপতি কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। সহচর হাতিরা অনেক টানাটানি করল কিন্তু কুমিরের গ্রাস শিথিল হল না। বলদৃপ্ত করী আর দৈবদুরন্ত কুমিরের সংগ্রাম হাজার বছর ধরে চলল কিন্তু করী ত্রাণ পেল না। ক্রমশই অবসন্ন হতে লাগল। যূথস্থ এতগুলি বলবান হাতিও কিছু করে উঠতে পারল না। তখন জ্ঞান হল নিশ্চয়ই এই দুর্ধর্ষ শত্রু বিধাতার পাশরূপেই প্রেরিত হয়েছে। এখন যিনি অগতির গতি, যাঁর ভয়ে মৃত্যু প্রবর্তিত হয়, সেই সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

পূর্বজন্মার্জিত শিক্ষাবলে মনকে হৃদয়মধ্যে সমাহিত করে গজেন্দ্র ভগবানের স্তব করতে লাগল। হে ভগবান, তুমিই মুক্ত, তুমিই আমার মত শরণাগত পশুর বন্ধনপাশ মোচন করতে পারো, তোমার অপার করুণা, তোমার করুণাবিতরণে আলস্য নেই, অজ্ঞান থেকে আমাকে ত্রাণ করো। অজ্ঞান আত্মতত্ত্ব প্রকাশের আবরণস্বরূপ, মোক্ষকালেও এর নাশ হয় না। হে অখিলগুরু, হে ভগবান, হে নারায়ণ, হে সর্বদেবময় শ্রীহরি, তোমাকে নমস্কার।

ভগবান গরুড় হতে অবতরণ করে চক্রদ্বারা কুমিরের মুখচ্ছেদন করে গজরাজকে সর্বদেবসমক্ষে মুক্ত করে দিলেন।

প্রভু যে গ্রাম দিয়ে যান, যেখানে থামেন, সেখানকার লোকমাত্রই

প্রেমভক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়। একবার কৃষ্ণনাম শুনে অন্য কথা কানে নিতে চায় না। শুধু দর্শনে শ্রবণেই সর্বদেশ বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী পাহাড়ীরাও ভাসল নামপ্রেমে। লোকসঙ্ঘটের ভয়ে যদিও প্রভু প্রেম গোপন করে রাখতে চান, তবুও আপনা হতেই যেন তা দিকদিগন্তরে বিস্তৃত হয়।

বলভদ্র ভট্টাচার্য তো কাণ্ড দেখে হতবাক। তবু কী আনন্দ প্রভুর সেবা করতে। তাঁর জন্যে অন্ন দুধ সংগ্রহ করতে, রেঁধে দিতে বন্য ব্যঞ্জন। বন্য ভোজনে প্রভুর মহানন্দ। শীতের আভাস জেগেছে, নির্ঝরের উষ্ণ জলে স্নান ও সকালে সন্ধ্যায় কাঠ জ্বেলে আগুন পোহানো—এর মত সুখ আর কোথায়!

'ভট্টাচার্য, বহু দেশ আমি ঘুরেছি।' বললেন প্রভু, 'কিন্তু বনপথের মত সুখ আর কোথাও পাই নি। কৃপালু কৃষ্ণ আমাকে কী অপরিসীম কৃপা করলেন, নিয়ে এলেন বনপথে। কৃষ্ণকৃপা ছাড়া সুখের লব-লেশ নেই। আর কে না বলবে তোমার প্রসাদেই আমার এত সুখ।'

'কৃপার সমুদ্র—দীন হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণ কৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়॥'

'আমার আবার মূল্য কী!' বললে বলভদ্র, 'আমি কাক, তুমি আমাকে গরুড় বানালে। তুমিই মূককে বাচাল করলে, খঞ্জকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোলে। নইলে আমার সাধ্য কী, তোমার কাছে থাকি, তোমার সেবা করি। তোমার কৃপাতেই পেয়েছি সেবার অধিকার।'

'বন দেখি হয় ভ্রম—এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয়—এই গোবর্ধন॥
যাহাঁ নদী দেখে তাহাঁ মানয়ে কালিন্দী।
তাহাঁ প্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥'

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে পৌঁছুলেন কাশী।

মণিকর্ণিকায় মধ্যাহ্নস্নান করলেন। দেখলেন ঘাটে তপন মিশ্র। তপন ঠিক কথা রেখেছে, প্রভুর আদেশে কাশীবাসী হয়েছে। প্রভুও কথা রেখেছেন, দেখা দিয়েছেন।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে পদ্মাতীরে পূর্ববঙ্গে নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতকে দেখতে ছুটে এসেছিল তপন মিশ্র। স্বপ্নেই জেনেছিল নিমাই পণ্ডিত অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণ। দেখল তাঁর অপরূপ রূপসম্ভার, উদ্বেল হৃদয়ে লুটিয়ে পড়ল পায়ের উপর। বললে, সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখিয়ে দাও। শিখিয়ে দিলেন। সাধ্য শ্রীকৃষ্ণ, সাধন নামকীর্তন। আজ্ঞা করলেন, বারাণসী যাও, সেখানে আবার দেখা হবে। সেই থেকে তপন বুক বেঁধে বসে আছে। কত দিনে দর্শন পাবে, তার সমস্ত কীর্তন মূর্তি ধরে দাঁড়াবে সামনে।

যেন ভক্তিতে শিথিলতা না আসে। কার ভক্তি-শৈথিল্য? যে সাধন-ভক্তিতে উল্লাস হারিয়েছে, ভক্তির অনুষ্ঠানকে শুষ্কাচার বলে মনে করে, দৈহিক দুঃখে যে ব্যাকুল বা দৈহিক সুখে যে চঞ্চল, তারই ভক্তি-শৈথিল্য ঘটেছে। দৈহিক সুখ-দুঃখে যার অনাদর, যে অনভিনিবিষ্ট, তারই ভক্তি অব্যাহতা। ভক্তের আবার অমঙ্গল কী। তার বাসুদেবই তো সর্বস্ব।

সৎসাধকের বাঁচবার ইচ্ছে কেন? কেন তার দেহরক্ষার চেষ্টা? মৃত্যুর ভয়ে নয়, দেহসুখের উপভোগের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু ভজন-লোভে, শুধু ভক্তির আস্বাদনের লোভে। যত বেশি বাঁচা যাবে, ততই বেশি উপাসনা করা যাবে। শুধু উপাসনার জন্যেই জীবন-বাসনা। শুধু নামময় প্রেমময় হবার জন্যে।

উল্লাসে তপন রোদন করতে লাগল। নাচতে লাগল প্রেম-বিভোর হয়ে।

বিশ্বেশ্বর আর বিন্দুমাধব দর্শন করিয়ে প্রভুকে নিয়ে এল স্বগৃহে। নিমন্ত্রণ করে ভিক্ষা দিল—রান্না করাল বলভদ্রকে দিয়েই। ভিক্ষান্তে প্রভু শয়ন করলেন, মিশ্রপুত্র রঘুনাথ বসল পা টিপতে।

খবর পেয়ে চন্দ্রশেখর এসে হাজির। বললে, 'প্রারব্ধদোষে কাশীতে পড়ে আছি। শুনছি কেবল মায়া-ব্রহ্ম। শুধু ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা। প্রভু, কৃপা করে তুমি নিজের থেকেই দর্শন দিয়েছ দুর্ভাগ্যকে। কৃষ্ণকথা শুনিয়ে তৃষিত হৃদয় শীতল করো।'

কাশীতে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যের চর্চা চলেছে, মায়াধীন জীবকে মায়াধীশ ব্রহ্ম বলে স্থাপন করছে। ভক্তের পক্ষে এ ব্যাখ্যা মর্মদাহকর অপরাধজনক। যে শাস্ত্রের সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ নন, অভিধেয়তত্ত্ব ভক্তি নয়, প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেম নয়, সেই শাস্ত্রের আলোচনায় ভক্তের সুখ কী।

'তুমি সর্বজ্ঞ বলেই আমাদের চিন্তা ও বেদনার কথা বুঝেছ,' বললে চন্দ্রশেখর, 'তুমি এসেছ অনাহূত।'

'ষড়দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা॥
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন॥'

এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। প্রভুর রূপ আর প্রেম দেখে চমৎকার মানল। গেল প্রকাশানন্দকে খবর দিতে।

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ শিষ্যদের বেদান্ত পড়াচ্ছেন, বিপ্র এসে বললে, 'শুদ্ধ কাঞ্চনবর্ণ এক সন্ন্যাসী দেখে এলাম। আজানুলম্বিত বাহু, কমলনেত্র, সর্ব অঙ্গে ঈশ্বরের সৎলক্ষণ। তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে পারি এমন সাধ্য নেই। সন্দেহের লেশমাত্র নেই ইনিই নারায়ণ। এমন অদ্ভুত, যে তাঁকে দেখে সেই কৃষ্ণকীর্তন সুরু করে।'

'প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন॥
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয়—এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন॥'

প্রকাশানন্দ নীরবে হাসল।

তাঁর জগৎমঙ্গল কৃষ্ণচৈতন্য নাম। বলতে লাগল বিপ্র। মহাভাগবতের সমস্ত চিহ্ন তাঁতে প্রস্ফুট।

মহাভাগবত কে?

যার চিত্ত বাসুদেবে আবিষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জন্যে যে লালায়িত নয়, যাতে কামকর্মবাসনা অনুপস্থিত, সংসারধর্মে যে অমুগ্ধ, যে সর্বভূতে সমদর্শী, যে শান্ত, নির্বিচল, নিমিষার্ধের জন্যেও যে ভগবান থেকে স্খলিত নয়, যার হৃদয়ে ভগবানের সর্বক্ষণের বিশ্রাম, সেই মহাভাগবত।

রাজা নিমি জিগগেস করল, 'কে ভাগবত? কী ধর্ম ও স্বভাব আচরণ ও উক্তিতে সে প্রকাশিত? কী তার চিহ্ন?'

মহাভাগ মুনি বললে, 'যে সর্বভূতে ভগবানকে ও ভগবানে সর্বভূতকে দেখে সে উত্তম ভাগবত। যে ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মিত্রতা, অজ্ঞানীতে কৃপা ও দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করে, ভেদদর্শনহেতু সে মধ্যম। যে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে প্রতিমাতে হরিপূজা করে, তাঁর ভক্ত ও অন্য কাউকে করে না, সে প্রাকৃত। বাসুদেবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকাতে যে বিষয়ভোগ করলেও এই বিশ্বকে বিষ্ণুরই মায়া বলে দেখে, আর তারই জন্যে দ্বেষও করে না আনন্দিতও হয় না, সে উত্তম ভাগবত। হরিস্মৃতিতে বাস করার দরুন যে দেহের জন্মমৃত্যু, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ের শ্রমকে সংসারধর্মমাত্র জেনে মুগ্ধ হয় না সেই শ্রেষ্ঠ ভাগবত। যার চিত্তে বাসনা নেই এবং বাসুদেব যার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন; জন্ম কর্ম বর্ণ আশ্রম জাতি নিবন্ধন যার চিত্তে অহং-ভাব জাগে না; দেহে-বিত্তে যার আপন-পর জ্ঞান নেই, যে সর্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, বিশ্বসাম্রাজ্য-লাভের আশায়ও যে সারাৎসার হরিচরণ থেকে নিমেষার্ধের জন্যেও বিচলিত হয় না, সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। বিষয়কামনায় যার চিত্ত সন্তাপিত নয় অবশেও নাম নিলে যিনি পাপরাশি দূরীভূত করেন

সেই শ্রীহরি যাকে কখনো ত্যাগ করেন না, যার প্রণয়াবদ্ধ হয়ে নিরন্তর সেই শীতল চিত্তে বিশ্রাম করেন, সেই ভাগবতপ্রধান।'

'নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধার প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জন॥'

প্রকাশানন্দ বললে, 'হ্যাঁ, শুনেছি, গৌড় দেশে এক ভাবক সন্ন্যাসী জন্মেছে। কিন্তু আসলে সে প্রতারক। চৈতন্য নাম নিয়ে দেশে-দেশে লোক নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। কেশবভারতীর শিষ্য বলে শুনেছি। কিন্তু তার আসল বিদ্যা মোহনবিদ্যা।' প্রকাশানন্দ নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল: 'তারই প্রভাবে যে তাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, তাকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করে।'

প্রকাশানন্দ নিন্দা করল বটে কিন্তু পরোক্ষে স্তুতি হয়ে গেল। প্রভুকে ভাবক বলে বোঝাতে চাইল ভাবপ্রবণ। কিন্তু ভাবক শব্দের আরেক অর্থ যিনি ভাব সৃষ্টি করতে পারেন, আর কৃষ্ণে গাঢ় রতিই ভাব। সুতরাং ভাবক হচ্ছে মহাভাবময় মূর্তি, স্বয়ং ভগবান। আর কী বলল? বলল কেশব-ভারতী-শিষ্য। নিন্দাবাচক অর্থে, প্রভু উত্তম সম্প্রদায়ের শিষ্য নয় যেহেতু 'ভারতী' মধ্যসম্প্রদায়। বোঝাতে চাইল, ভারতীর যে শিষ্য সে সন্ন্যাসীসমাজে নিম্নস্থ। কিন্তু পরোক্ষে আবার স্তুতি হয়ে গেল। যিনি রাধিকার কেশসংস্কার করেন অর্থাৎ বেণী বেঁধে দেন তিনিই কেশব—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। আর ভারতী অর্থ কথা। সুতরাং কেশব ভারতী অর্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা। আর কী বলল? বলল, প্রতারক। নিন্দার্থে প্রবঞ্চক। আর পরোক্ষার্থে, প্রকৃষ্ট ত্রাণকর্তা। লোক-প্রতারক তাই লোকত্রাতা। সর্ব অমঙ্গল হরণ করে যিনি প্রেমপূর্ণ করে দেন তিনিই সমুদ্ধর্তা। আর তার বিদ্যার নাম মোহন-বিদ্যা। নিন্দার্থে কুহক-কৌশল, আর পরোক্ষার্থে সেই বিদ্যা, সেই হ্লাদিনী

শক্তি, ভক্তি-শক্তি, যাতে সমস্ত জীবগজৎ মুগ্ধ। আর, নাম চৈতন্য। উপেক্ষায় শুধু চৈতন্য বলা হয়েছে তো হোক, কিন্তু, হ্যাঁ, প্রভু, চিদঘনবিগ্রহ, সেই চৈতন্যে জড়বস্তুর লেশচ্ছায়া নেই।

বলেন কী। অদ্বৈত বেদান্তে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য পর্যন্ত বশীভূত হয়েছেন। মায়াবাদ ছেড়ে ভক্তিপথ ধরেছেন।

'সার্বভৌম পাগল হয়েছে বলে তোমার চৈতন্য মহৎ হয় না।' শাসন করে উঠল প্রকাশানন্দ: 'কাশীপুরে তার ভাবকালী বিকোবে না। শোনো, ঐ মায়াবীর কাছে যেও না আর, এখানে বসে বেদান্ত শোনো।'

প্রকাশানন্দ বলতে চাইল, প্রভু একজন বাজিকর মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রজালের আরেক অর্থ ভগবানের ঐশ্বর্য। তার মানে, পরোক্ষে স্তুতি হল প্রভুর। বলা হল প্রভু ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বরই আসল ইন্দ্রজালী।

বিপ্র সেখানে আর বসতে পারল না। শেষ পর্যন্ত প্রভুকে প্রকাশানন্দ উচ্ছৃঙ্খল বললে।

উচ্ছৃঙ্খল নিন্দার্থে স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু প্রশংসার্থে অ-পরতন্ত্র, স্বেচ্ছাধীন। তার অর্থই সর্বস্বাধীন ভগবান।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে উঠে পড়ল বিপ্র। প্রভুর কাছে গিয়ে সখেদে প্রকাশানন্দের কথা বললে। স্থূল অর্থে যা শুনেছে তাই বললে। বললে, 'আপনার নিন্দা করবার উদ্দেশে আপনার নাম বলতে গিয়ে 'চৈতন্য' বললে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বললে না। তিন-তিনবার চৈতন্য উচ্চারণ করল কিন্তু একবারও তার কৃষ্ণনাম মুখে এল না। কিন্তু আমি তো কতবার কৃষ্ণ-হরি বলছি। এর কারণ কী?'

'ও যে মায়াবাদী, কৃষ্ণে-অপরাধী।' বললেন প্রভু, 'ওর মুখে কৃষ্ণনাম আসবে না। ও কেবল ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য বলবে। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণনাম এক বস্তু। যার কৃষ্ণে অপরাধ তার জিহ্বায় নামস্ফুরণ হবে কী করে? নাম ও নামীতে ভেদ না থাকায় কৃষ্ণনাম স্বয়ংরূপ

কৃষ্ণেরই মত চৈতন্যরসবিগ্রহ। চিন্তামণির মত সর্বাভীষ্টপ্রদ। যারা ব্রহ্মজ্ঞানী তারা লীলারসের আনন্দে অধিকারী নয়। ব্রহ্মানন্দের চেয়ে কৃষ্ণলীলার আস্বাদনে আনন্দ বেশি। কিন্তু তোমায় বলি, লীলারসের শক্তি এত প্রবল যে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও আকর্ষণ করে আত্মবশ করে তোলে।'

'বুঝেছি তাই বহির্মুখ প্রকাশানন্দের মুখে কৃষ্ণনাম এল না।'

'আমি আর কী করব!' বললেন প্রভু, 'আমার ভাবকালীর গ্রাহক যখন এখানে নেই তখন আর বিকোব কী! ভারি বোঝা বয়ে নিয়ে আমাকে দেশেই ফিরে যেতে হবে।'

'ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে॥
ভারী বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে—এথাই বেচিব॥'

কী সে অল্পমূল্য?

একটি প্রণতি, একটু স্বীকৃতি, একটু অভিমুখিতা।

তপন চন্দ্রশেখর আর মহারাষ্ট্রী বিপ্র—তিনজনকে কাঁদিয়ে প্রভু চলে গেলেন প্রয়াগে। ত্রিবেণীতে স্নান করলেন, দেখলেন বেণীমাধবকে। যমুনা দেখে পড়লেন ঝাঁপ দিয়ে। বলভদ্র তুলল জল থেকে।

'পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
তাহাঁ ঝাঁপ দিয়া পড়ে—প্রেমে অচেতন॥'

তিনদিন থেকে চললেন মথুরায়। লোকনিস্তারণ কৃষ্ণনামপ্রেম বিতরণ করলেন পথে-পথে।

অগ্রবন বা আগ্রায় এলেন। উঠলেন জমদগ্নির আশ্রমে, পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত শিবদর্শন করলেন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করলেন ব্রজমণ্ডলে। গোকুলে বৃক্ষতলে রাত কাটিয়ে যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে এলেন মথুরায়।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন ভূতলে।

বিশ্রামঘাট বা বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করলেন। কংসবধ করে এই ঘাটেই বিশ্রাম করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অদূরেই কংস-কারাগার, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। দেখলেন প্রেমার্দ্র দৃষ্টিতে। দেখলেন কেশব-বিগ্রহ।

মথুরাবাসী এক ব্রাহ্মণ এসে প্রভুর কীর্তনে যোগ দিল। প্রভুকে মালা পরিয়ে দিয়ে বললে, 'এ রূপ এ প্রেম কখনো লৌকিক নয়। নইলে যে দেখে সেই প্রেমে মত্ত হয় কেন? অবলীলায় নেয় কেন কৃষ্ণনাম? পলকে কেন হাসতে কাঁদতে শেখে? আমাকেই বা কেন নাচায়?'

প্রভু বললেন, 'তুমি বৃদ্ধ সরল ব্রাহ্মণ, তুমি এই প্রেমধন কোথায় পেলে?'

'মাধবেন্দ্র পুরী মথুরায় এসেছিলেন, আমাকে নিয়েছিলেন শিষ্য করে। তাঁর থেকেই এ প্রেমোদয়।'

'বলো কী, তুমি মাধবেন্দ্রের শিষ্য? তা হলে তো তুমি আমার গুরু।'

'অমন কথা বোলো না। তবে যদিও আমরা 'সনোড়িয়া' ব্রাহ্মণ, অন্য ব্রাহ্মণের অনাচরণীয়, মাধবেন্দ্র প্রচলিত প্রথা না মেনে আমার ঘরে এসে ভিক্ষে নিয়েছিলেন। এমন কৃপায় প্রেম জাগবে না তো কী।'

'মাধবেন্দ্র যদি তোমার হাতে খেয়েছেন', বললেন প্রভু, 'আমাকেও তবে পাক করে খাওয়াও স্বহস্তে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা করেন অপরের পক্ষে তাই অনুকরণীয়।'

'না, তা সঙ্গত হবে না।' ব্রাহ্মণ কাতরমুখে বললে, 'পাঁচজন তোমাকে নিন্দা করবে। দুষ্টের বচন সইতে পারব না।'

'বৈষ্ণবের আবার জাতিবিচার কী।' সহাস্যমুখে বললেন প্রভু, 'আর সাধু পুরুষদের আচরণই ধর্মস্থাপনের হেতু। শাস্ত্রে যখন নানা

বিতর্ক তখন সাধুই পথপ্রদর্শক। মাধবেন্দ্র যখন খেয়েছেন তখন আমিও খাব।'

তর্কে তত্ত্বনির্ণয় হয় না। শ্রুতির মত ভিন্ন-ভিন্ন। যার আলাদা মত নেই সে ঋষিই নয়। ধর্মতত্ত্ব দুরধিগম্য, গুহানিহিত। প্রাকৃত লোক কী করবে? মহাজনেরা, পূর্বাচার্যেরা যে পথে গিয়েছে তাই অনুসরণ করবে।

ব্রাহ্মণ আর আপত্তি করল না, প্রভুকে ভিক্ষা করাল।

যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করলেন প্রভু, দেখলেন যাবতীয় তীর্থস্থান, গোকর্ণ থেকে দীর্ঘবিষ্ণু। বন দেখতে মন হল। গেলেন মধুবনে তালবনে বহুলাবনে। একপাল ধেনু এসে ঘিরে ধরল প্রভুকে, প্রভুর অঙ্গ সস্নেহে লেহন করতে লাগল। প্রভুও ওদের গাত্র কণ্ডুয়ন করে দিলেন। গোপালকরা নিয়ে যেতে চাইলেও ইচ্ছুক নয় গাভীদল। আর যদি বা তারা গেল, প্রভুর শব্দ শুনে ছুটে এল মৃগ-মৃগী, ময়ূর-ময়ূরী। পিক ভৃঙ্গও গান ধরল পঞ্চমে। বৃক্ষলতারাও মধু অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। ফুলে ফলে নুয়ে পড়তে লাগল শাখাপ্রশাখা।

প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন প্রভু। কৃষ্ণনাম উচ্চে বলে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল ভট্টাচার্য। সম্বিৎ ফিরে পেয়েও প্রভু ব্রজধূলির সংস্পর্শ ছাড়েন না, মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সর্বদেহ কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। নীলাচলে যে প্রেমাবেশ ছিল বৃন্দাবনের পথে তা শতগুণ বাড়ল আর মথুরাদর্শনে বাড়ল সহস্রগুণ। আর বৃন্দাবনে সে পরিমাণ লক্ষগুণ। কোটিগ্রন্থেও সে প্রেমবিকারের সম্যক বর্ণনা হয় না।

'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥'

'প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥

ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥'

বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম তাদের পরাণ-সখার দেখা পেয়ে পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। প্রভু প্রতি বৃক্ষলতাকে আলিঙ্গন করছেন। মনে মনে পুষ্পফল অর্পণ করেছেন কৃষ্ণকে। 'কৃষ্ণ বোল' 'কৃষ্ণ বোল' বলছেন। স্থাবরজঙ্গমও কৃষ্ণধ্বনি করছে। কখনো কাঁদছেন মৃগের গলা ধরে। মৃগের অঙ্গে পুলক জাগছে, নয়নে অশ্রুধার।

কোত্থেকে ছুটো শুক-শারী এসে জুটেছে। শুক পড়ছে কৃষ্ণগুণ-শ্লোক। শারী ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়, সেও সুরু করেছে রাধিকা-বর্ণনা।

কী বলছে শুক?

বলছে, যার সৌন্দর্য ললনাদের ধৈর্য দলন করে, যার লীলা রমাস্তম্ভিনী, অর্থাৎ যা বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে, যার বীর্য গিরিগোবর্ধনকে কন্দুকে পরিণত করেছে, যার গুণ অমল ও অনন্ত, যার স্বভাব সর্বজনানুরঞ্জন, যার কীর্তি বিশ্বজনের হিতসাধিনী, সেই আমাদের প্রভু জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্বকে রক্ষা করুক।

শারী উত্তর দিল :

আমাদের রাধিকার প্রিয়তা, সুরূপতা, সুশীলতা, গীতনর্তনচাতুরী, গুণসম্পত্তি আর কবিত্ব জগন্মোহনের চিত্তবিমোহন। সুতরাং আমাদের রাধিকা কৃষ্ণের থেকেও গরীয়সী।

'শারী, আমাদের কৃষ্ণ মদনমোহন।' বললে আবার শুক, 'তোমাদের ব্রজাঙ্গনারা যে মদনের বাণে জর্জর হয়ে কৃষ্ণসঙ্গের জন্যে উৎকণ্ঠিত, সে মদন কৃষ্ণকে দেখে বিমোহিত।'

শারী বললে, 'যতক্ষণ কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই মদন-মোহন। রাধা সঙ্গে না থাকলে বিশ্বমোহন হয়েও মদনমোহিত হয়ে থাকেন। একমাত্র রাধার প্রভাবেই মদন পরাভূত।'

ময়ূরকণ্ঠ দেখে কৃষ্ণস্মৃতি হতেই প্রভু পড়লেন ভূতলে। বলভদ্র

ব্যাকুল স্নেহে সেবা করে প্রভুকে সুস্থ করে তুলল। কানে উচ্চারণ করল কৃষ্ণনাম। চেতন পেয়ে প্রভু গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। কণ্টকে ক্ষত হল শ্রীঅঙ্গ। প্রভুকে কোলে করে সুস্থ করল বলভদ্র।

প্রেমে গরগর হয়ে আবার পথ ধরলেন। দ্বাদশবন ভ্রমণ করলেন। মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, লৌহবন, বেলবন, ভাণ্ডিরবন আর বৃন্দাবন। চৈতন্যলীলায় জগৎ ভাসিয়ে চললেন।

'জগত ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥'

প্রভু কৃষ্ণ হয়ে বলছেন কোথায় রাধা? রাধা হয়ে বলছেন কোথায় কৃষ্ণ?



৫৭

প্রভু এলেন আরিটগ্রামে। এইখানেই অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিল কৃষ্ণ। বধ করে রাধিকাকে ছুঁতে এলে রাধিকা বললে, 'অরিষ্ট হলই বা না অসুর, কিন্তু যেহেতু সে বৃষের আকার ধরেছিল তাকে হত্যা করে তোমার গোবধের পাতক হয়েছে। যদি সর্বতীর্থে স্নান করতে পারো তবেই তোমার পাপক্ষালন হবে, তবেই ছুঁতে পারবে আমাকে।'

'বটে? এই কথা?' কৃষ্ণ বললে, 'তবে এইখানেই সমস্ত তীর্থ নিয়ে আসছি, স্নান করছি তীর্থোদকে।' বলে কৃষ্ণ মাটিতে লাথি মারল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা কুণ্ড হল আর তা সর্বতীর্থজলে ভরে গেল। নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে তীর্থদেবতারা কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। কৃষ্ণ স্নান করল। স্পর্শ করল রাধিকাকে।

সেই কুণ্ডের নাম অরিষ্টকুণ্ড। কেউ বা বলে শ্যামকুণ্ড।

রাধিকা পরাস্ত হবার পাত্রী নয়। সখীদের নিয়ে সে-ও কুয়ো খুঁড়তে সুরু করল। জল পাবে কোথায়? সর্বতীর্থময়ী মানসী গঙ্গার জল নিয়ে আসব। তার চেয়ে, কৃষ্ণ বললে, আমার কুণ্ডের তীর্থদের বলি, তোমার কুণ্ডও ওরা ভরে দিক। তাই হোক। তাই হল। কুণ্ডের নাম হল রাধাকুণ্ড।

সেই রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কোথায়? কেউ বলতে পারছে না। তীর্থচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে।

সর্বজ্ঞ প্রভু দেখিয়ে দিলেন। সেই দুই কুণ্ড এখন দুই ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধান্যক্ষেত্রে অল্প-অল্প জল আছে। তাইতেই প্রভু স্নান করলেন।

'প্রভু সে সর্বজ্ঞ গুপ্ত তীর্থ নিরখয়। দুই ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়॥' রাধাকুণ্ডের নাম হয়েছে গোরীক্ষেত আর শ্যামকুণ্ডের নাম হয়েছে কারিক্ষেত।

এই কুণ্ডেই রাধাকৃষ্ণের জলকেলি হয়েছে, তীরে কত রাসরঙ্গ। তারই ঢেউ বুঝি প্রভুর গায়ে লাগল।

রাধাকুণ্ড 'প্রিয়ার সরসী'। আর রাধাই প্রেয়সীদের শিরো-ভূষণ। রূপে গুণে প্রেমে সৌভাগ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। আর যেই কুণ্ডে রাধা স্নান করেছে সেই কুণ্ড অমৃতসমান।

'হে অর্জুন', বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, 'ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্যা যেহেতু তাতে বৃন্দাবন আছে। সেই বৃন্দাবনে গোপিকারা ধন্যা যেহেতু তাদের মধ্যে একজন রাধা নামধেয়া আছেন।'

'মমেষ্টা হি সদারাধা।' রাধার সঙ্গে ক্রীড়ার রসবৃদ্ধির রসপুষ্টির উপকরণই এই গোপিকারা। অন্নের রসবৈচিত্রী সম্পাদনের জন্যে বিবিধ ব্যঞ্জন। মুখ্যতমাই রাধা। রাধাই সারভূতবাসনা। রাধা যখন রাসমণ্ডলী ছেড়ে চলে গেল তখন তো অন্যান্য গোপী সেখানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ আর সকলকে ত্যাগ করে রাধার অন্বেষণে

ধাবিত হল। রাধাই রাসেশ্বরী, রাসলীলার মধ্যমণি। রাধার সঙ্গ ছাড়া সবই আঁধার।

এই রাধাকুণ্ডে স্নান করলে কৃষ্ণে রাধার মতই প্রেম লাভ হয়। স্বসুখকামনাবর্জিত কৃষ্ণসুখতৎপর কান্তা-প্রেম।

'সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধা-সম-প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥'

প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে স্তব করছেন, কুণ্ডলীলা স্মরণ করে নৃত্য করছেন তীরে তীরে। কুণ্ডের মৃত্তিকা নিয়ে ললাটে তিলক করলেন, ভট্টাচার্যকে বললেন, কিছু মৃত্তিকা নাও সঙ্গে করে।

'সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥'

সুমনঃসরোবর বা মানস গঙ্গায় এসে পৌঁছুলেন। দেখলেন গোবর্ধন। এক শিলাখণ্ড আলিঙ্গন করলেন, মনে হল কৃষ্ণকলেবর। উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। প্রবেশ করলেন গোবর্ধন গ্রামে। দর্শন করলেন হরিদেবকে।

কে হরিদেব?

কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ। গোবর্ধনে সেই প্রতিষ্ঠা করেছিল হরিদেব, আর বৃন্দাবনে গোবিন্দ। তার মা উষা বললে, বৎস, বহুদিন শ্রীগোবিন্দের মুখ দেখি না, আমাকে দর্শন করাও। বজ্রনাভ প্রথমে মদনমোহন বিগ্রহ নির্মাণ করাল। তার পা দুখানি কৃষ্ণের মত। তার পর করাল গোপীনাথ। তার বুক কৃষ্ণের মত। তার পর করাল গোবিন্দ মূর্তি। গোবিন্দের মুখ যে দেখি অবিকল কৃষ্ণের মত। লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানল উষা।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে ভট্টাচার্যের পাক-করা ভিক্ষা গ্রহণ করলেন প্রভু। হরিদেবের মন্দিরেই রাত কাটালেন। মনে-মনে ভাবলেন, গোপালকে দর্শন করব কী করে? গোবর্ধনের উপর তো আমি পা রাখতে পারব না। গোবর্ধন যে কৃষ্ণতনু।

কিন্তু গোপাল যে এখন গাঁধুলিগ্রামে। গোবর্ধনে নেই।

থাকবে কেন? ভক্তাভিমানীর জন্যে নিজে নেমে আসবে। গোপাল যেই শুনল গোবর্ধনে পাদস্পর্শে হবে বলে ভক্ত পর্বতারোহণ করবে না তখন নিজেই ছলে বলে কৌশলে অবতরণ করবে।

'দিল্লির বাদশাহের তুর্কী সৈন্যরা আসছে, যাও, গোপাল নিয়ে পালাও গ্রাম ছেড়ে।' কে একজন এসে খবর দিল মন্দিরে।

আগে-আগে আরো কতবার পালিয়েছে। বনে-বনান্তরে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে। এবারও পালাল গাঁধুলিগ্রামে, এক নিরীহ ব্রাহ্মণের ঘরে।

গোবর্ধন পরিক্রমা করতে করতে খবর পেলেন প্রভু। সন্দেহ কী, স্বয়ং গোপালই ছল উদ্ভাবন করে নিচে নেমেছে। নইলে কই, তুর্কী সৈন্য কই?

গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করে প্রভু গাঁধুলি গ্রামে গিয়ে গোপাল দর্শন করলেন। গোপালের সৌন্দর্য দেখে প্রভুর প্রেমাবেশ হল। তিনি কীর্তন-নর্তন সুরু করলেন। লোকসংঘট্ট আর কী করে রোধ করা যায়?

'কমলনয়ন কৃষ্ণের যে বামভুজদণ্ড গোবর্ধন গিরিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল সেই ভুজদণ্ড তোমাদের রক্ষা করুন।' শ্লোক পাঠ করলেন প্রভু।

গোবর্ধন গিরিই তো কৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ। এই পর্বতই তো রাম-কৃষ্ণের চরণস্পর্শে পুলকিত হয়ে পানীয় জল, নবতৃণদল, শীতল ছায়া, গুহা আর বিচিত্র ফলমূল দিয়ে সেই রাম-কৃষ্ণের ও ব্রজরাখালদের তৃপ্তিবিধান করেছিল। আর কোন ভক্তের হয়েছিল এত সৌভাগ্য?

আর গোবর্ধনের গোপাল করুণস্বভাব। ভক্ত যদি পাহাড়ে উঠতে না পারে ভক্তকে দর্শন দিতে ছল করে নিজেই নেমে আসে। রূপ-সনাতনকেও নেমে এসেই দিয়েছিল দর্শন।

'এইমত গোপালের করুণস্বভাব।
যেই ভক্তজনে দেখিতে হয় ভাব॥

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে॥
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥'

সেখান থেকে প্রভু গেলেন কাম্যবনে। সেখান থেকে নন্দীশ্বর। পাবন সরোবরে স্নান করলেন। শুনলেন পর্বতের উপরে গুহায় দেবমূর্তি আছে। চলো দেখে আসি। দু পাশে নন্দ আর যশোদা, মাঝখানে গোপাল—এই ত্রিমূর্তির বিগ্রহ। গোপালের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করলেন প্রভু। প্রণাম করলেন না। নিজেকে নিজে প্রণাম করবেন কেন?

সেখান থেকে খদিরবন। খদিরবন থেকে শেষশায়ী। ভাগবতের শ্লোক পাঠ করলেন প্রভু। কৃষ্ণ রাসস্থলী থেকে অন্তর্হিত হলে গোপীরা বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বলছে, তোমার যে পরমকোমল চরণকমল আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে সভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করি সেই পা দুখানি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম শিলায় ফেলে-ফেলে তুমি চলেছ। তোমার এই দুঃখ আমরা সহ্য করব কী করে? গোপীদের আত্ম-সুখদুঃখের বিচার নেই, তাদের সমস্ত গতি-চেষ্টা ভাবনা-অভিলাষ কৃষ্ণসুখের উদ্দেশে। 'আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥'

সেখান থেকে গেলেন খেলাতীর্থে, খেলন-বনে। যেখানে খেলা করত রাম-কৃষ্ণ। সেখান থেকে ভাণ্ডীরবন। ভাণ্ডীরবনে কৃষ্ণ আর ব্রজাঙ্গনারা মল্লবেশে যুদ্ধ করেছিল। 'কৃষ্ণপানে চাহি রাই মন্দমন্দ হাসে। মল্লযুদ্ধ হেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে॥' এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় নেই, শুধু আনন্দ-কন্দর্পের আতিশয্য।

যমুনা পার হয়ে এলেন ভদ্রবনে। ভদ্রবন থেকে বেলবন, লৌহবন। লৌহবনে কৃষ্ণ লোহজঙ্ঘ-অসুরকে বধ করেছিল। পরে মহাবন বা গোকুল। সেখানে নন্দনন্দনের জন্মস্থান দেখলেন।

দেখলেন যমলার্জুনভঞ্জনের স্থান। প্রেমাবেশে প্রভুর মন টলমল করে উঠল। গোকুল দেখে পুনরায় মথুরা। জনতা এড়াবার জন্যে থাকলেন অক্রূরঘাটে।

মাঝে মাঝে যাচ্ছেন বৃন্দাবন, দেখছেন সব লীলাতীর্থ।

স্নান করলেন কালিয়হ্রদে, দেখলেন সেই পর্বত যেখানে শীতার্ত কৃষ্ণকে তাপ দেবার জন্যে দ্বাদশ আদিত্য প্রকট হয়েছিল। স্নান করলেন চীরঘাটে যে ঘাটে ঘটেছিল বস্ত্রহরণের লীলা। তেঁতুলীতলায় বসলেন বিশ্রাম করতে। এই তেঁতুল গাছ কৃষ্ণের সময় থেকে বর্তমান। গাছের গোড়াটা বাঁধানো, সুন্দর মসৃণ। জায়গাটা প্রভুর খুব পছন্দ হল। সামনেই যমুনা, যমুনার জল, আর চারদিকে বৃন্দাবনের শোভা, আর কী শীতল হৃদয়জুড়ানো হাওয়া। এই নিভৃতে বসে নামকীর্তন করি। আর, যদি কেউ আস আকৃষ্ট হয়ে, তুমিও নামকীর্তন করো।

তাই করছেন একদিন, কেশীস্নান করে কালীদহে যাবার পথে তাঁকে দেখতে পেল এক রাজপুত গৃহস্থ। নাম কৃষ্ণদাস।

'কে তুমি ?' জিগগেস করলেন প্রভু।

'আমি আবার কে !' কৃষ্ণদাস বললে, 'আমি এক পামর গৃহস্থ। যমুনার ওপারে আমার ঘর।'

'কী তোমার অভিলাষ ?'

'অভিলাষ আমি বৈষ্ণবকিঙ্কর হই।' বললে কৃষ্ণদাস, 'স্বপ্নে সেই বৈষ্ণবের আবির্ভাব হল। এখন এই আমলিতলায় সেই স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করলাম।'

প্রভু তাকে আলিঙ্গন দিলেন। স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে কিঙ্কর হয়ে গেল কৃষ্ণদাস। প্রেমে মত্ত হয়ে নাচতে লাগল হরি বলে।

দিকে-দিকে গুজব রটল বৃন্দাবনে আবার কৃষ্ণ প্রকট হয়েছে।

'কোথায় ?' উদ্ভ্রান্ত জনতার একজনকে জিগগেস করলেন

'কালীদহে। কালিয়ের মাথার উপরে নাচছে।'

'বুঝলে কিসে ?'

'সাপের ফণায় মণি জ্বলছে যে। তারই আলোয় সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।' 'সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'তা তো ঠিকই। সন্দেহের কী আছে।'

সকলের মুখেই সেই এক কথা। কৃষ্ণ দেখলাম। কৃষ্ণ দর্শন দিলেন।

তা ছাড়া আবার কী। গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণকেই তো সকলে দেখছে। সত্য ছেড়ে অসত্যকে সত্যভ্রম করছে।

'মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥'

কিন্তু সঙ্গের ব্রাহ্মণ আর বলভদ্রও সমান রব তুলবে এ কে জানত।

'অনুমতি দিন, কৃষ্ণ দর্শন করে আসি।' বলভদ্র মিনতি করল।

'মূর্খের বাক্যে তুমিও মূর্খ হলে ?' প্রভু বিরক্তি প্রকাশ করলেন : কলিকালে কৃষ্ণ কেন দর্শন দেবেন ? দৃষ্টির ভুলে লোকেরা কোলাহল করছে। তুমি ঘরে চুপ করে বসে থাকো, কাল দেখো কৃষ্ণ কে।'

পরদিন সকালে কয়েকজন ভব্যবিজ্ঞ লোক এল প্রভুর কাছে। প্রভূ জিগগেস করলেন, 'কালীদহে কৃষ্ণ দেখে এলেন ? কেমন কৃষ্ণ ?'

'এক কৈবর্ত রাত্রে মশাল জ্বেলে নৌকো করে মাছ ধরছে।' বললে বিশিষ্টেরা, 'তাতেই দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে সকলের। নৌকোকে ভাবছে কালিয় নাগ, মশালকে ফণার মণি, আর জেলেকে কৃষ্ণ।' বলে হাসতে লাগল।

বলভদ্র লজ্জিত হল। প্রবোধ পেল অন্তরে।

'কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় লোকভ্রম !' বললে ভব্যের দল। 'কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে কাহোঁ ভ্রমে মানে।' 'শাখা পল্লবহীন নিরাভরণ গাছ দেখে লোকে যেমন মানুষ মনে করে। কিন্তু যে যাই বলুক,

বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণ এসেছেন, কৃষ্ণকে যে সবাই দেখছে তাতে আর সন্দেহ নেই।'

'সে কী? কোথায় সেই কৃষ্ণ?'

'আর কোথায়! এইখানে। তুমি, তুমিই সেই জঙ্গম-নারায়ণ। বিগ্রহ-নারায়ণ তো নিশ্চল, তুমিই চরাচরে বিচরণশীল।'

'বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি সর্বলোক হইল নিস্তার॥'

'বিষ্ণু, বিষ্ণু!' প্রভু দোষ খণ্ডন করতে চাইলেন: 'জীবকে কখনো কৃষ্ণ বলে ভেবো না। কৃষ্ণের তুলনায় জীব নিতান্ত অধম, নিতান্ত ক্ষুদ্র। 'জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয়।' ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণ সূর্যের মতন আর জীব সেই সূর্যের ক্ষুদ্র কিরণকণা। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের বিচ্ছিন্ন এক স্ফুলিঙ্গ।' 'জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম। জ্বলদগ্নি-রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥'

ভগবান চিদ্‌বস্তু, তাঁতে প্রাকৃত বা জড় বলে কিছু নেই। জীবের দেহ জড়বস্তু, তার সম্পর্ক-সম্বন্ধও প্রাকৃত। ভগবান আনন্দময়, জীব অশেষ দুঃখের, অশেষ ক্লেশের আকর। 'সংক্লেশনিকরাকর।' ভগবান মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার অধীন, 'স্বাবিদ্যাসংবৃত।' সুতরাং জীবকে কখনো ঈশ্বর বলে স্পর্ধা কোরো না।' 'যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম। তেই তো পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥'

শুধু কৃষ্ণভজন একভজন করো। গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের অংশভূত শাখাপ্রশাখা পত্রপুষ্প সমস্তই তৃপ্তি লাভ করে। তেমনি সর্বমূল কৃষ্ণের সেবাতেই আর সব দেবদেবীর সেবা হয়ে যায়। 'সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।'

'অসৎক্রিয়া কুটিনাটি ছাড় অন্য পরিপাটি
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপনা আপনা স্থানে পীরিতি সভায় টানে
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥

আপন ভজন পথ তাতে হবে অনুরত
ইষ্টদেবস্থানে লীলা গান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিনু ভাই
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥'

অনন্যভাক হও। হও একান্তভক্ত। অন্যাপেক্ষা রেখো না। তাই বলে অন্য দেবদেবীকেও অবজ্ঞা কোরো না। যে নারায়ণকে ভজনা করে শিবকে নিন্দা করে সে নরকস্থ হয়। শিবকে নারায়ণের অংশবিভূতি মনে করো।

ভব্যলোকেরা বললে, 'জীবকে নারায়ণ মনে করলে দোষ হতে পারে কিন্তু তুমি তো জীব নও, তোমাকে তা মনে করলে দোষ হবে কেন? তোমার আকৃতি-প্রকৃতি কৃষ্ণকে মনে করিয়ে দেয়। তোমার শ্যামকান্তি আর পীতবস্ত্র তুমি ঢেকে রেখেছ। কিন্তু মৃগমদের গন্ধ কি বস্ত্র দিয়ে বেঁধে রাখা যায়? তাই কী করে তুমি তোমার ঈশ্বরস্বভাব লুকোবে? যাকে দেখা মাত্রই লোকে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়, চণ্ডাল-যবন পর্যন্ত হাসে কাঁদে নাচে গায়, তার অলৌকিক শক্তির ব্যাখ্যা কী? তোমার শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ দেখলেই লোকের প্রেমধন মিলে যায়, দূরে যায় রোগ শোক মালিন্য-আবিল্য। যার নামশ্রবণেই পতিতও পবিত্র হয় তাকে স্বচক্ষে দেখে লোকের কী রকম হবে তুমিই বলো।'

'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে॥'

অঙ্গ-শব্দের আরেক অর্থ অংশ। সেই অর্থে অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ প্রভুর দুই অঙ্গ। শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য। সৈন্য কেন? পাষণ্ডদলনের জন্যে। 'পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দ রায়। আচার্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥'

কিন্তু এখন অঙ্গ-উপাঙ্গ কী দেখছি?

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥'

স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ ভিতরে, 'ত্বিষা অকৃষ্ণং' কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত বা গৌরকান্তি বাইরে, আচ্ছাদনে,—এই আমাদের কলিযুগের ভগবান। হেমগৌরাঙ্গী রাধার পীতবর্ণ রূপলাবণ্যে কৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ ঢাকা পড়েছে। সুবুদ্ধি সুমেধারা তাকে কী-ভাবে পূজা করবে, যার অস্ত্র শুধু অঙ্গ আর উপাঙ্গ আর যে সপার্ষদ? পূজা করবে শুধু সঙ্কীর্তনে। শুধু নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথনে-বর্ণনে, কীর্তনে-নর্তনে।

'সঙ্কীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে যেই ধন্য ॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥'

প্রভু সকলকে নামপ্রসাদ দিলেন।

অক্রূরঘাটে বাড়তে লাগল জনতা। দর্শন দাও। মাথার উপরে পা রাখো। চলো আমার বাড়িতে ভিক্ষে নাও।

শুধু লোকের সজ্বট্ট আর নিমন্ত্রণের আড়ম্বর।

একদিন অক্রূরঘাটে বসে প্রভু বিচার করছেন, এই ঘাটে বসে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখেছিল, ব্রজবাসীরা দেখেছিল গোলোক। সমস্ত দর্শন হয়েছিল জলে ডুবে। জলের মধ্যেই বৈকুণ্ঠ-গোলোক।

রাম আর কৃষ্ণকে রথে বসিয়ে অক্রূর কালিন্দীজলে মগ্ন হয়ে সনাতন ব্রহ্ম জপ করতে করতে দেখল দু ভাই সেখানে বসে আছে! এ কী, তারা কি তবে রথের উপর নেই? তাড়াতাড়ি উঠে তীরে গিয়ে দেখল তারা তো রথেই উপবিষ্ট। তবে যে তাদের জলের মধ্যে দেখলাম সে কি মিথ্যে? আবার জলে ডুবল অক্রূর। দেখল অনন্তদেব বিরাজ করছে। তার কোলে ঘনশ্যাম কৃষ্ণ ব'সে।

দ্বাদশী তিথিতে রাত্রে অবগাহন করেছিল বলে নন্দকে বরুণের ভৃত্য ধরে নিয়ে গিয়েছিল বরুণালয়ে। কৃষ্ণ খবর পেয়ে গেল নন্দকে

মুক্ত করে আনতে। সপরিকর বরুণ কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। মুক্ত হয়ে এসে নন্দ গোপসমাজে প্রকাশ করলে সে-কাহিনী। গোপেরা কৃষ্ণকে বললে, আমাদের অমনি কৃষ্ণলোক দেখাও। কৃষ্ণ সকলকে নিয়ে এল অক্রূরঘাটে, বললে, জলে ডুব দাও। জলে ডুব দিয়ে গোপেরা সপরিকর কৃষ্ণভূষিত গোলোক দর্শন করল।

প্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিলেন।

কৃষ্ণদাস চিৎকার করে উঠল। ছুটে এল বলভদ্র। তুলল প্রভুকে। সেবাযত্ন করে প্রকৃতিস্থ করল।

এখান থেকে কৌশল করে প্রভুকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে, তবেই সকলের মঙ্গল। বলভদ্র কৃষ্ণদাসের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। প্রকাশ্যে রাজপথ দিয়ে না গিয়ে গঙ্গাতীরপথ দিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু ব্রজমণ্ডল ছেড়ে যাবেন তো? মকরপূর্ণিমার কথা বলি, বলি প্রয়াগস্নানের কথা। দেখি অনুরোধ রাখেন কি না।

'এ জায়গা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।' বলভদ্র বললে প্রভুকে, 'নিত্য ভিড়, নিত্য গোলমাল, আর নিত্যই নিমন্ত্রণের তাগিদ। চলো আমরা অন্যত্র যাই।'

প্রভু তাকালেন স্নেহনেত্রে। বললেন, 'তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, কষ্ট তো আমারই।'

'কোথায় যাবে?'

'চলো প্রয়াগে যাই, মাঘীপূর্ণিমায় মকরস্নান করে আসি।'

'চলো।' প্রভু সম্মত হলেন।

'যাবে?' বলভদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'ভক্তবাসনা পূর্ণ করতে যাব বৈ কি।' বললেন প্রভু, 'তুমি আমাকে এনে বৃন্দাবন দেখালে, এই ঋণ শোধ হবে না কোনোদিন। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।'

'যে তোমার ইচ্ছা আমি সেই ত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাহাঁই যাইব॥'

নৌকোয় যমুনা পার হলেন প্রভু। বলভদ্র আর ব্রাহ্মণ কিঙ্কর তো আছেই, রাজপুত কৃষ্ণদাস আর মাথুর ব্রাহ্মণ চলেছে সঙ্গে। এরা গঙ্গাতীরে পৌঁছুবার পথ চেনে। সেই পথে পৌঁছিয়ে দিয়ে এরা বিদায় নেবে।

পথশ্রান্তির দরুন প্রভু বসলেন বৃক্ষতলে। দেখলেন কাছেই গরু চরছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এক গোপবালক। অমনি তাঁর মহা-প্রেমাবেশ হল। অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

দশজন অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য যাচ্ছিল পথ দিয়ে। অচেতন দেখে নেমে পড়ল। স্থির করল এই সন্ন্যাসীর কাছে নিশ্চয়ই অনেক ধনরত্ন ছিল, এই চার দস্যু ওকে ধুতুরা খাইয়ে মেরে সব লুট করে নিয়েছে। ধরো, বাঁধো ডাকাতদের! পাঠান সৈন্যরা চার জনকে বেঁধে ফেলল। কোষ থেকে মুক্ত করল তলোয়ার।

কৃষ্ণদাস ভয় পেল না। বললে, 'আমরা নিরপরাধ। এ সন্ন্যাসী আমাদের গুরু, এঁকে আমরা কেন মারতে যাব?'

'তবে এ অসাড় কেন?' জিগগেস করল সেনাপতি, 'কেন এর শ্বাস রুদ্ধ? কেন মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছে?'

মাথুর ব্রাহ্মণও নির্ভয়। বললে, 'এই সন্ন্যাসীর রোগ আছে, মাঝে মাঝে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। একটু অপেক্ষা করুন, ইনি এখুনি উঠে বসবেন। তখন এঁকে জিগগেস করে জানবেন আমরা সত্যিই ডাকাত কি না।'

'তোমাদের বিশ্বাস নেই।'

'বেশ, তবে আমাদের শিকদারের কাছে নিয়ে চলো।' বললে মাথুর ব্রাহ্মণ, 'আমাদের সঙ্গে একশো লোক ছিল, তোমাদের বাদশার কাছে গিয়েছে, সেখানে আমাদের পরিচয় মিলবে। আমাদের উপর অত্যাচার তারা সহ্য করবে না।'

এ ছলনায় একটু বুঝি নরম হল পাঠানেরা। সেনাপতি বললে, 'তোমাদের দুজন পশ্চিমাকে তো সাধু বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ঐ

বাঙালি দুটো কাঁপছে কেন? নিশ্চয়ই ওরা ঠক, বাটপাড়। কাউকে আমরা রেয়াত করব না। তলোয়ারে খণ্ড-খণ্ড করব।'

'ওরা কেন বাটপাড় হতে যাবে?' কৃষ্ণদাস গর্জন করে উঠল: 'বাটপাড় তোমরা, তীর্থবাসীদের টাকা পয়সা লুট করতে এসেছ। কিন্তু সাবধান, এ গ্রামে আমার বাড়ি, আমার অধীনে একশো তুর্কী সৈন্য আছে, দুশো কামান আছে। যদি আমি চেঁচিয়ে ওদের ডাকি ওরা এখুনি এসে পড়বে, তোমাদের অক্ষত ফিরে যেতে দেবে না।'

আর বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন হল না, হরি-হরি বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন প্রভু। প্রেমাবেশে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

'হুঙ্কার করিয়া উঠে, বোলে 'হরি-হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে উর্ধ্ববাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার॥'

পাঠানদের অন্তরে ভয় ঢুকল। ছেড়ে দিল বন্দীদের।

প্রভুকে বললে, 'এই চারজন ঠক তোমাকে ধুতুরা খাইয়ে অজ্ঞান করেছিল, অজ্ঞান করে নিয়ে গিয়েছে তোমার ধনরত্ন। দেখ তো দেখি কত নিয়েছে।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'এরা ঠক হতে যাবে কেন? এরা আমার সঙ্গী, সেবক। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী—আমার আবার ধনরত্ন কোথায়? মৃগীব্যাধিতে আমি মাঝে মাঝে অচেতন হই, তখন এরাই আমার শুশ্রূষা করে।'

মৃগীব্যাধি? তা ছাড়া আবার কী। যা অন্বেষণ করা যায় তাই মৃগ। এ জীবনে অন্বেষণীয় কে? অন্বেষণীয় আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি রাধিকা। সুতরাং রাধিকাই মৃগী। আর প্রিয়বিরহে যে প্রেমজনিত বিকার তা তো ব্যাধিরই নামান্তর।

সেই পাঠানদের মধ্যে এক পরম গম্ভীর পীর ছিল। তার চিত্ত আর্দ্র হল। সে ঈশ্বরের কথা তুললে।

জগৎকারণ পরমেশ্বর নিরাকার অদ্বয়তত্ত্ব, যাকে বলা যায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই পীর স্থাপন করতে চাইল। প্রভু বললেন, 'ও যুক্তি একদেশী। সেই অদ্বিতীয় বস্তুই সবিশেষ সাকাররূপে ভক্তদের কাছে প্রতিভাত। তোমাদের শাস্ত্রেও ভক্তিই শেষ কথা, ভক্তিই পুরুষার্থসার। তোমাদেরও তো কেবলই প্রার্থনা, ভক্তি ছাড়া প্রার্থনা কোথায়? আর ঈশ্বরসেবা, ঈশ্বরপ্রীতি ছাড়া সংসারক্ষয় হবে কিসে?'

পীর বললে, 'তুমি যা বলছ সব সত্য কথা। শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু লোকে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম বোঝে কই?'

ঈশ্বরের সবিশেষত্বই স্বীকার করল পীর। অনুভব করল এই সন্ন্যাসীই ঈশ্বর। পীর কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। প্রভু তার নাম রাখলেন 'রামদাস'।

'সেই ত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর, মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ নাম।
আমি বড় জ্ঞানী—এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি বোল মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সভে কৃষ্ণ কহে, সভার হৈল প্রেমাবেশ॥'

আরো এক পাঠান ছিল, তার নাম বিজুলি খান। অল্প বয়স, রাজবংশের ছেলে। সে 'কৃষ্ণ' বলে পড়ল প্রভুর চরণে। প্রভু তাকে

কৃপা করলেন। পরম ভাগবত হয়ে গেল বিজুলি। নাম হল তার পাঠান বৈষ্ণব।

সোরক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেন প্রভু। মাথুর ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে চাইলেন। তারা বললে, 'তোমার সঙ্গে প্রয়াগ পর্যন্ত যাব। তোমার চরণসঙ্গ আর পাব কোথায়! তা ছাড়া পথে কে কোথায় উৎপাত বাধায় ঠিক কী। বলভদ্র পণ্ডিত তো কথাটি বলতে পারেন না। খালি কাঁপেন।'

প্রভু হাসলেন। চলো তবে প্রয়াগ পর্যন্ত।

যেই প্রভুর দর্শন পাচ্ছে প্রেমে মত্ত হয়ে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন করছে। আর একের থেকে অপরে বিস্তারিত হচ্ছে কৃষ্ণকথা। সমস্ত দেশগ্রাম বৈষ্ণব হয়ে উঠছে। যেমন দক্ষিণে তেমনি পশ্চিমে। 'দক্ষিণে যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। সেই মত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল॥'

প্রয়াগে এসে প্রভু দশ দিন মকর স্নান করলেন। বৃন্দাবনে যেমন কলরব প্রয়াগেও তেমনি। সমান লোকারণ্য।

সমান প্রেমোচ্ছ্বাস। সমান হরিধ্বনি।

'গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥'



৫৮

সেই রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সনাতন আর রূপ আরেক রকম হয়ে গিয়েছে। বিষয়ব্যাপারে বা রাজকাজে আর মন বসছে না। কিন্তু কী করে গুরুভার রাজকার্য ছাড়বে তাও সমস্যা। নবাব যদি টের পায় আস্ত রাখবে না। সনাতন

প্রধান মন্ত্রী আর রূপ খাসমুন্সি বা একান্ত সচিব। সরাসরি চাকরি ছাড়া মানেই তো প্রাণদণ্ড।

কিন্তু চাকরিতে আর স্পৃহা নেই। তা ছাড়া চাকরির ফলে বিস্তর পয়সা হয়েছে। বিষয়ত্যাগ না করলেই বা প্রাণে-মনে ভজন করা যায় কী করে? আর, এই বিষয় নবাবই বাজেয়াপ্ত করুক এও তো অসহ্য।

দুই ভাই কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল, যাতে নির্বিঘ্নে অচিরে চৈতন্যচরণ পেতে পারে। মন্ত্রের সিদ্ধিলাভের জন্যে যে প্রাথমিক অনুষ্ঠান তাকেই পুরশ্চরণ বলে। কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যেহেতু গৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শচীনন্দনই ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৃন্দাবনবিনোদই গৌরসুন্দর।

অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ আর কলিতে পীত। 'ছন্নঃ কলৌ।' প্রহ্লাদ নৃসিংহের স্তুতিতে বললে, কলিতে যিনি আসবেন তিনি হবেন প্রচ্ছন্ন। তার নিজস্ব বর্ণ অন্য বর্ণে ঢাকা থাকবে। ভিতরের রঙ দেখা যাবে না, দেখা যাবে বাইরের কান্তি। রাধার গৌরকান্তিতে ঢাকা শ্যামসুন্দর।

'অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।' ব্রজলীলায় কৃষ্ণ প্রকটিত হল যাতে তার কথা শুনে লোকের ভজনস্পৃহা জাগতে পারে। আর গৌরলীলায় কৃষ্ণ ভজনের আদর্শ দেখিয়ে দিল জীবকে। 'আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে।' 'আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।' আর সেই ভজনের উদ্দেশ্যেই নাম-সঙ্কীর্তন। আপামর প্রেমদান। শুধু জগাই-মাধাইকেই নয়, বাঘ-ভালুক, শিবানন্দের কুকুরকে পর্যন্ত। অস্ত্র নেই, শস্ত্র নেই, শুধু করুণার উল্লাস। অন্য লীলায় করুণা ভগবানের অধীন। এবার মহাবলী করুণা ভগবানকেই অধীন করেছে।

'পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতরি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি।

নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু ॥'

রূপ নবাবের কাছে ছুটি চাইল। কদিন পৈত্রিক বাড়ি মাড়গ্রামে ঘুরে আসি। গৌড়ের দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলায় এই মাড়গ্রাম।

ছুটি মঞ্জুর হল। সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে রূপ নিজের গ্রামে এসে পৌঁছুল। নৌকো ভরা এত ধন নিয়ে সে কী করে, কাকে দেয়? অর্ধেক দিয়ে দিল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সেবায়। বাকি অর্ধেকের অর্ধেক দিল আত্মীয়কুটুম্বকে, আর অবশিষ্ট বিশ্বাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রাখল যদি রাজদণ্ডে জরিমানা দিতে হয়। সনাতনের জন্যে গৌড়ে এক মুদির দোকানে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছে।

নীলাচলে রূপ লোক পাঠাল, প্রভু কখন বৃন্দাবনে রওনা হন আমাকে খবর দেবে। আমি অপেক্ষা করছি।

এদিকে সনাতনের কী অবস্থা?

সনাতন অসুখের ছল করল। কাজে ইস্তফা দিল না, ছুটির দরখাস্তও পাঠাল না, অসুখ হয়েছে বলে বাড়িতে বসে রইল। সরাসরি কাজে ইস্তফা দিলে নবাব নিশ্চয়ই তাকে কারারুদ্ধ করবে, ছুটি চাইলেও মঞ্জুর করবে না দরখাস্ত, ক্রুদ্ধ হবে। আর, নবাবের ক্রোধের ফলই কারাদণ্ড। রাজকার্যে মন নেই এই তো অস্বাস্থ্য। তাই অস্বাস্থ্যের কারণে গৃহকোণে বসে থাকি।

গৌড়েশ্বর হুসেন শা-র প্রধান মন্ত্রী, সনাতন যদি অনুপস্থিত থাকে তবে রাজকাজ চলে কী করে? কী এমন অসুখ, নবাব রাজবৈদ্যকে বললে, যাও, দেখে এস। রাজবৈদ্য এসে বললে, অসুখ ভান মাত্র। সনাতন ভালো আছে, বাড়িতে বসে শাস্ত্রচর্চা করছে।

'বলো কী? আমি নিজে যাচ্ছি।'

আচম্বিতে নবাব সনাতনের বাড়িতে এসে হাজির।

'চুপচাপ বাড়িতে বসে আছ, এ কী ব্যাপার?' নবাব হুমকে উঠল : 'তোমার কাছে বৈদ্য পাঠিয়েছিলাম, সে বললে, দবির খাসের কোনো ব্যাধি নেই। তুমি অকারণে ঘরে বসে থাকলে আমার কাজকর্ম চলে কী করে?'

বিনয়ে অবনত হয়ে সনাতন বললে, 'আমার আর কাজকর্মে রুচি নেই। আমার জায়গায় আর কাউকে বহাল করুন।'

'সে কী? সজ্ঞানে তুমি কাজে অবহেলা করছ?'

'আমি অপরাধী। যদি উচিত মনে করেন শাস্তি দিন আমাকে।' সনাতন বললে করজোড়ে।

'তোমার বড় ভাই রঘুনন্দন দস্যুতা করে বহু প্রজা ক্ষয় করে চাকলা-পরগণা খাস করে নিয়েছে, আমাকে সামান্য খাজনাও দেয় না। তার পর তোমার এই ব্যবহার?'

'যে যেমন দোষ করে তাকে তেমনি শাস্তি দিন।' সনাতন আবার বিনয় করল।

নবাবের মনে হল পালিয়ে যাবার মতলব করছে। বার করছি চালাকি। তখুনি আদেশ দিল, একে নিক্ষেপ করো কারাগারে।

কদিন পরেই উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। নবাব নিজে চলল সৈন্য নিয়ে। সনাতনকে বললে, 'তুমিও আমার সঙ্গে চলো।'

সনাতন বললে, 'মার্জনা করুন। আপনি যদি দেবস্থান কলুষিত করেন তা আমার সহ্য হবে না।'

'বটে?' নবাব বললে, 'কারাগারে একে হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রাখো।'

রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল : 'আমি আর অনুপম বৃন্দাবনে যাচ্ছি প্রভুর চরণবন্দন করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস।' 'তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহাঁ হৈতে।' আরো লিখল : 'মুদির কাছে দশ হাজার মুদ্রা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে বেরিয়ে এস কারাগার থেকে।'

প্রয়াগে এসে শুনল প্রভু এখানে আছেন। রূপ আর তার ছোট ভাই অনুপমের আনন্দের অবধি রইল না। শুনল প্রভু চলেছেন বিন্দুমাধব দর্শনে। এগুলো দুই ভাই। দেখল পথে লক্ষ লোকের জনতা। 'কেহো কেহো হাসে কেহো নাচে গায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহো গড়াগড়ি যায়॥'

ভিড় থেকে দুভাই সরে দাঁড়াল। তারা বুঝি পতিত. তারা বুঝি কলুষদুষ্ট।

বিন্দুমাধব দর্শন করে প্রভুর প্রেমাবেশ হল। উর্ধ্ববাহু হয়ে হরিধ্বনি করতে করতে নাচতে লাগলেন।

দক্ষিণ-ভারতের একজন ব্রাহ্মণ প্রভুর পরিচিত ছিল, সেই প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিল। সেইখানেই রূপ আর অনুপম হাজির হল। দশনে দুইগুচ্ছ তৃণ ধরে দুজনে প্রভুর উদ্দেশে দূর থেকেই পড়ল দণ্ডবৎ হয়ে।

প্রভু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'ওঠো, এস আমার কাছে। কৃষ্ণের করুণা অপরিসীম। তোমাদের বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন।'

'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়-কূপ হৈতে কাড়িল দুইজন॥'

চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার অপ্রিয় যদি সে ভক্তিহীন হয়। আর চণ্ডালও আমার প্রিয় যদি সে আমাতে ভক্তিমান থাকে। সুতরাং সে ভক্তচণ্ডালকেই সৎপাত্র মনে করে দান করবে, তার বস্তুই গ্রহণ করবে, তাকেই পূজা করবে আমার মত।

ভক্তের সামান্য বস্তুও কৃষ্ণ জোর করে কেড়ে খেতে কুণ্ঠা করে না, যদি তা প্রীতিতে মিশ্রিত থাকে। বন্ধু, গৃহ থেকে আমার জন্যে কী এনেছ? সুদামার দিকে ধাবিত হল কৃষ্ণ। দরিদ্র, জীর্ণমলিন বেশ, শ্রীহীন ভিক্ষুক, তাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে পর্যঙ্কশায়িনী প্রিয়াকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করল। কী এনেছ আমার জন্যে?

ভক্তের আনীত অণুমাত্র দ্রব্যও আমি অধিক মনে করি, অভক্তের আনীত ভূরি দ্রব্যেও আমার সন্তোষ নেই। পত্র-পুষ্প ফল-জল—যতই অকিঞ্চিৎ হোক, ভক্তি মিশিয়ে দিলেই আমি তা নিই হাত পেতে। তুমি অধোমুখ হয়ে আছ কেন? বলো কী এনেছ আমার জন্যে? বলে সর্বভূতের অন্তঃকরণসাক্ষী কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পুঁটলিতে হাত দিল। এ কী? চীরবদ্ধ চিপিটক কেড়ে নিল জোর করে। বাঃ, এই তো আমার প্রীতিসাধন উপঢৌকন এনেছ, এতেই আমার তৃপ্তি হোক। বলে এক মুষ্টি আহার করে ফেলল। এমন রুচিকর তৃপ্তিকর স্বাদে রসে সুরভিত আহার্য আমি পাব কোথায়?

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষের ঝুলি থেকে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল জোর করে কেড়ে নিয়ে খান নি প্রভু?

দুজনকেই প্রভু আলিঙ্গন করলেন, চরণ ধরলেন মাথার উপর। তোমরাও যে ভক্তিধনে ধনী। তোমরাও যে তাই আমার হৃদয়গ্রাহ্য।

দুভাই প্রভুকে স্তুতি করল।

'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥'

কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাদাতা কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌরতনু কৃষ্ণকে প্রণাম করি। দয়ালু যিনি নিজের প্রেমসম্পদসুধায় অজ্ঞানমত্ত মানুষকে ভবরোগমুক্ত করেন সেই অদ্ভুতলীলাপরায়ণ পরমপ্রভুর শরণ নিলাম।

প্রভু বললেন, 'সনাতনের কথা বলো।'

'সে তো রাজগৃহে বন্দী হয়ে আছে।' রূপ বললে, 'তুমি যদি উদ্ধার করো তবেই তার উদ্ধার সম্ভব। নচেৎ নয়।'

প্রভু বললেন, 'ভয় নেই। শিগগিরই সনাতন মুক্ত হবে। মিলন হবে আমার সঙ্গে।'

দাক্ষিণাত্য বিপ্র প্রভুকে মধ্যাহ্নকৃত্যে আহ্বান করল। প্রভু

তার নিমন্ত্রণ নিলেন। দুই ভাই রূপ আর অনুপমকে প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র এনে দিল বলভদ্র।

ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছেই প্রভুর আসন স্থির হল। দুই ভাই তার কাছেই বাসা নিল। বিপরীত তীরের আড়েল গ্রাম থেকে দেখা করতে এল বল্লভ ভট্ট। কার এত ভাবভক্তির কথা শুনি, দেখে আসি স্বচক্ষে।

দেখতে এসেই চক্ষুস্থির। এ কে সানন্দসুন্দর শুদ্ধ লাবণ্যপ্রদীপ-মনোহর। তখুনি দণ্ডবৎ করল বল্লভ। প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তখুনি সুরু হল কৃষ্ণকথা, আর কৃষ্ণকথা সুরু হলে সাধ্য কী, প্রেম সংবরণ করো। 'অন্তরে গরগর প্রেম—নহে সংবরণ।'

যেখানে কৃষ্ণকথার সুধানদী নেই, যেখানে সেই নদী-আশ্রিত ভগবদ্ভক্ত সাধু নেই, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর নৃত্যগীতোৎসবরূপ পূজা নেই, সেস্থান সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোক হলেও কদাচ তার সেবা কোরো না।

শুধু কৃষ্ণকথা বলো।

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কহো কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইহ আর ॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে ॥'

প্রভুকে বল্লভ নিমন্ত্রণ করল নিজগৃহে।

এই দুই ভাইকে দেখুন। রূপ আর অনুপম। অনুপমেরও আরেক নাম বল্লভ।

বল্লভ এগিয়ে এল, দুভাই দূরে পালাল। বললে, 'আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।'

সে কী কথা! বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

দুভাইয়ের দৈন্য দেখে প্রভু কিন্তু আনন্দিত। বললেন, 'হ্যাঁ,

ঠিকই বলেছে, তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি এদের ছুঁয়ো না। এরা হীন জাতি।'

'হীন জাতি!' বল্লভ বিস্ময় মানল: 'কিন্তু এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম। যার জিভে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে সে অধম হয় কী করে, অস্পৃশ্য হয় কী করে?' 'দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্তন। এ দুই অধম নহে, হয়ে সর্বোত্তম॥'

'হ্যাঁ, তুমি আমার প্রাণের কথাই বলেছ। যে নীচকুলে জন্মেছে, সদ্ভক্তির দীপ্ত অগ্নিতে তার সমস্ত হীনতা দগ্ধ হয়ে গেছে। ভক্তিহীন বেদবিৎ-এর চেয়েও সে শ্লাঘ্য। যার ভগবানে ভক্তি নেই তার কৌলীন্য বা শাস্ত্রজ্ঞান বা তার জপতপ সমস্ত নিরর্থক। প্রাণহীন দেহের বসনভূষণের মতই অসার।'

কর্ম বলো, যোগ বলো জ্ঞান বলো, ভক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ভক্তির সংস্পর্শ ছাড়া তারা ফল দিতে সমর্থ নয়। এমন যে ব্রহ্মজ্ঞান তা ভক্তিবর্জিত হলে মোক্ষও এনে দিতে পারে না। নিষ্কাম-কর্মও ঈশ্বরেই অর্পিত হওয়া চাই। তপস্বী হোক মনস্বী হোক দানশীল হোক সদাচারী হোক সর্বপ্রয়াস ঈশ্বরে না প্রেরিত হলে মঙ্গল কোথায়। শুধু তীর্থস্নানে গয়াশ্রাদ্ধে বেদপাঠে জপেতপে যমনিয়মে জ্ঞানেধ্যানে শ্রেয়োলাভ হবে না যদি না সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে শরণাগতি থাকে। যারা শুধু জ্ঞানের জন্যে শাস্ত্রাভ্যাস করে তারা শুধু স্থূল তুষই আঘাত করছে, এককণা তণ্ডুলও পাচ্ছে না সংগ্রহ করতে। ওঁ সা মুখ্যা। ভক্তিই মুখ্যা, অন্যনিরপেক্ষা, একান্ত স্বতন্ত্রা। দুরত্যয়া ঈশ্বরমায়া। মায়ামুক্তির যত সাধন আছে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ভক্তি, শরণাপত্তি। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

কর্মী বলো যোগী বলো, সবাই ফল চায়। কর্মী চায় সুখ জ্ঞানী চায় মোক্ষ যোগী চায় সাজুয্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই ফলদাতা ভগবান। আর ভগবান বশীভূত কিসে? ভক্তিতে, সেবায়, অনুরাগে। ভক্তিই দেখায়, কাছে নিয়ে যায়, আস্বাদ করায়। নিত্য অব্যক্ত ভগবান

ভক্তের টানে নিজের শক্তিতেই দৃষ্ট হন, সন্নিহিত হন, উপলব্ধ হন। আর কোনো উপায় নেই। না চক্ষু না শ্রোত্র না তর্ক না শাস্ত্র তাঁকে জানাতে পারে। তিনি যাকে বরণ করবেন সেই তাঁকে জানতে পারবে। সন্দেহ কী, শুদ্ধ ভক্তকেই তিনি বরণ করবেন। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন এব লভ্যঃ।'

প্রভুর প্রেমাবেশ ও ভক্তিপ্রভাব দেখে ভট্ট বিস্মিত হল। নৌকো করে ভিক্ষা দিতে নিয়ে চলল নিজগৃহে।

কিন্তু, হায়, হায়, এ কী হল? শ্যামল যমুনার চিক্কণ জল দেখে প্রভু হুঙ্কার করে ঝাঁপ দিলেন। যমুনা দেখে কৃষ্ণকে মনে পড়ল। রাধাবেশে ঝাঁপ দিলেন।

ভট্ট কাঁপতে লাগল। প্রভুর স্বগণেরা সঙ্গে ছিল, তুলল প্রভুকে। কিন্তু এ কি, নৌকোতে উঠেই প্রভু নাচতে লাগলেন। নৌকো টলমল করতে লাগল, জল উঠল ঝলকে-ঝলকে। সবাইকে নিয়ে নৌকো বুঝি এবার ডোবে। প্রভু চাইছেন ধৈর্য ধরতে, কিন্তু দুর্বার উদ্ভট প্রেম মানছে না শাসন। কোনোরকমে ঘাটে এসে নৌকো লাগল।

সঙ্গে থেকে সাবধানে ভট্ট প্রভুকে মধ্যাহ্নস্নান করিয়ে নিজগৃহে নিয়ে এল। দিব্যাসনে বসিয়ে পা ধুইয়ে চরণামৃত সবংশে মাথায় ধরল। পরাল নতুন কৌপীন আর বহির্বাস। দীপে-ধূপে গন্ধে পুষ্পে প্রভুর পূজা করল—মহাপূজা। ভট্টাচার্যকে দিয়েই রান্না করানো হল, সস্নেহ যত্নে ভিক্ষা করাল প্রভুকে। রূপ ও অনুপম পেল আবার প্রভুর অবশেষ পাত্র। মুখবাস দিয়ে শয়ন করাল প্রভুকে। পা টিপতে বসল। প্রভু বললেন, 'এবার তুমি খেতে যাও।'

ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় এল দেখা করতে।

'কৃষ্ণে মতি স্থির থাকুক।' প্রভু আশীর্বাদ করলেন। 'বলো কৃষ্ণকথা।'

রঘুপতি বিহ্বল হল আনন্দে। বললে, 'ভব-ভীত মানুষ শ্রুতি স্মৃতি মহাভারত ভজন করে করুক, আমি শুধু নন্দকে বন্দনা করি।'

'নন্দকে ?' কে জিগগেস করল।

'হ্যাঁ, নন্দেরই অলিন্দে পরব্রহ্ম বিরাজ করছেন।' 'অহমিহ নন্দং বন্দে। যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।'

প্রভু বললেন, 'আরো বলো।'

'কাকেই বা বলব, কে-ই বা বিশ্বাস করবে, যমুনাতটে পরব্রহ্ম অল্পবয়স্কা গোপবধূদের সঙ্গে উপপতিরূপে খেলা করছে!'

প্রভু প্রশ্ন করলেন, 'উপাধ্যায়, কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মানো?'

'কৃষ্ণের শ্যামরূপকেই শ্রেষ্ঠ মানি।' 'শ্যামমেব পরং রূপং।'

'কৃষ্ণের কোন বাসস্থান শ্রেষ্ঠ?'

'বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ।' 'পুরী মধুপুরী বরা।'

'বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর—কৃষ্ণের কোন বয়স শ্রেষ্ঠ?'

'কৈশোর।' 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং।' কৈশোরেই কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি।

'আর রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী?'

'রসের শ্রেষ্ঠ মধুর।' 'আদ্য এব পরো রসঃ।'

'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥'

প্রেমাবেশে প্রভু রঘুপতিকে আলিঙ্গন করলেন। এত প্রেম কি মানুষে সম্ভব? রঘুপতি স্থির করল এই সন্ন্যাসীই স্বয়ং কৃষ্ণ। 'মনুষ্য নহে, ইঁহো কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার।'

বল্লভের দুই ছেলে এসে প্রণত হল। ভেঙে পড়ল গ্রামের লোক। আমার বাড়ি চলুন—আমার বাড়ি। নিমন্ত্রণের হুল্লোড় পড়ে গেল। বল্লভ বিরক্ত হয়ে বললে, 'এখান থেকে নিমন্ত্রণ করলে চলবে না। যদি ইচ্ছে থাকে, প্রয়াগে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে।'

তখন নিবৃত্ত হল জনতা।

বল্লভ প্রভুকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল প্রয়াগে। সেখানেও লোকারণ্য। নির্জনতার আশায় প্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে এলেন। রূপকে নিলেন

সঙ্গে, শিক্ষা দিতে বসলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত। রামানন্দের সঙ্গে বসে যত মীমাংসা করেছিলেন—সমস্ত। পরে বললেন, 'এবার বৃন্দাবনে যাও।'

শোনো তবে ভক্তিরসের লক্ষণ।

ভক্তিরসের সমুদ্র গম্ভীর, সীমাশূন্য। তুমি শুধু এর এক বিন্দু আস্বাদ করো। জীব সূক্ষ্মতম বস্তু, সংখ্যায় অনন্ত। স্বীয় কর্মফলে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করছে। সে ঈশ্বরের শাসনাধীন। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। জীবের মধ্যে আবার দু রকম ভেদ—স্থাবর আর জঙ্গম। জঙ্গমে আবার তিন রকম ভেদ—জলচর, স্থলচর, তির্যক। মানুষ স্থলচরের মধ্যে। সমগ্র জীবমণ্ডলের তুলনায় অত্যল্প। আবার মানুষের মধ্যেও কত কম লোক বেদনিষ্ঠ। যারা বেদনিষ্ঠ অর্থাৎ যারা বেদ মানে, তাদের মধ্যে অর্ধেক শুধু মুখে মানে, প্রাণে মানে না, অর্থাৎ বেদনির্দিষ্ট কর্ম করে না, বরং বেদনিষিদ্ধ পাপকর্ম করে। যারা বেদবিহিত অনুষ্ঠান করে, তাদের মধ্যে জ্ঞানীই বা ক'জন? কোটি কর্মনিষ্ঠের চেয়ে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ মানলেও ভক্তিহীন থাকতে পারে না। জ্ঞানীও ভক্তির জোরেই ব্রহ্মের সঙ্গে সাজুয্য চায়।

কোটি-কোটি জ্ঞানীর মধ্যে যদি একজন মাত্র মুক্ত হয়! আর কোটি মুক্ত মধ্যে যদি একজন মাত্র কৃষ্ণভক্ত হয়! তা হলেই দেখ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কত সামান্য। 'দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

কৃষ্ণভক্ত কী রকম?

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তার নিজসুখের বাসনা নেই। তাই সে শান্ত, অচঞ্চল। যারা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী তারা অশান্ত। ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরুকৃপায় বা কৃষ্ণকৃপায় ভজনাকাঙ্ক্ষা পেয়ে যায়। শুধু মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তির উৎস।

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥'

মহৎকৃপা ছাড়া কিছু হবার নয়। 'মহৎ-কৃপা বিনা কোন ধর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥' আর এই মহৎ কৃপা দুই রূপে অভিব্যক্ত হয়,—হয় গুরুরূপে, নয় অন্তর্যামিরূপে। 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥' অন্তর্যামী বা চৈত্ত্যগুরুর ইঙ্গিত জীব সহজে বুঝতে পারে না, তাই কৃষ্ণ সাধারণত মহান্ত বা গুরুরূপে জীবকে কৃপা করে। 'জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥'

ভাগ্যবান হব কিসে? সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ করে মহৎকৃপা আকর্ষণ করব। আর সেই মহৎকৃপার ফলে কৃষ্ণভক্তি জাগবে। যদি সেই ভজনপ্রবৃত্তি জাগে, তবে তা ভাগ্য ছাড়া আর কী।

তার পরে সেই বীজে জলসেচন করো। শ্রবণকীর্তনই সেই জলসেচন। জলে লতার বৃদ্ধি। শ্রবণকীর্তনেই ভজনেচ্ছা বলবতী।

'মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥'

বীজ থেকে অঙ্কুর। অঙ্কুর থেকে লতা। জল সেচনে বাড়তে-বাড়তে লতা কারণসমুদ্র, ব্রহ্মলোক ও পরব্যোম ভেদ করে একেবারে কৃষ্ণলোকে গোলোক-বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়, কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে—বৃক্ষকে আশ্রয় করে লতা ক্রমশই বিস্তারিত হতে থাকে, পুষ্পিত ও ফলান্বিত হয়। কী ফল ধরে? আর কী! প্রেমফল।

দেখো, যেন বৈষ্ণবাপরাধ করে বোসো না। বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অনাদর করা, ক্রোধ করা, বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করা—এই সব বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ যেন মত্ত হাতি, অনায়াসেই ভক্তিলতার মূলোচ্ছেদ করে দিতে পারে। সুতরাং সাবধানতার বেড়া দাও। যাতে মূল না ছেঁড়ে, পাতা না শুকোয়। নিরন্তর জলসেকে লতাকে সজীব রাখো।

আরো দেখো—লতার অঙ্গ থেকে উপশাখা না ওঠে। উপশাখা কী? ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা উপশাখা। নিষিদ্ধাচার, প্রাণিহিংসা, লাভ-প্রতিষ্ঠা কুতর্ক-কুটিলতা উপশাখা। উপশাখা জন্মালে লতার পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কামনাই দুর্বাসনা। আর দুর্বাসনাই দুঃসঙ্গ।

যদি উপশাখা জন্মাচ্ছে দেখ, সূচনাতেই তা ছিন্ন করবে। বাড়তে দেবে মূলশাখাকে। যত জলসেক সব এই মূলশাখায়।

তার পরেই কালক্রমে লতায় ফল ধরবে, ফল পাকবে। সে-ই তো প্রেমফল। পরম ফল।

'প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।' সেই ফলই পরম পুরুষার্থ। তার কাছে আর চার পুরুষার্থ,—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তৃণতুল্য।

যে একবার কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেয়েছে, তার কাছে, অষ্টসিদ্ধি বা সমাধি দূরের কথা, ব্রহ্মানন্দও স্পৃহনীয় নয়।

যে শুদ্ধভক্ত, তার কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বাঞ্ছা নেই, কৃষ্ণ ছাড়া অন্য পূজা নেই। তার সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। চোখে বিগ্রহদর্শন, কানে নামগুণলীলাশ্রবণ, নাকে প্রসাদী তুলসী ও ফুলের ঘ্রাণগ্রহণ, জিভে নামকীর্তন, ত্বকে গন্ধমাল্যের স্পর্শানুভব, হাতে মন্দিরমার্জন, পায়ে তীর্থভ্রমণ, মনে লীলাস্মরণ, বুদ্ধিতে কৃষ্ণসঙ্কল্পগ্রহণ, অহঙ্কারে কৃষ্ণ-দাসত্বের অভিমানপোষণ আর চিত্তে কৃষ্ণান্বেষণ। যেহেতু কৃষ্ণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁর সেবা করবে। কৃষ্ণানুকূল্যে ইন্দ্রিয়ের যে সেবা তাই ভক্তি। স্বসুখবাসনাহীনা কৃষ্ণসুখসাধিনী সেবা। অবিচ্ছিন্না অনিমিত্তা অব্যবহিতা।

ব্রজগোপীরাই মধুররসের মুখ্য ভক্ত। তাদের রতিই কেবলা রতি, শুদ্ধমাধুর্যময়ী, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলেও তাদের প্রীতি সঙ্কুচিত হয় না। কৃষ্ণ পরিহাস করলে রুক্মিণীর ভয় হয়, কৃষ্ণ বুঝি তাকে ত্যাগ করবে। ব্রজগোপীদের সেই ভয় নেই। কৃষ্ণের মুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড

দেখেও যশোদা সঙ্কুচিত হল না, আপন গর্ভের পুত্র মনে করেই বুকে চেপে ধরল, সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানকে আড়াল করল তার বাৎসল্য। কৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য জেনেও শ্রীদামের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হয় নি। অনায়াসে কৃষ্ণকে কাঁধে করেছে, কখনো বা নিজেই চড়েছে কৃষ্ণের কাঁধে। বনপথে চলতে চলতে শ্রান্ত রাধিকা কৃষ্ণকে বললে, আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমাকে বহন করে নিয়ে চলো। কৃষ্ণ বললে, বেশ, আমার কাঁধে ওঠ। রাসলীলায় কৃষ্ণের অনেক ঐশ্বর্য দেখেছে রাধা, তবু তার মধুরারতি সঙ্কুচিত হয় নি। কে বলে কৃষ্ণ ঈশ্বর, রাধার কাছে সে তার প্রাণবল্লভ ছাড়া কিছু নয়।

ঈশ্বরে নিষ্ঠাবুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখ-সহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা আর জিহ্বোপস্থের জয়ই ধৃতি। শান্তিরসের কাজ কী? 'কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ।' শান্ত অকুতোভয়, স্বর্গ-অপবর্গ আর নরক সমান দেখে। কিন্তু তার কৃষ্ণে মমত্ববোধ নেই। শুধু তার কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান। দাস্যে সম্ভ্রমগৌরব। অধিকন্তু সেবা। সখ্যে দাস্যের চেয়ে মমতা বেশি। পরস্পরে অপার্থক্য। সখ্য বিশ্রম্ভ-প্রধান। বাৎসল্যে মমতা-আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন। মধুরে এ সমস্ত তো আছেই, সর্বোপরি আছে কান্তভাবে অঙ্গদানসেবা। মধুরেই সর্বভাবের সমাহার। 'এই মত মধুরে সব ভাব-সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥'

শিক্ষাদানের পর প্রভু বললেন, 'আমি এবার কাশী যাব।'

রূপ আর অনুপম সঙ্গী হতে চাইল। প্রভু বললেন, 'বলেছি, তোমরা বৃন্দাবনে যাবে। সেখানে কিছু দিন কৃষ্ণভজন করো। পরে নীলাচলে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলবে।'

রূপকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে দিলেন।

প্রভু নৌকোয় উঠলেন। রূপ মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

রাতে চন্দ্রশেখর স্বপ্ন দেখল প্রভু আসছেন। ভোর হতেই সে

পথে বেরুল, আগ বাড়িয়ে মিলবে প্রভুর সঙ্গে। কিছুদূর এগুলেই দেখতে পেল—ঐ প্রভু। পায়ে লুটিয়ে পড়ল চন্দ্রশেখর।

নিজগৃহে নিয়ে গেল। তপন মিশ্র বললে, 'যেখানে খুশি থাকো কিন্তু ভিক্ষা একমাত্র আমার ঘরেই করতে হবে।'

'তাই করব।' বললেন প্রভু, 'কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোথাও একত্র আহার করব না।'

দিন পাঁচ-সাত তো মোটে থাকবেন। স্থায়ীভাবে তাই তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণই স্বীকার করে নিলেন। এখানে সন্ন্যাসীরা কেউ আসবে না। অন্য কেউ নিমন্ত্রণ করতে এলে বলা যাবে আগে থেকে আবদ্ধ হয়ে আছি।



৫৯

কারাগারে সনাতনের কাছে রূপের চিঠি এসে পৌঁছুল।

প্রহরীকে বললে, 'তুমি জিন্দাপীর, সিদ্ধ মহাপুরুষ। কেতাবে-কোরানে তোমার অগাধ জ্ঞান। এত বড় ভাগ্যবান কজন আছে!'

রাজমন্ত্রী প্রশংসা করছে, প্রহরীর চিত্ত আলোড়িত হল।

'যদি কারাগার থেকে কাতর কোনো বন্দীকে মুক্ত করে দাও তবে ভগবানও তোমাকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন।' প্রার্থনাপূর্ণ চোখে তাকাল সনাতন: 'তুমি সাধনসিদ্ধ, এ কি আর তোমার অজানা?'

'কী করতে হবে বলুন।'

'মনে আছে আগে আগে তোমার অনেক উপকার করেছি, তুমি এবার তার কিঞ্চিৎ শোধ দাও। আমাকে ছেড়ে দাও, খালাস দিয়ে

দাও।' সনাতন কাছে সরে এল, গলা নামিয়ে বললে, 'তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দেব। একসঙ্গে তোমার পুণ্য আর অর্থ দুইই লাভ হবে।'

'কিন্তু রাজাকে বড় ভয়।' প্রহরীও গলা নামাল।

'কিন্তু কে জানে, রাজা হয়তো যুদ্ধ থেকে ফিরেই আসবে না, মারা পড়বে।'

'যদি ফিরে আসে?'

'বলবে প্রাতঃকৃত্য করতে গঙ্গার পারে গেল আর অতর্কিতে ঝাঁপ দিল নদীতে। অনেক খুঁজলাম, সন্ধান পেলাম না। হাতে বেড়ি ছিল, সাঁতার দিতে পারে নি, জলের অতলেই ডুবে মরেছে। আমি মরে গেছি ভেবে রাজা আর আমাকে শাস্তি দেবে না। শোনো, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি এদেশের ত্রিসীমানায়ও থাকব না, দরবেশ হয়ে মক্কায় চলে যাব।'

তাতেও প্রহরীর মন উঠল না।

'বেশ, সাত হাজার দিচ্ছি।' বললে সনাতন, 'বণিকের দোকানে গচ্ছিত আছে টাকা। তুমি আমাকে নিয়ে চলো তার কাছে। আগে টাকা গুনবে, পরে আমাকে ছাড়বে।'

প্রহরীর মন টলল। রাশীভূত মুদ্রা।

সনাতনকে ছেড়ে দিল। হাতের বেড়ি কেটে দিল। রাতারাতি গঙ্গা পার হয়ে গেল সনাতন।

প্রভুর প্রিয় পার্ষদ সনাতন মিথ্যাকে আশ্রয় করছে, মুক্তির জন্যে ঘুষ দিতেও বাধল না? এ সংসারে গৌরাঙ্গচরণই সত্য। সে চরণ-প্রাপ্তির যা কিছু প্রতিকূল যে কোনো উপায়ে হোক, ছলে-বলে-কৌশলে, উত্তরণ করাই মানুষের একমাত্র সত্যধর্ম। তখন মিথ্যাও সত্যসুন্দর। মায়িক সংসারে মায়াবন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে মিথ্যাবচন বা উৎকোচ মিথ্যা নয়, অসাধুতা নয়। বরং এক্ষেত্রে লৌকিক সত্য রক্ষা করাই তমোধর্ম।

'কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম ॥'

যা কিছু কৃষ্ণভক্তির বাধা, এমন কি পুণ্যকর্মও বর্জনীয়। নিজের সুখাশাতেই লোকে পুণ্য করে, সুতরাং যা স্বসুখসন্ধিৎসু তাই কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল। আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশেই লোকের পাপকর্ম। সুতরাং সেখানেও স্বসুখবাসনা। সুতরাং তাও কৃষ্ণভক্তির বিরুদ্ধ। কৃষ্ণ কিসে সুখী হবে—পুণ্যে-পাপে সে জিজ্ঞাসা কোথায়? অতএব 'পুণ্য যে সুখের ধাম, না লইও তার নাম, পাপ-পুণ্য দুই পরিহরি ॥'

নিরিবিলি পথ নিল সনাতন। সঙ্গে চাকর ঈশান। পাতড়-পর্বতে এসে উঠল। সেখানকার ভুঁইয়াকে বললে, 'আমাদের পার করে দিন।'

গুনতে পারত ভুঁইয়া। গুনে দেখল এদের সঙ্গে আটটা মোহর আছে। খুশি মনে বললে, 'স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করো, রাত্রে লোক দিয়ে পার করে দেব।'

স্নানাহার সারল দুজনে। এত সম্মান সদ্ব্যবহার কেন, সন্দেহ হল সনাতনের। আমাকে তো ওর চেনবার কথা নয়, নিতান্ত দরিদ্রবেশ ধরে আছি, তবে কেন এত আপ্যায়ন? এ আবার কোনো বিপদের ছদ্মবেশ নয় তো?

ঈশানকে ডেকে জিগগেস করল, 'তোমার কাছে কি কোনো লোভনীয় জিনিস আছে? টাকা পয়সা?'

ঈশান বললে, 'সাতটা মোহর আছে।'

'এই কাল-যম সঙ্গে এনেছ কেন? দাও, আমাকে দাও।'

সনাতনের হাতে সাত-সাতটা মোহর দিয়ে দিল ঈশান।

সেই মোহর নিয়ে সনাতন ভুঁইয়ার কাছে গেল। বললে, 'এই সাতটা মোহর সঙ্গে ছিল, তাই আপনাকে সম্মানমূল্য দিচ্ছি। আমাদের পার করে দিন। আপনার পুণ্য হবে।'

'সাত নয়, আটটা মোহর আছে।' ভুঁইয়া বললে।

'আটটা ?'

'তা থাক গে।' ভুঁইয়া হাসল: 'আজ রাত্রে তোমাদের খুন করে মোহর সংগ্রহ করব—এই রকম সঙ্কল্প ছিল। তার দরকার হল না। তুমি নিজের থেকেই দান করতে এসেছ। বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাকে নরহত্যার পাপ থেকে। শোনো, এই মোহর আমি নেব না, পাপের চেয়ে পুণ্যেই আমার এখন লোভ হচ্ছে। আমি লোক দিচ্ছি, তোমাকে পর্বত নির্বিঘ্নে পার করিয়ে দেবে।'

মোহর কিছুতেই ফিরিয়ে নেবে না সনাতন। বললে, 'এ শত্রু আমার সঙ্গে থাকলে দস্যুর হাতে আমি মারা যাব। এ মোহর আপনি গ্রহণ করে আমার প্রাণরক্ষা করুন।'

অগত্যা ভুঁইয়া নিল সেই সাত মোহর। সনাতনের জন্যে চার জন দেহরক্ষী নিযুক্ত করল। এরা বনপথে আপনার সঙ্গী হবে।

পর্বত পার হয়ে এসে সনাতন ঈশানকে জিগগেস করলে, 'তোমার কাছে আর কিছু আছে ?'

ঈশান বললে, 'শেষ সম্বল আরেকটি মোহর আছে।'

'ওটি তুমি নাও। ওটি নিয়ে ফিরে যাও দেশে।'

ঈশান কাঁদতে লাগল।

সজলচোখে সনাতন বললে, 'আমি কাঙাল হয়ে একা-একা যাব। আমি নিঃসঙ্গ। আমি অকিঞ্চন।'

ঈশান ফিরে গেল।

দীনহীনের মত চলল সনাতন। 'তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিল একলা। হাতে করোয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা।'

নির্ভয়, যেহেতু কৃষ্ণেই আমার আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণকেই আমি রক্ষা-কর্তারূপে বরণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

শরণাগত আর অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। যাতে কৃষ্ণের প্রীতি সেই অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প, যা কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল তার বর্জন। কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস। রক্ষাকর্তারূপে একমাত্র

কৃষ্ণকেই বরণ। আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণ। আমি আর্ত্ত আতুর অভক্ত, হে কৃষ্ণ, তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নেই, এই দৈন্য বা কাতর্য জানানো। এই ছয় লক্ষণেই শরণাগতি চিহ্নিত।

সনাতন শরণাগত। সনাতন অকিঞ্চন। সংসারে নিস্পৃহ, কৃষ্ণসেবার জন্যেই সংসারত্যাগী।

'আমার শরণাপন্ন হয়ে যে একবার মাত্র যাচ্ঞা করে, হে ভগবান, আমি তোমার হলাম', বলছেন ভগবান, 'আমি তাকে সর্বদা অভয় দিয়ে থাকি।'

'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান॥'

নিজের শক্তির জোরে সাধ্য কী অভিমানমায়া অতিক্রম করতে পারো। একমাত্র ভগবানে শরণাগত হলেই মায়ার প্রভাব থেকে মিলবে অব্যাহতি। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

হাজিপুরে এসে পৌঁছুল সনাতন। এক উদ্যানের পাশে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিল। আপন মনে করতে লাগল হরিনাম।

হাজিপুরেই থাকে শ্রীকান্ত, সনাতনের ভগ্নীপতি। বাদশা গৌড়েশ্বরের ঘোড়া জোগানের কাজ করে। কাছেই হরিহরছত্রের মেলা বসে, সেখান থেকে ঘোড়া কিনে গৌড়ে চালান দেয়। তিন লাখ টাকা পুঁজি।

হরিনাম শুনে আকৃষ্ট হল শ্রীকান্ত। এ কী, সনাতন না? রাজৈশ্বর্যে পালিত দেহের এ অবস্থা? কী হয়েছে?

গোপনে শ্রীকান্তকে সমস্ত বললে সনাতন। প্রভুর জন্যে কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি।

'কিন্তু এ তোমার কী পোশাক? চলো আমার ঘরে, কদিন বিশ্রাম করো। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মুখখানি ভদ্র করো। ছাড়ো এই ধূলিসজ্জা।' শ্রীকান্ত পিড়াপিড়ি করতে লাগল।

সনাতন হাসল, বললে, 'এখানে থাকব না, কাশী যাব। দয়া করে আমাকে গঙ্গা পার করে দাও।'

শ্রীকান্ত দেখল এ আরেক রকম সনাতন। বেশে-বাসে ভদ্রে-সভ্যে স্পৃহা নেই। ঈশ্বর-ভাবনাই তার একমাত্র আচ্ছাদন। ঈশ্বর-চিন্তনই তার একমাত্র আহার। ঈশ্বরনির্ভরই তার একমাত্র আনন্দ।

শ্রীকান্ত সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়ে দিল। শীতত্রাণ ভোট-কম্বল দিল একখানা।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল কাশী। শুনল প্রভু এইখানেই আছেন। কোথায়, কার বাড়িতে? খুঁজে পেতে জানতে আর বাকি রইল না—চন্দ্রশেখরের বাড়িতে।

পথ চিনে চিনে চন্দ্রশেখরের বাড়ির দরজায় এসে বসল সনাতন। কে-না-কে এক ভিখিরি এসেছে ভিক্ষের জন্যে, কেউ লক্ষ্যের মধ্যে আনল না।

বাড়ির ভেতর থেকে প্রভু বলে উঠলেন: 'দেখ তো এক বৈষ্ণব বুঝি দ্বারপ্রান্তে এসে বসেছে। তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

চন্দ্রশেখর বাইরে বেরুল। কই, কোনো বৈষ্ণব নেই তো।

'কাউকে দেখতে পেলে না?'

'একজন দরবেশ বসে আছে।'

'ঐ দরবেশকেই নিয়ে এস।' প্রভু আগ্রহ দেখালেন।

চন্দ্রশেখর নিয়ে এল সনাতনকে। অঙ্গনে এসে দাঁড়াতেই প্রভু ছুটে এসে তাকে আলিঙ্গন করে ধরলেন।

'আমাকে ছুঁয়ো না। ছুঁয়ো না আমাকে।' কেঁদে উঠল সনাতন: 'আমি পতিত, আমি অধম, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য।'

প্রভু তাকে তাঁর পাশে বসালেন, নিজ হাতে তার গা মুছে দিলেন, বললেন, 'নিজে পবিত্র হবার জন্যে তোমাকে স্পর্শ করছি। ভক্তিবলে তুমি সমস্ত বিশ্ব পবিত্র করতে পারো। যে কৃষ্ণচরণে

মন-প্রাণ চেষ্টা বাক্য অর্থ অর্পণ করেছে, সে নীচজাতীয় হলেও ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, হোক না সে ব্রাহ্মণ গুণগর্বিত বহুমান। ভক্তি যার নেই, সে পরকে দূরের কথা, নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। তাই তোমাকে দেখতে দাও, ছুঁতে দাও, গাইতে দাও তোমার গুণগান।'

'প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥'

ভক্তের দর্শনই চক্ষুর ফল, ভক্তগাত্রসঙ্গই দেহের ফল, ভক্তের গুণকীর্তনই জিহ্বার ফল। জগতে ভক্তই সুদুর্লভ। 'সুদুর্লভা ভাগবন্তা হি লোকে।'

'কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করলেন।' আশ্বাস দিলেন প্রভু।

'আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি।' বললে সনাতন, 'তুমিই আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছ।'

প্রভু তপনকে আদেশ দিলেন, ক্ষৌরকর্ম করিয়ে ভদ্র বানিয়ে দাও।

চন্দ্রশেখর নতুন বস্ত্র দিল। তা নিল না সনাতন। তপন নিয়ে এল তার বাড়ি, প্রভুর পাত্রশেষ নিবেদন করল সনাতনকে। এই মলিন বেশ ছেড়ে একখানা নতুন বস্ত্র পরুন, তপন অনুরোধ করল।

সনাতন বলল, 'তোমার পরিহিত পুরোনো একখানা ধুতি দাও, নতুনে আমার রুচি নেই।'

পুরোনো ধুতি দিলে তা ছিঁড়ে বহির্বাস ও ডোর কৌপীন করে পরল সনাতন।

মহারাষ্ট্রী বিপ্র বললে, 'আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন, আমার বাড়িতে ভিক্ষে করবেন প্রত্যহ।'

সনাতন বললে, 'না, আমি মাধুকরী করব, ব্রাহ্মণের ঘরে রোজ-রোজ ভিক্ষে নেব না। কেন ক্ষতিগ্রস্ত করব ব্রাহ্মণকে? কেন

তার উদ্বেগের কারণ হব? আর আমার অভিমানের শেষ যদি এখনো কিছু থাকে তার অবসান হবে।'

কিন্তু বারে-বারে প্রভু তার কম্বলখানার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? বোধ হয় তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। যে মাধুকরী করে খাবে, তার গায়ে তিন টাকার কম্বল মানায় না। তার বৈরাগ্যধর্মের হানি হয়।

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে সনাতন, দেখল কে একজন কাঁথা ধুয়ে শুকোতে দিয়েছে। তাকে বললে, 'ভাই, তুমি আমার কম্বলখানা নিয়ে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথাখানা আমাকে দাও।'

কাঁথার বদলে কম্বল! লোকটা তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল।

কাঁথা গলায় দিয়ে সনাতন দাঁড়াল এসে প্রভুর কাছে। প্রভু সব বুঝলেন, বললেন, 'কৃষ্ণ তোমার বিষয় ভোগ খণ্ডে দিয়েছেন। সদ্বৈদ্য রোগের অবশেষও রাখে না।' 'রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ ভোগ।'

সনাতন বসল ঘনিষ্ঠ হয়ে শিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে। এত দিন গ্রাম্য ব্যবহারে বিষয় ব্যাপারে দিন কাটালাম, আমাকে যদি উদ্ধার করলেন, এবার তবে আমার কর্তব্য কী বলে দিন। আমি কে, তাপত্রয় আমাকে কেন জীর্ণ করছে, কিসে আমার মঙ্গল? সনাতনের এই তিন সনাতন প্রশ্ন।

'তুমি ঠিকই জানো, তোমাতে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা।' বললেন প্রভু, 'তবু তুমি যে জিজ্ঞাসা করছ এ শুধু তোমার জ্ঞানকে দৃঢ়তর করবার জন্যে। সাধুদের এই রীতি। জ্ঞানকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই তাদের জিজ্ঞাসা।'

ভাগবতধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার জন্যে যাদের মতি নির্বন্ধিনী অর্থাৎ আগ্রহশালিনী, তাদের অভীপ্সিত সর্ববিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হয়।

সব তত্ত্ব তবে শোনো। ভক্তিধর্ম প্রবর্তন করতে তুমিই যোগ্য পাত্র।

কে আমি? অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ কে?

জীবের স্বরূপ—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। সর্বব্যাপক পরম ব্রহ্মেরই এক ক্ষুদ্র অংশ। ঈশ্বর যদি অগ্নিপিণ্ড, জীব তার স্ফুলিঙ্গ। ঈশ্বর বিভু-চিৎ জীব অণু-চিৎ। অগ্নির জ্যোৎস্না বিস্তারিণী, তেমনি ঈশ্বর-শক্তি অখিল জগৎ আচ্ছাদন করে রয়েছে। তুমি জীব, তুমি তারই এক কণিকামাত্র। 'ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥' আর জীব সব সময়ে আনন্দের দাস বলেই কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণই আনন্দঘন ভূমাপুরুষ।

কেন আমি দগ্ধ হচ্ছি?

কৃষ্ণকে ভুলে, কৃষ্ণের যে সে নিত্য দাস, তা ভুলে জীব যখন বহির্মুখ হয় তখনই তাকে ত্রিতাপজ্বালা দগ্ধ করে। তখনই সে মায়াগর্তে পড়ে হাবুডুবু খায়।

'কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥'

কৃষ্ণবহির্মুখ তাই সংসার দুঃখের হেতু। সেই মায়ায় থেকে বহির্মুখতা থেকে ত্রাণের উপায় কী? গুরুতে দেবতাবুদ্ধি প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন করে অবিচলা ভক্তিতে ভগবানকে ভজনা করাই উপায়।

তৃতীয়তঃ মঙ্গল কিসে?

সাধুর কৃপায়, শাস্ত্রের কৃপায়। যদি সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয় তা হলেই সে মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণভজনই সার কথা।

'সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥'

কে কৃষ্ণ? কৃষ্ণ আমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র ত্রাতা। একমাত্র প্রাপ্য। আর সেই প্রাপ্তির সাধনই ভক্তি। ভক্তির থেকে প্রেমই মহা প্রয়োজন। প্রেমই পুরুষার্থ শিরোমণি।

প্রেমেই কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন। প্রেমেই কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণরস সম্ভোগ।

'কৃষ্ণমাধুর্য প্রেমানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস আস্বাদন ॥'

দারিদ্র্য-পীড়িত এক গৃহস্থের বাড়িতে সর্বজ্ঞ এসেছে। বলছে, কেন তুমি দুঃখ পাচ্ছ? তোমার ঘরের মাটির নিচে পিতৃধন পোঁতা আছে। খনন করে উদ্ধার করো সেই ধন-ভাণ্ডার। কোন দিক থেকে খনন করব? জিগগেস করল গৃহস্থ। 'যদি দক্ষিণ দিক খোঁড়ো বোলতা ও ভীমরুল বেরুবে, ধন মিলবে না। যদি পশ্চিমে খোঁড়ো এক যক্ষ এসে বাদ সাধবে, তোমাকে ভূতাবিষ্ট করে রাখবে, তুলতে দেবে না ধন। আর উত্তরে খুঁড়লে অজগরের দেখা মিলবে, অনায়াসে সে গ্রাস করবে তোমাকে। শুধু পুবেই রয়েছে তোমার ধনাগার। অল্প একটু খুঁড়লেই তোমার হাতে ঠেকবে।'

তেমনি কর্মের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকে নয়, যোগের দিকে নয়, শুধু ভক্তির দিকে একটু খুঁড়লেই মিলে যাবে কৃষ্ণধন।

'ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥'

ধন পেলে কী হয়? সুখ হয়। আর সুখ এলেই দারিদ্র্যদুঃখ চলে যায়। ধনপ্রাপ্তির মুখ্যফল তাই সুখ, দারিদ্র্যনাশ আনুষঙ্গিক ফল। তেমনি সাধনভক্তির ফলে যে প্রেম, সে প্রেম পেলে কী হয়? প্রেম পেলে কৃষ্ণ-আস্বাদনের সুখ হয়। আর সে সুখে ভবক্ষয় ঘটে। ভবক্ষয় আনুষঙ্গিক ফল। কৃষ্ণপ্রেমসুখই মুখ্য প্রয়োজন।

এবার তবে কৃষ্ণতত্ত্ব শোনো।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই কৃষ্ণতত্ত্ব। অদ্বয় অর্থ স্বয়ংসিদ্ধ, ভেদশূন্য। জ্ঞান অর্থ হচ্ছে সৎ, চিৎ আর আনন্দ। সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। সুতরাং সচ্চিদানন্দই কৃষ্ণস্বরূপ।

'সর্বাদি সর্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর ॥'

কৃষ্ণের আরেক নাম গোবিন্দ। তাঁর নিত্যধাম গোলোক। তিনি স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।

'অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান সর্ব অবতংস ॥'

কৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। কৃষ্ণ নিরাকার, নির্বিশেষ। পরমাত্মা সাকার কিন্তু তাঁর পরিকর নেই। ভগবানের পরিকর আছে, লীলা-বিলাস আছে, তিনি সবিশেষ সাকার। জ্ঞানসাধকের কাছে ব্রহ্ম, যোগসাধকের কাছে পরমাত্মা আর ভক্তিসাধকের কাছে ভগবান প্রকাশিত।

ভগবানের তিন রূপ। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ আর আবেশরূপ।

যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা রাখে না, স্বরূপতঃ যার কোনো ভেদ নেই তাই স্বয়ংরূপ। ভাববেশাদির পার্থক্য হেতু যে রূপকে স্বয়ংরূপ হতে অন্যরূপ বলে মনে হয়—যদিও আসলে তা অন্যরূপ নয়, তাই তদেকাত্মরূপ। যে সকল মহত্তম জীব জনার্দনের জ্ঞান ও শক্তির অংশ নিয়ে আবিষ্ট তারাই আবেশ-অবতার।

স্বয়ংরূপে আবার দুই স্ফূর্তি—এক স্বয়ং, অন্য প্রকাশ। স্বয়ং এক-মূর্তি। গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। আর একই বিগ্রহের বহুস্থানে যুগপৎ অবির্ভাবের নাম প্রকাশ। যেমন ঘটেছিল রাসে, মহিষীবিবাহে।

এক বপুর বহুরূপ প্রকাশ প্রাভব-প্রকাশ। ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করতে ষোল হাজার মূর্তি, রাসবিলাসবাসনায় যত গোপী তত কৃষ্ণ। কিন্তু স্বয়ংরূপের দেহে অন্যরূপ অঙ্গ বা বর্ণের সমাবেশের নাম বৈভব-প্রকাশ। যেমন বলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ, আর সমস্ত কৃষ্ণের মত।

স্বয়ংরূপের মাধুরীই সর্বাধিক।

'ভক্তে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্তস্বরূপ ॥'

ভক্তিতেই ভগবানের পূর্ণরূপ প্রকটিত।

কৃষ্ণের লীলা তিন ধামে। গোকুলে, মথুরায় আর দ্বারকায়। মথুরাতে তিনি কেশব, নীলাচলে জগন্নাথ, প্রয়াগে মাধব, মন্দারে মধুসূদন, আনন্দারণ্যে বাসুদেব, বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু, হরিদ্বারে হরি। শুধু ভক্তজনহেতুই তাঁর বিচিত্র প্রকাশ।

'সর্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি ধর্ম স্থাপিতে ॥'

দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ দেবতা এই বারোজন। অগ্রহায়ণে বা মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ, মাঘে মাধব, ফাল্গুনে গোবিন্দ। চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে মধুসূদন, জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন। শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে হৃষীকেশ, আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্তিকে দামোদর।

দ্বাদশ অঙ্গে তিলক রচনা করে দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করে দ্বাদশ তিলকস্থান যথাক্রমে স্পর্শ করে দ্বাদশমূর্তি ধ্যান করতে হয়। ললাটে তিলক রচনা করে কেশবের ধ্যান করবে। উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম কুক্ষিতে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম স্কন্ধে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ ও কটিতে দামোদর।

এক কৃষ্ণ থেকে অসংখ্য অবতারের উদ্ভব। গুনে শেষ করা যায় না। গাছের পল্লবিত শাখার মধ্যে দিয়ে দেখা টুকরো-টুকরো চাঁদের মত।

'অনন্তাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগদরশন ॥'

সনাতন জিগগেস করল, 'প্রভু, এটা কলিযুগ। এই কলির অবতার কে? কী করে বুঝব?'

প্রভু বললেন, 'অন্য অবতার যেমন শাস্ত্র দিয়ে জানা যায়, কলিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্র দিয়েই জানতে হবে। যিনি অবতার তিনি তো আর নিজের অবতারত্ব ঘোষণা করবেন না, লক্ষণ বিচার করেই আসতে হবে সিদ্ধান্তে।'

'যিনি স্বরূপে পীতবর্ণ আর প্রকটে কীর্তন-প্রবর্তক ও প্রেমদাতা তিনিই তো কলির অবতার।' সনাতন আকুল কণ্ঠে বললে, 'বলুন ঠিক কি না। নিশ্চয় করে বলুন। সমস্ত সন্দেহ দূর হোক।'

প্রভু বললেন, 'চাতুরালি ছাড়ো। কৃষ্ণের অন্য কথা শোনো।'

বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করে লীলা করছেন কৃষ্ণ। বালকৃষ্ণ ও পৌগণ্ডকৃষ্ণই কৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ।

কৃষ্ণের কৈশোরই সর্বভক্তির আশ্রয়। কৈশোরেই কৃষ্ণ নিত্যলীলা-বিলাসবিশিষ্ট। সুতরাং কৈশোরই কৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিয়তস্থিতি। বাল্যলীলায় সখ্য নেই, মধুর নেই, পৌগণ্ডও মধুর-শূন্য। শুধু কৈশোরেই সব ভাবের সমাহার। সৌন্দর্য মাধুর্য বৈদগ্ধ্য সমস্ত গুণের পরিপূর্ণ বিকাশই এই কৈশোর। 'কিশোরশেখর ধর্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।' সর্বগুণান্বিত জনই ধর্মী। তাই সর্বগুণাধার ভক্তিতেই কৈশোরের প্রশংসা। কৈশোরের পরে প্রৌঢ় বা বার্ধক্য-লীলা নেই। কৃষ্ণ চিরকিশোর। 'রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি।'

পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম। কৃষ্ণের স্বরূপ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, পূর্ণতম ব্রজধামে। পরিকর পার্ষদদের মধ্যে কতটা প্রেমবিকাশ তারই নিরিখে এই পূর্ণতার বিচার। দ্বারকায় এই বিকাশ অল্প, মথুরায় কিছু বেশি, ব্রজে সবচেয়ে বেশি। 'এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান।'

কৃষ্ণগুণের ইয়ত্তা হয় না। কৃষ্ণ নিজেও অন্ত পায় না নিজগুণের। অনন্তদেব সহস্র বদনে অনাদিকাল থেকে কৃষ্ণের গুণগান করছে, এখনও শেষ করতে পারে নি। তার বৈভবামৃতসিন্ধুর এক বিন্দুও মনোবাক্যের গোচর নয়। কৃষ্ণের সমান কেউ নেই, উচ্চতরও কেউ নেই। যাকে বলা হয় অসমোর্ধ্ব, অসাম্যাতিশয়। 'তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন।'

'কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অপার—অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারিল তার ছুঁইল একবিন্দু ॥'

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা বলতে-বলতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হল, মন মগ্ন হল মাধুর্যে। বলতে লাগলেন কৃষ্ণের মর্ত্যলীলার তাৎপর্য।

কৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্বোত্তম। এমন অঙ্গ ধরলেন যা ভূষণের ভূষণস্বরূপ। পরনে রাখালবালকের পরিচ্ছদ। সঙ্গে গোচারণের সরঞ্জাম। হাতে বাঁশি। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, বুকে বনফুলের মালা, গালে-কপালে অলকা-তিলকা। সনাতন, সে রূপের তুলনা হয় না। সর্বকাল সর্বপ্রাণীকে তা আকর্ষণ করছে।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥'

এই রূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন, মানসনেত্রে সতর্ক পাহারা দেয় সর্বক্ষণ। কিন্তু সুন্দর দাঁড়ায় ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে। ভ্রূধনুনর্তন যদি দেখ! নিজের রূপ দেখে নিজেই বিস্মিত। নিজেকে আস্বাদ করবার জন্যে নিজেই ইচ্ছুক-উৎসুক।

যারা পতিব্রতা-শিরোমণি, বৈকুণ্ঠের সেই সব লক্ষ্মীরাও কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। আর কৃষ্ণ আকৃষ্ট গোপীদের কামগন্ধহীন নির্মল প্রেমে। সেই নির্মল প্রেমিকাদের সঙ্গেই কৃষ্ণের রাসক্রীড়া। সেই ক্রীড়ায় কন্দর্পের মনও মথিত। যে সকলের মোহ উৎপাদন করে সে এখন নিজেই মোহিত। তাই কৃষ্ণের এখানে মদনমোহন নাম। 'চড়ি গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন।'

এ এক অভিনব মেঘ। জগৎ-শস্য জীবের উপর অমৃত বর্ষণ করে। এ কৃষ্ণ মেঘে শিখি পুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনু ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যায় না, স্থির বিদ্যুতের মত নিত্য জেগে থাকে।

'মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি,
পীতাম্বর বিজুরীসঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর জগৎ-শস্য-উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥'

আর মাধুর্যই ভগবত্তার শেষ কথা। সে কথাই প্রচারিত হয়েছে ভাগবতে। তাই ভাগবতশ্রবণই সর্বজীবের আশ্রয়। ভাগবতই জীবকে ভগবৎ-পরায়ণ হতে প্রবুদ্ধ করে।

কৃষ্ণমাধুর্যের কথা বলতে-বলতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে সনাতনের হাত ধরলেন। মথুরা নগরীর ভাষায় শোক করতে লাগলেন। গোপীরা কী তপস্যা করেছে যে নিরন্তর নেত্র দিয়ে কৃষ্ণের রূপমাধুরী পান করে তনু-মন শ্লাঘ্য করছে? গোপীভাব আর কৃষ্ণমাধুর্য কেউ কারু কাছে পরাজিত হচ্ছে না। গোপীভাব যত বাড়ে তত উজ্জ্বল হয় কৃষ্ণমাধুর্য। আবার কৃষ্ণমাধুর্য যত বাড়ে তত নির্মল হয় গোপীভাব। 'ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি।'

'সখি হে! কোন তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণ-রূপ-মাধুরী পিবি-পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥'

কর্ম-জপাদিতে কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদ করা যায় না। কৃষ্ণমাধুর্য-আস্বাদ শুধু রাগমার্গে। শুধু ভাবানুকূল সেবায়।

'কর্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি তপধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য সুলভ॥'

প্রত্যেক দেবতারই মন্ত্র ও গায়ত্রী আছে। গায়ককে যে ত্রাণ করে সেই গায়ত্রী। মন্ত্র ও গায়ত্রীতে পূজা করতে হয়। শৃঙ্গার-রস-রাজ কৃষ্ণেরও গায়ত্রী আছে। তার নাম কামগায়ত্রী। তা হচ্ছে: কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। স্পৃহনীয়তা, কামনীয়তা বোঝাবার জন্যেই কাম। সৌন্দর্যে মাধুর্যে বিলাসে বৈদগ্ধ্যে কৃষ্ণই সর্বোত্তম কাম্যবস্তু। আর এই গায়ত্রী-জপেই জাগবে কৃষ্ণকামনা, গাঢ়প্রীতিময়ী উদ্বেলতা। আর কৃষ্ণ 'অপ্রাকৃত নবীন মদন।' তাঁর সুবিলাসহাস মুখখানিই জীবনের নিত্যোৎসব।

'সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য অমৃতের সমুদ্র।' বলছেন আবার প্রভু। 'আমার মন সান্নিপাতিক রোগীর মত। দারুণ পিপাসা, ইচ্ছে করছে মাধুর্যসিন্ধুর সমস্তটাই পান করে ফেলি কিন্তু দুর্দৈব বৈদ্য দুর্ভাগ্য আমাকে এক বিন্দুও পান করতে দিচ্ছে না। আর তাঁর বাঁশি শুনেছ? এমন তার ধ্বনি যে, যে শুনতে ইচ্ছুক নয় তারও কানে গিয়ে ঢোকে। সকলকেই মাতোয়ারা করে তোলে। জোর করে কাছে টেনে নিয়ে আসে। সে ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ব্রত ভঙ্গ করে, পতিকোল থেকে কৃষ্ণকোলে আহরণ করে। আর, গোপীরা কী বলে শুনেছ? বলে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরাই বাঁশির আকর্ষণে নারায়ণের বক্ষত্যাগের জন্যে উন্মুখ হয়, আমরা তো সাধারণ গয়লার মেয়ে। সনাতন, তোমার প্রতি কৃষ্ণের অগাধ কৃপা। আমাকে যন্ত্র করে, আমার চিত্তভ্রম জন্মিয়ে, আমার মুখে তাঁর ঐশ্বর্য-মাধুরী তোমাকে শোনালেন। আমি তো পাগল, কী কথা বলতে কী কথা বলি তার ঠিক নেই। আমি তো বাতুল, শুধু কৃষ্ণমাধুরীর স্রোতে ভেসে যাওয়াই আমার কাজ।'

'আমি তো বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্যামৃত স্রোতে যাই বহি॥'



৬০

সনাতন, এবার তবে ভক্তিতত্ত্ব শোনো।

কী সে বস্তু যার থেকে কৃষ্ণপ্রেমধন পাওয়া যায়? যা দিয়ে জানা যায় কৃষ্ণকে? যা জানলে আর কিছু জানবার থাকে না।

শুধু কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। কৃষ্ণভক্তিই করণীয়। ভক্তি কী? ভক্তি সেবা। আর এ সেবা নিজের সুখের জন্যে নয়, কৃষ্ণের সুখের

জন্যে। অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ো। ধরো সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন, যে অনুশীলনে শুধু কৃষ্ণের প্রীতিবিধান। আর, একমাত্র কৃষ্ণ প্রীত হলেই বিশ্ব প্রীত।

কর্ম-যোগ-জ্ঞান সব 'ভক্তিমুখনিরীক্ষক'। ভক্তি ছাড়া কর্ম, ভক্তি ছাড়া জ্ঞান, ভক্তি ছাড়া যোগ—সমস্ত নিষ্ফল। আর কর্মও নেই, জ্ঞানও নেই, যোগও নেই, অথচ ভক্তি আছে, তাতে কর্মযোগজ্ঞানের ফলও আছে, মায়াবন্ধনমোচনও আছে।

যে জীব নিত্যমুক্ত, সে তো কৃষ্ণ-পারিষদ। তার আর দুঃখ কী? সে তো কৃষ্ণচরণেই নিত্য-উন্মুখ, তার তো নিরন্তর সেবানন্দ।

কিন্তু যে নিত্যবদ্ধ?

তারই অশেষ দুর্গতি। সে যে নিত্য সংসারী। নিত্য কৃষ্ণ-বহির্মুখ। তাই চিরকাল সে নরকদুঃখে জর্জর। সে কামক্রোধের দাস, ত্রিতাপদগ্ধ। মায়ার শাসনে সে নিত্যদণ্ডিত। নিত্যপীড়িত।

তবে তার উপায় কী?

উপায় সাধুবৈদ্য। যদি কোনো জন্মে ভাগ্যবলে সে সাধুসঙ্গ পায় আর সে সাধু যদি কৃপা করে তাকে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দেয় সেই ভক্তিতেই মায়া পথ ছাড়ে।

'সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥'

আর মায়া চলে গেলেই সংসার-আবেশ চলে যায়, কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করে সে চলে আসে কৃষ্ণের সামীপ্যে। 'কৃষ্ণভক্তি—জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

'কামাদির কত দুরন্ত আদেশ কত ভাবেই না আমি পালন করেছি, তবু আমার প্রতি তাদের করুণা হল না, লজ্জা হল না, তাদের দাসত্ব থেকেও দিল না নিষ্কৃতি। হে যদুপতি, সম্প্রতি আমার বুদ্ধিলাভ হয়েছে, আমি ঐ সব দুরাজ্ঞা অমান্য করে তোমার অভয় চরণ আশ্রয় করেছি, তুমি আমাকে তোমার নিজ দাস্যে নিযুক্ত করো।'

'কৃষ্ণ সূর্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥'

শুধু একবার বলো, কৃষ্ণ, আমি তোমার হলাম। আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত তোমার হল। আমি তোমাতেই প্রপন্ন, আমি একমাত্র তোমারই। তুমি ছাড়া আমি বলে কিছু নেই, তা হলেই মায়া পলাতকা। তা হলেই তুমি কৃষ্ণাচ্ছন্ন। যার মায়াতে অভিনিবেশ তারই ভয় আর যার ভয় তারই দুঃখ।

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥'

'আমার শরণাগত হয়ে যে একবার মাত্র বলে, হে কৃষ্ণ, আমি তোমার, আমি তাকে সর্বদা অভয় দিয়ে থাকি। শরণাগত রক্ষা করাই আমার ব্রত।'

অন্যকামী হয়েও যদি কেউ কৃষ্ণভজন করে, প্রার্থনা না করলেও কৃষ্ণ তাকে চরণ দান করে বসেন। কৃষ্ণকৃপায় কাচ কুড়োতে এসে দিব্যরত্ন পেয়ে যায়। নদীস্রোতে যেমন কাঠ ভেসে আসে কোনো জন্মে হয়তো পেয়ে যায় মোচন-উত্তরণের উপায়। 'নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে।' শুধু আকস্মিক সাধুসঙ্গ থেকেও পেয়ে যায় কৃষ্ণরতি। মহৎকৃপা হলেই ভগবৎকৃপা। তাই ভগবৎকৃপা ভক্ত-কৃপাসাপেক্ষ। সাধুর চরণধূলি না পাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হয় না। 'লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।'

কৃষ্ণভক্তি করলেই সর্বকর্ম করা হয়। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তি-ধর্মযাজনের অধিকারী, যার শ্রদ্ধা দৃঢ়, অন্যের যুক্তিতর্কে যা বিচলিত হয় না, যে শাস্ত্রে সুনিপুণ, সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ, সেই অধিকারীদের মধ্যে উত্তম। যে শাস্ত্রদক্ষ নয় অথচ যে দৃঢ়নিশ্চয় সে মধ্যম অধিকারী। আর যার শাস্ত্রনৈপুণ্য দূরের কথা, যার শ্রদ্ধা কোমল, যে বিরুদ্ধ তর্কের কাছে বশীভূত সে কনিষ্ঠ অধিকারী।

যে সর্বভূতে ভগবানকে দেখে আর ভগবানে সর্বভূতকে দেখে সেই

ভাগবতোত্তম। যে ভগবানে প্রেম, ভগবদ্‌ভক্তে মিত্রতা, অজ্ঞ জনে কৃপা ও ভগবদ্‌দ্বেষী জনে উপেক্ষা করে সে মধ্যম ভক্ত। আর, যে শ্রদ্ধায় শুধু বিগ্রহেই ভগবানকে পূজা করে, অন্য কাউকে করে না, সে কনিষ্ঠ ভক্ত।

শোনো। কৃষ্ণের সমস্ত গুণ কৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয়। 'সর্ব-মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।' কী কী গুণ?

দয়া, অদ্রোহ, সত্যবাক্য, সমদর্শিতা, দোষশূন্যতা, বদান্যতা, মৃদুতা, শৌচ, প্রশান্তি আর শরণাগতি। অধিকন্তু কৃষ্ণভক্ত হবে অকাম, অনীহ, স্থির, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী, মিতভুক, বিজিতষড়্‌গুণ ও সর্বোপকারক।

আর সদাচারই বিধি, অসদাচারই নিষেধ। মূল বিধি সতত কৃষ্ণস্মরণ। আর মূল নিষেধ অসৎসঙ্গ। স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ ও অভক্ত সঙ্গীর সঙ্গ দুইই ত্যাগ করবে। ভগবদভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য লোকদের দর্শনও করবে না।

যাদের সঙ্গের প্রভাবে সত্য শৌচ দয়া মৌন বুদ্ধি লজ্জা শ্রী যশ ক্ষমা শম দম ও ঐশ্বর্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সব অশান্ত মূঢ় খণ্ডিতাত্ম অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়ামৃগতুল্য শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত অসাধুর সঙ্গ বর্জন করবে। প্রজ্বলিত আগুনের পিঞ্জরের মধ্যে বাস করা বরং ভালো তবু কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসক্লেশ সহ্য করবে না কিছুতেই। যে কৃষ্ণ সমর্থ কৃতজ্ঞ বদান্য ভক্তবৎসল তাকে ছেড়ে অন্যকে ভজন করবে এমন পণ্ডিত কে আছে? সর্ব-গুণনিধি কৃষ্ণ, সর্বসুহৃৎ কৃষ্ণ, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণকে ছাড়ে কে?

অক্রূর বলছে কৃষ্ণকে : যিনি ভজনকারী বন্ধুকে সকল অভিলষিত দান করেন, এমন কি আত্মপর্যন্ত দান করে বসেন, যার উপচয়-অপচয় বা হ্রাস-বৃদ্ধি বলে কিছু নেই, সেই ভক্তপ্রিয় সত্যবাক সর্বসুহৃদ ও কৃতজ্ঞ তোমাকে ছাড়া আর কাকে কোন বুদ্ধিমান আশ্রয় করবে? স্তনলিপ্ত কালকূট খাইয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুষ্টা

পুতনাকে যিনি ধাত্রীগতি দিয়েছিলেন তাঁর মত দয়ালু কে আছে যার শরণ নেব?

এবার শোনো সাধনভক্তির কথা। যে ভক্তি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাধনীয়া তাই সাধনভক্তি। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রেম অবস্থান করছে সেই প্রেমের উদ্দীপনকরণই সাধন।

সাধনভক্তির লক্ষণ কী? যা দিয়ে বস্তু গঠিত তাই স্বরূপ লক্ষণ। যা দিয়ে বস্তু প্রাপ্ত তাই তটস্থ লক্ষণ। শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি যা সাধনভক্তির অঙ্গ বা উপাদান তা সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। আর যার অনুষ্ঠানের ফলে যে কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উন্মেষিত হয় সেই কৃষ্ণপ্রেমই সাধনভক্তির তটস্থ লক্ষণ। 'শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার স্বরূপ-লক্ষণ। তটস্থ-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥'

সাধনভক্তি দু' রকম। এক বৈধী, অন্য রাগানুগা। যার অনুরাগ নেই সে শাস্ত্রশাসনের ভয়ে কৃষ্ণ ভজনা করে, কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্যে নয়। আর যে অনুরাগে রঞ্জিত, সে বিধি-নিষেধের ধার ধারে না, সে প্রাণের থেকে ভজনা করে, তার প্রাণধন কৃষ্ণকে তৃপ্তি দিতে।

এবার সাধনভক্তির প্রধান অঙ্গগুলি বিবেচনা করো।

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা-গ্রহণ, গুরুসেবা। সদ্ধর্মপৃচ্ছা, সাধুমার্গানু-গমন। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস, যাবৎ-নির্বাহ-প্রতিগ্রহ, অর্থাৎ যেটুকু নইলে কার্যনির্বাহ হয় না ঠিক সেইটুকু গ্রহণ। একাদশীতে উপবাস, আমলকী অশ্বত্থ গো-ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপূজন। সেবাপরাধ-নামাপরাধবর্জন।

সেবাপরাধ বত্রিশ রকম। যথা, গাড়ি-পালকি চড়ে বা জুতো-খড়ম পায়ে মন্দিরে যাওয়া, ভগবৎ-উৎসবে যোগ না দেওয়া, বিগ্রহ-সাক্ষাতে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবৎ-বন্দনা। একহাতে প্রণাম, বিগ্রহের দিকে পিঠ দিয়ে বসা বা পিঠ দেখিয়ে প্রদক্ষিণ করা, বিগ্রহের সামনে পা মেলা, বিগ্রহের সামনে হাত দিয়ে

'এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥'

শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, পূজনে পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন আর আত্মনিবেদনে বলি কৃষ্ণকে পেয়েছিল।

আর অম্বরীষ পেয়েছিল বহু-অঙ্গ সাধন করে। সে মন রেখেছে কৃষ্ণপদে, বাক্য রেখেছে কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে, হাত রেখেছে মন্দিরমার্জনায়, কান রেখেছে হরিকথাশ্রবণে, চোখ রেখেছে বিগ্রহদর্শনে, অঙ্গ-সঙ্গ রেখেছে ভক্তগাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণ রেখেছে তুলসীগন্ধে, রসনা রেখেছে প্রসাদস্বাদে, চরণ রেখেছে তীর্থভ্রমণে আর মাথা রেখেছে পদবন্দনায়। সমস্ত কামনাই নিয়োজিত করেছে ভগবৎদাস্যে।

যারা সুখবাসনা ত্যাগ করে শাস্ত্র আজ্ঞা মেনে কৃষ্ণ ভজনা করে তাদের আর কিছু করণীয় থাকে না। দেবতা, ঋষি, ভূত বা পিতৃ বা কুটুম্বাদির থেকেও অঋণী হয়ে যায়। এমন কি তাদের পাপাচারেও মন যায় না। যদি অজ্ঞানে বা অনিচ্ছায় পাপ এসেও পড়ে কৃষ্ণ তা শুদ্ধ করে দেন। ভক্তিতে জ্ঞানবৈরাগ্য বা ভোগত্যাগেরও প্রয়োজন নেই। ভক্তি প্রভাবেই যম-নিয়ম শৌচ-সন্তোষ এসে পড়ে। ভক্তিই তখন ভক্তির সহায়। ভক্তিই তখন ভক্তিবৃদ্ধির হেতু।

যারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাদের অহিংসা জন্মাবে তাতে আর আশ্চর্য কী। যারা হরিভক্ত তারা পরপীড়ক বা পরতাপী হতে অনিচ্ছুক।

সনাতন, এবার রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শোনো।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণাই রাগ। ইষ্টে স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা, যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাই রাগ। আর রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—এই রাগের স্বরূপ-লক্ষণ। ইষ্টে যে আবিষ্টতা এ রাগের তটস্থ-লক্ষণ।

হাঁটু জড়িয়ে বসা। বিগ্রহের সামনে খাওয়া, শোয়া, চেঁচিয়ে কথা বলা, আলাপ করা, কাঁদা, মিথ্যে কথা বলা। বিগ্রহের সামনে কলহ করা, পরনিন্দা, পরস্তুতি করা, কারু প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ বা নিষ্ঠুর বাক্য বলা, কম্বল গায়ে দিয়ে সেবা করা, অশ্লীল কথা বলা, অধোবায়ুত্যাগ করা। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখ্য উপচার দিয়ে পুজো না করা, অনিবেদিত ভক্ষ্য গ্রহণ করা, কালের ফল ভগবানকে না দেওয়া, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ আর কাউকে দিয়ে অবশিষ্ট ভগবানকে দেওয়া। বিগ্রহের সামনে অন্যকে অভিবাদন করা, গুরুদেবের প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকা, আত্মপ্রশংসা করা আর সর্বশেষ, দেবতা নিন্দা করা।

অবৈষ্ণবের সঙ্গ করবে না, অবৈষ্ণবসঙ্গে ভক্তি শুকিয়ে যায়। বহুশিষ্য করবে না, বহুগ্রন্থকলাভ্যাস বর্জন করবে। বিষ্ণুনিন্দা শুনবে না, শুনবে না গ্রাম্যবার্তা। মনে বাক্যে কোনো প্রাণীরই উদ্বেগ জন্মাবে না। নিজে কীর্তন করবে, অন্যে যখন কীর্তন করবে তখন শুনবে আর যখন কীর্তন নেই তখন মনে মনে স্মরণ করবে কৃষ্ণকে। পূজা করবে, বন্দন বা প্রণাম করবে আর পরিচর্যা করবে। আমি তাঁর আজ্ঞাবাহী দাস এই ভেবে তাঁর উপর সমস্ত কর্মার্পণ করবে, তিনি আমার বন্ধু এই ভেবে প্রাণের সমস্ত কথা খুলে বলবে তাঁকে। করবে আত্মনিবেদন।

চার বস্তুর সেবায় কৃষ্ণ আনন্দিত। তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা আর ভাগবত। যা-কিছু কাজ করবে সমস্তই কৃষ্ণের প্রীতির জন্যে। 'কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা।' প্রত্যেক ব্যাপারেই কৃষ্ণের কৃপা অনুভব করবে। হোক বিপদ, হোক দুঃখদুর্যোগ, সমস্তই ভাববে ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা। সর্বথা শরণাপত্তিই পরম কৌশল।

যত সাধনবিধি বললাম, সংক্ষেপ করতে গেলে এই পাঁচ অঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস আর শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তিসেবা। এই পঞ্চের অল্প সঙ্গ করলেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়।

'এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥'

শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, পূজনে পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন আর আত্মনিবেদনে বলি কৃষ্ণকে পেয়েছিল।

আর অম্বরীষ পেয়েছিল বহু-অঙ্গ সাধন করে। সে মন রেখেছে কৃষ্ণপদে, বাক্য রেখেছে কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে, হাত রেখেছে মন্দিরমার্জনায়, কান রেখেছে হরিকথাশ্রবণে, চোখ রেখেছে বিগ্রহদর্শনে, অঙ্গ-সঙ্গ রেখেছে ভক্তগাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণ রেখেছে তুলসীগন্ধে, রসনা রেখেছে প্রসাদস্বাদে, চরণ রেখেছে তীর্থভ্রমণে আর মাথা রেখেছে পদবন্দনায়। সমস্ত কামনাই নিয়োজিত করেছে ভগবৎদাস্যে।

যারা সুখবাসনা ত্যাগ করে শাস্ত্র আজ্ঞা মেনে কৃষ্ণ ভজনা করে তাদের আর কিছু করণীয় থাকে না। দেবতা, ঋষি, ভূত বা পিতৃ বা কুটুম্বাদির থেকেও অঋণী হয়ে যায়। এমন কি তাদের পাপাচারেও মন যায় না। যদি অজ্ঞানে বা অনিচ্ছায় পাপ এসেও পড়ে কৃষ্ণ তা শুদ্ধ করে দেন। ভক্তিতে জ্ঞানবৈরাগ্য বা ভোগত্যাগেরও প্রয়োজন নেই। ভক্তি প্রভাবেই যম-নিয়ম শৌচ-সন্তোষ এসে পড়ে। ভক্তিই তখন ভক্তির সহায়। ভক্তিই তখন ভক্তিবৃদ্ধির হেতু।

যারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাদের অহিংসা জন্মাবে তাতে আর আশ্চর্য কী। যারা হরিভক্ত তারা পরপীড়ক বা পরতাপী হতে অনিচ্ছুক।

সনাতন, এবার রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শোনো।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণাই রাগ। ইষ্টে স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা, যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাই রাগ। আর রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—এই রাগের স্বরূপ-লক্ষণ। ইষ্টে যে আবিষ্টতা এ রাগের তটস্থ-লক্ষণ।

এ কোনো শাস্ত্রযুক্তি মানে না, শুধু ভাবমাধুর্যেই লোভান্বিত। ভাবমাধুর্যে লোভ জন্মে বলে লোভধর্মেই শাস্ত্রযুক্তি উপেক্ষা করে। বাইরে শ্রবণ-কীর্তন করে, অন্তরে স্মরণ-সেবন করে। যার যেমন ইচ্ছা কৃষ্ণকে সেই ভাবে প্রিয়তম ভেবে অন্তর্মনা হয়ে নিরন্তর সেবা করো। যার খুশি দাস হও, সখা হও, প্রিয়া হও। এতেই প্রীতির উদয় হবে। প্রীতির অঙ্কুর অবস্থার দুই নাম, রতি আর ভাব। আর এই রতি গাঢ় হলেই প্রেম নাম ধরে।

এবার প্রেমের লক্ষণ শোনো। স্বরূপ-লক্ষণ হ্লাদিনী বৃত্তি আর তটস্থ-লক্ষণ চিত্তের মসৃণতা। প্রথমেই অনন্যমমতা। কৃষ্ণ ছাড়া আমার বলতে আর কিছুই নেই এই ভাব। পরে প্রেমসঙ্গতা। প্রেমরসে কৃষ্ণকে খুশি করার বাসনা। এই প্রেমরসব্যাপ্ত প্রগাঢ় মমতাই ভক্তি।

কোনো ভাগ্যে জীবের যদি শ্রদ্ধা জাগে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জাগে, তবে সে কী করে? সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গ থেকে শ্রবণ-কীর্তন বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করে। এই সাধনভক্তিতেই সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা দূরে যায়। ভোগাভিনিবেশ থাকে না। অনর্থ-নিবৃত্তি থেকে নিষ্ঠা আসে। নিষ্ঠা রুচি আনে। রুচি থেকে জাগে আসক্তি। আসক্তি থেকে প্রীত্যঙ্কুর। আর আগেই বলেছি এই প্রীতি বা রতি ঘনীভূত হলেই প্রেম। প্রেমই সর্বানন্দধাম।

ভক্তের লক্ষণ কী?

ক্ষান্তি বা ক্ষোভশূন্যতা। অব্যর্থকালতা, এক মুহূর্তও বৃথা বা কৃষ্ণছাড়া না কাটানো। বিরক্তি বা বিরাগ। মানশূন্যতা। আশাবন্ধ। সমুৎকণ্ঠা। নামগানে সদা রুচি। কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি। তীর্থবাসে অনুরাগ। 'কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।' অহর্নিশ স্তব বা স্মরণ বা প্রণাম করেও তৃপ্ত হতে পারছে না ভক্ত। অবশেষে নয়নজলে সিক্ত করে সমস্ত পরমায়ুই কৃষ্ণসেবায় সমর্পণ

করে দেয়। 'সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।' আর আশাবন্ধ মানে দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষ্ণ কৃপা করবেনই করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে।' আর কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে লালসা। তাই সমুৎকণ্ঠা। নামগুণকীর্তনে দুস্ত্যজ বাসনা। আর কৃষ্ণলীলাস্থানে বসবাস। যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম জেগেছে তার কথা ও কাজের মর্ম বোঝা কঠিন। সে কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে কখনো গান করছে আনন্দে। তাকে বুঝি সবাই পাগল বলে ভাবে।

এবার তবে পঞ্চবিধ রস—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরের খবর নাও। মধুরই গাঢ়তম। স্বাদুতম। সকল রসের শিখামণি।

শান্ত আর দাস্যে শুধু যোগ আর বিয়োগ। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের নাম যোগ, সঙ্গলাভের পর বিচ্ছেদ হলে বিয়োগ।

সখ্য আর বাৎসল্যে যোগ-বিয়োগের অনেক বিভেদ। যোগের বিভেদ তিনটি—সিদ্ধি, তুষ্টি আর স্থিতি। উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কৃষ্ণ-প্রাপ্তির নাম সিদ্ধি, বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণপ্রাপ্তি তুষ্টি, কৃষ্ণের সঙ্গে একত্র থাকা স্থিতি। আর বিয়োগের বিভেদ দশটি। তাপ, কৃশতা, জাগর্যা, আলম্বশূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃতি। চিত্তের অনবস্থিতিই আলম্বশূন্যতা। সর্ব বিষয়ে অনুরাগের অভাবই অধৃতি। আর মৃতি মৃত্যু নয়, কৃষ্ণবিয়োগে ক্ষোভে-দুঃখে ভক্তের মৃতপ্রায় অবস্থা।

মধুরা রতি তিন রকম। সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণীতে স্বসুখবাসনা বর্তমান। তুমি সুখী হও তো হবে কিন্তু প্রথমেই আমার সুখ চাই। সমঞ্জসাতে তোমারও সুখ চাই, আমারও সুখ চাই। তোমাকে সুখী করতে আমরা পত্নী হতে চাই। আর এই পত্নীত্ব-অভিমান থেকেই আমার সম্ভোগেচ্ছা। আর সমর্থাতে শুধু তোমার সুখ হোক, আমাদের সুখ জলাঞ্জলি যাক। তোমার

জন্যে আমরা লোকধর্ম বেদধর্ম বিধিধর্ম সব ছাড়তে পারি। সমর্থা রতিই গাঢ়তমা, মহাভাবের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত। কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা ছাড়া আর কোনো বাসনাই বিদ্ধ করা দূরের কথা, স্পর্শ করতে পারে না প্রেমকে। গোপীদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ তার কোটি গুণ আনন্দ গোপীর। কুলবতী হয়ে আর্য পথকে পর্যন্ত তুচ্ছ করেছি। 'রূঢ়-অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।' মধুরে অর্থাৎ সমর্থা রতিতে। সমর্থা রতি বা মহাভাবই বরামৃত-স্বরূপশ্রী।

মহাভাবের দুই স্তর—রূঢ় আর অধিরূঢ়। রূঢ় ভাবের লক্ষণ শোনো। প্রথমেই নিমেষের অসহিষ্ণুতা। পলক ফেলতে গেলে দর্শনে যেটুকু ব্যাঘাত ঘটে তাও যেন অসহ্য। তারপরে কল্পক্ষণত্ব। মিলনে এতই তন্ময় যে কল্পকালকেও ক্ষণখণ্ড বলে মনে হয়। আবার ক্ষণকল্পতা। কৃষ্ণবিরহে অল্পক্ষণকেও মনে হয় কল্পকাল বলে। তার পরে, কৃষ্ণ সুখে থাকলেও মনে হয় কত না জানি তার কষ্ট হচ্ছে। আনন্দের মধ্যেও বিষাদ লেগে আছে ছায়ার মত। এ আমার, ও তার—এই স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়, সমস্তই কৃষ্ণের, শুধু এই ভাবই খেলা করে। আর কী? কৃষ্ণ দূরে থাকলেও বিরহিণীর প্রেমের শক্তিতে অকস্মাৎ তার সামনে এসে আবির্ভূত হয়।

অধিরূঢ় দুই রকম—মোদন ও মাদন। দুয়েতেই সম্ভোগ। মোদনে রাধাকৃষ্ণ দুই দেহেই সাত্ত্বিক দীপ্তি। আর এই মোদন যখন মিলনে, তখন তা মাদন; আর যখন বিরহে, তখন তা মোহন। মাদনেই হ্লাদিনীর চরম পরিণতি আর এ আনন্দমত্ততা শুধু রাধিকাতেই নিত্য বিরাজিত। আর মোহনে দিব্যোন্মাদ পর্যন্ত। বিরহেও কৃষ্ণস্ফূর্তি, নিজেকে কৃষ্ণজ্ঞান।

সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ, কিন্তু বিপ্রলম্ভ বা বিরহও আনন্দময়। সম্ভোগের পুষ্টিই বিপ্রলম্ভে। আবার বিপ্রলম্ভ নিজেও আস্বাদ্য। যন্ত্রণাও গীতঝঙ্কার। মিলনে প্রেয়সী একমূর্তি আর বিরহে বহুমূর্তি ত্রিভুবনব্যাপিনী। 'সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।'

বিপ্রলম্ভ চার রকম। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস আর প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রিয়জনের কাছে থেকেও বিচ্ছেদের ভয়ে যে দুঃখানুভব তাই প্রেম-বৈচিত্ত্য বা প্রেমজনিত অন্যমনস্কতা। অর্থাৎ বা সম্ভোগ্যরূপে উপস্থিত তাতেও ঔদাসীন্য। দৃষ্টিতে থেকেও না দেখা, আয়ত্তে রেখেও না উপলব্ধি করা।

আর, মিলনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ও বিরহের সমস্ত দুঃখ-সুখ যদি একত্র স্তূপীকৃত করা যায় তাই অধিরূঢ়।

'ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ—নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা ঠাকুরাণী ॥'

কৃষ্ণের অনন্তগুণ। কৃষ্ণ সুরম্যাঙ্গ, সর্বসৎলক্ষণ-সংযুক্ত। রুচির, অর্থাৎ আনন্দজনক, বলশালী, তেজোময় বা তেজসান্বিত নব কিশোর। সুপণ্ডিত ভাষাবিৎ সত্যবাদী প্রিয়ংবদ শ্রুতিপ্রিয়। বুদ্ধিমান প্রতিভাবান বিদগ্ধ ও চতুর। দক্ষ কৃতজ্ঞ দৃঢ়ব্রত। শুচি বশী দান্ত স্থির গম্ভীর ক্ষমাশীল। শাস্ত্রচক্ষু দেশকালসুপাত্রজ্ঞ। বদান্য রাগদ্বেষশূন্য ধার্মিক ও ধৃতিমান। করুণ দক্ষিণ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ। শূর বা যুদ্ধনিপুণ শরণাগতপালক হ্রীমান। সর্বসুখী ভক্তসুহৃৎ প্রতাপী প্রেমবশ্য। কীর্তিমান অনুরাগভাজন শুভঙ্কর। সাধুসমাশ্রয় নারীগণমনোহারী। সর্বারাধ্য বরীয়ান সমৃদ্ধিমান ঈশ্বর।

আর রাধিকা? রাধিকা মধুরা, সর্বাবস্থায় চারুতাযুক্তা, নববয়া, নিত্যকিশোরবয়সান্বিতা। চলাপাঙ্গা। উজ্জ্বলস্মিতা, চারু সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা। গন্ধোন্মাদিতমাধবা, গাত্রগন্ধে মাধবমাদিনী। রম্যবাচী সঙ্গীত-নিপুণা নর্মপণ্ডিতা বা পরিহাসরসিকা। বিনীতা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা বা চাতুর্যময়ী। করুণাপূর্ণা সুমর্যাদা সুবিলাসা। ধৈর্যশালিনী গাম্ভীর্যশালিনী, কৃষ্ণে গাঢ়তৃষ্ণাবতী। গোকুলপ্রেমবসতি জগদ্ব্যাপ্ত-যশা। গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা বা গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী। সখীপ্রণয়াধীনা। কৃষ্ণাপ্রিয়াবলীমুখ্যা, কৃষ্ণপ্রেয়সীদের সর্বশ্রেষ্ঠা। সন্ততাশ্রবকেশবা বা কেশব যার বাক্যের বশীভূত।

আর এদের অবলম্বন করে যে মধুর রসের উদ্ভব তাই ভক্তি, তাই প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারকাষ্ঠা। এই আনন্দ শুধু তাদেরই প্রাপ্য যাদের কৃষ্ণপাদাম্বুজই একমাত্র সম্পদ, সর্বস্বজীবনীভূত। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থই কৃষ্ণপ্রেমধন।

সনাতন, যাও, মথুরার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো, বৃন্দাবনে প্রচার করো কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার আর ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র। শুষ্কবৈরাগ্য ছেড়ে ধরতে বলবে যুক্তবৈরাগ্য। যারা নিরাসক্ত হয়ে বিষয় উপভোগ করে তারাই কৃষ্ণাগ্রহী, তাদের বৈরাগ্যই যুক্তবৈরাগ্য। তাদের ভগবানই পালন রক্ষণ করেন। ধনদুর্মদ অন্ধ অভক্তকে তাদের সেবা করবার দরকার হয় না।

'এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে॥'

শাস্ত্রসম্মত সমস্ত মীমাংসা জেনে নিল সনাতন।

'প্রভু, যে সকল সিদ্ধান্ত তুমি আমাকে শেখালে তা ব্রহ্মারও অগোচর।' বললে সনাতন, 'তা স্বাদে অমৃত, পরিমাণে অম্বুনিধি। এই অমৃতসমুদ্রের এক বিন্দুও ধারণ করার আমার সাধ্য নেই। তবে তুমি যদি পঙ্গুকে নাচাতে চাও, আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।'

'তোমাকে যা শেখালাম,' প্রভু বললেন, 'তোমাতে তা স্ফুরিত হোক।' প্রভু তার মাথায় হাত রাখলেন।

যাঁরা আত্মারাম, যাঁরা মায়ামুক্ত, তাঁরাও ঈশ্বর ভজন করেন—এমনি ঈশ্বরের আকর্ষণ। সংসারমুক্তদের ঈশ্বর-ভজনের দরকার কী? কিন্তু এমনি ঈশ্বরের চিত্তাকর্ষক গুণ যে নির্গ্রন্থ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন হয়েও মুনিরা ঈশ্বরে অহেতুকী ভক্তি করে বসে।

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথম্ভূতগুণো হরিঃ॥'

'প্রভু, শুনেছি তুমি এই আত্মারাম শ্লোকের আঠারো রকম

ব্যাখ্যা করেছ সার্বভৌমের কাছে,' সনাতন বললে, 'আমাকে কিছু শোনাও।'

প্রভু একষট্টি রকম অর্থ করলেন।

আত্মা অর্থ—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ইতি, বুদ্ধি আর স্বভাব। এই সাতে যে রমে বা আনন্দ করে সেই আত্মারাম। মুনি অর্থ মৌনী, মননশীল, তপস্বী, যতি, ব্রতী আর ঋষি। নির্গ্রন্থ অর্থ গ্রন্থিশূন্য, অবিদ্যাশূন্য অর্থাৎ মায়াবন্ধনশূন্য, যারা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মানে না। আরো অর্থ শাস্ত্ররিক্ত, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, ধনসঞ্চয়ী, এমন কি নির্ধন। আর উরুক্রম অর্থ বৃহৎ যার পদবিক্ষেপ। যে চরণচালনে ত্রিভুবন কাঁপিয়েছিল সেই বিষ্ণু। অহৈতুকী অর্থ যেখানে কৃষ্ণসেবা ছাড়া বাসনান্তর নেই। যে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি চায় না অথচ কৃষ্ণের সেবা করে তার ভক্তিই অহৈতুকী। আর তা থেকেই কৌতুকী কৃষ্ণ বংশবদ। কৌতুকী ছাড়া কী! সর্বশক্তিমান হয়ে নইলে কি ভক্তের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে?

আর কৃষ্ণগুণের কথা কী বলব? 'যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয়।' সে সর্বাকর্ষক সর্বাহ্লাদক মহারসায়ন। নিজেকে ছাড়া সমস্ত কিছুকে, জগৎ সংসারকে ভুলিয়ে দেয়। 'আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।' কৃষ্ণের কী গুণ? সচ্চিদানন্দময়তা। ঐশ্বর্য মাধুর্য করুণা ভক্তবাৎসল্য—আত্মপর্যন্ত বদান্যতা। নিজেকে পর্যন্ত দান করে ফেলতে কুণ্ঠা নেই। একপত্র তুলসী ও একবিন্দু জলেরই প্রতিদান দিতে পারে না। ভক্তের ঋণ শোধ করতে না পেরে ভক্তের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়।

কৃষ্ণের সৌরভে সনক-সনাতনরা আকৃষ্ট, লীলাশ্রবণে আকৃষ্ট শুকদেব। নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হয়েও ভাগবত অধ্যয়ন করছে। ভাগবত কৃষ্ণকথার তত্ত্বদীপ। ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হয়েও স্বসুখনিভৃতচেতা হয়েও কৃষ্ণকথাকেই বেশি আনন্দকর মনে হল। আর গোপীরা আকৃষ্ট হল অঙ্গরূপে। সহাস্যকটাক্ষ দেখেই তারা

দাসী হয়ে গেল। রূপ গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হল রুক্মিণী। আর বংশীগীতে লক্ষ্মী। পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন—সমস্ত।

'হরি' শব্দের বহু অর্থ, মুখ্যতম দু'টি। সমস্ত অমঙ্গল হরণ করে, আবার প্রেম দিয়ে পূরণ করে। 'যৈতে তৈছে যোই কোই'—স্মরণ করলেই হল। যে কোনো ভাবে যে কেউ যেখানে-সেখানে। স্মরণ করলেই পাপ চলে যায়, প্রেম জাগে। প্রেমের জাগরণ মুখ্য ফল, পাপ-পলায়ন গৌণ। সমৃদ্ধ আগুন যেমন কাঠ ভস্মীভূত করে তেমনি হরিভক্তি বিনিঃশেষে দগ্ধ করে সর্বপাপ। 'ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥'

যে বিপন্ন, আর্ত, রোগাদিতে অভিভূত, যে অর্থার্থী, বিষয়কামী, যে জ্ঞানী বা আত্মবিৎ আর যে জিজ্ঞাসু, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু—এই চার রকম লোকই ঈশ্বরকে ভজনা করে। আর্ত আর অর্থার্থী দুইই সকাম, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী মোক্ষকাম। কিন্তু এদের যখন মহৎ ভাগ্যের উদয় হয় তখন এরা কাম্যবস্তুর জন্যে প্রার্থনা না করে শুদ্ধা ভক্তি চেয়ে বসে। আর শুদ্ধা ভক্তি আসে কোত্থেকে? সাধুসঙ্গকৃপায়। বা কৃষ্ণকৃপায়। সেই মহৎ কৃপায় কামদুঃসঙ্গ চলে যায় আর শুদ্ধা ভক্তি জেগে ওঠে। সাধুকণ্ঠে কৃষ্ণকথা একবার শুনলে কে পারবে সেই সাধুসঙ্গ ত্যাগ করতে? ভগবৎকথা শ্রবণের লালসাই তো ভক্তি। সাধুসঙ্গেই সেই লালসার সমৃদ্ধি।

যা কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক তাই কৈতব, তাই আত্মবঞ্চনা। আর তাই দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ। যাতে কৈতব নেই তাই ধর্ম। সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা আর ভক্তি এদের স্বভাবই হচ্ছে কৃষ্ণে অনুরাগ জন্মায়। কৃষ্ণভাব বা ভক্তি-উন্মেষের অন্য কোনো পথ নেই। যে পর্যন্ত ভুক্তি-মুক্তির ইচ্ছা সে পর্যন্ত প্রেম নেই, কৃষ্ণভাব নেই।

'বহুজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।'

ভগবৎকৃপায় বা সাধুকৃপায় যখন মন থেকে অন্যবাসনা দূরে যাবে তখনই ভক্তি হৃদয়ে আসন পাতবে।

'কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥'

ভক্তি এমনই বস্তু যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েছে তাকেও ব্রহ্ম থেকে আকর্ষণ করে এনে চিন্ময় দেহ দিয়ে কৃষ্ণ ভজন করায়। ভক্তদেহে নির্মল ভজনের মত আনন্দ আর কী আছে? অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভজনই নির্মল ভজন।

একে একে সেই শ্লোকের একষট্টি রকম অর্থ করলেন প্রভু। কিন্তু সব অর্থেরই শেষকথা ভক্তিই সারবস্তু। আর জন্মজন্মান্তরে কোনো সৌভাগ্যে কোনো সময়ে যদি কেউ সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা লাভ করে তবে আর সমস্ত ছেড়ে সে অহৈতুকী ভক্তিতেই একমাত্র কৃষ্ণকে ভজন করে।

ভক্তির কৃপাতেই ভাগবতের অর্থবিকাশ। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।' ভাগবতের অর্থ বুদ্ধি বা ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিপন্ন নয়, একমাত্র ভক্তিতেই বোধগম্য।

প্রভুর চরণ ধরে সনাতন স্তুতি করতে লাগল। 'তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন, তোমার নিশ্বাস থেকেই সমস্ত বেদের উৎপত্তি। তুমিই শ্রেষ্ঠ বক্তা, তুমিই ঠিক-ঠিক অর্থ জানো ভাগবতের।' 'তোমা বিনু অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ।'

'আমার স্তব না করে ভাগবতের স্বরূপ বিচার করো।' বললেন প্রভু, 'ভাগবত কৃষ্ণতুল্য—সর্বাশ্রয় ও সর্বব্যাপক। তার প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে বিচিত্র অর্থ। কলিকালে অজ্ঞানান্ধ জীবের ভাগবতই 'পুরাণার্ক অধুনোদিত'—সেই পুরোনো সূর্য নতুন করে উদিত হয়েছে। ভাগবতই কৃষ্ণের প্রতিনিধি। কিন্তু আমার কথা কে নেবে? লোকে হয়তো বলবে ও বাতুলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। হ্যাঁ, আমি বাতুল,' হাসলেন প্রভু: 'কৃষ্ণপ্রেমে বাতুল।'

'কিন্তু আমাকে যে আপনি বৈষ্ণবস্মৃতি প্রচার করতে বললেন, আমি যে নীচ আমি যে অনাচারী-অনধিকারী, আমার দ্বারা কী হবে ?' সনাতন দৈন্যে নম্র হল : 'তবু যদি কিছু সূত্র বলে দেন চেষ্টা করতে পারি।'

'তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। যা তুমি চাইবে তাই কৃষ্ণ তোমাকে জুগিয়ে যাবেন—জ্ঞান বুদ্ধি ভাব সূত্র—সমস্ত।'

'প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই-সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥'

তবু দিগদর্শন সূত্র তোমায় কিছু বলছি, শুনে রাখো।

প্রথমেই গুরু। গুরু-আশ্রয়নই ভজনের মূল। গুরুলক্ষণ কী, অর্থাৎ কে দীক্ষাগুরু হবার উপযুক্ত ? যে শাস্ত্রবিৎ কৃষ্ণনিষ্ঠ আচারবান অমলচরিত্র নির্লোভ নির্লিপ্ত কৃষ্ণানুভাবী স্নেহশীল। আর, শিষ্যলক্ষণ কী ? শাস্ত্রে ও গুরুতে যে শ্রদ্ধাবান যে বিনীত শুভচরিত্র সত্যবাদী। একে-অন্যকে পরীক্ষা করে নেবে। কোন মন্ত্রের কী মাহাত্ম্য তাও বিচার করে নেবে। কোন মন্ত্র গ্রহণযোগ্য তাও। আর কৃষ্ণ যে একমাত্র সেব্য একমাত্র ভজনীয় সে সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হবে। তার পরে জানবে সমস্ত যাবতীয় করণীয়। আচমন থেকে তিলকধারণ, চন্দনমাল্যধৃতি, তুলসী-আহরণ থেকে জপস্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন ভাগবতশ্রবণ পর্যন্ত। জানবে নাম-মহিমা, বর্জন করবে নামাপরাধ। কী বৈষ্ণব লক্ষণ তা জানবে, জানবে কোন শালগ্রামে ভগবানের কোন স্বরূপ। সেবাপরাধ যেন না হয় সতর্ক থাকবে। আর সাধুসঙ্গ সাধুসেবার তো কথাই নেই। ব্রত-উৎসব পালন করবে। সর্বত্র পুরাণ বচন থেকে প্রমাণ দেবে। তোমার সিদ্ধান্তের অনুকূলে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করবে। বৈষ্ণব আচার তো পালন করবেই, সাধারণ যে সদাচার তাও লঙ্ঘন করবে না। তোমাকে সব সূত্র সংক্ষেপে বললাম, লিখতে আরম্ভ করলেই,

দেখবে কৃষ্ণ তোমার চিত্তে সমস্ত উজ্জ্বল করে তুলবেন। 'যবে তুমি লিখ কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ।'

কাকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু? যে গৌড়েশ্বরের সভাবিভূষণ। যে ঋদ্ধাশ্রীকে বর্জন করে তরুণী বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ করেছে। যার বাইরে অবধূতের বেশ অথচ হৃদয় অন্তর্ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। যেন শৈবালাচ্ছন্ন নির্মলসলিল সরোবর।

আর কে আলিঙ্গন করলেন?

যিনি অতিমাত্রদয়ার্দ্র সেই চম্পকগৌর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নেত্রপথে প্রথম উপাগত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সুদীর্ঘ বাহুযুগলে আলিঙ্গন করে ধরলেন।



৬১

সন্ন্যাসীর স্থান কাশী আর কাশীর প্রধানতম সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ। প্রভুর নিন্দায় শতমুখ। বলে, 'নিজে সন্ন্যাসী হয়ে কিনা লোকটা নৃত্যগীতে মত্ত হয়েছে। বেদান্ত পড়ে না, ভাবের বন্যায় ভাসে। এমন অদ্ভুত মূর্খ তো কোথাও দেখিনি।'

'সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন-নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ করে সংকীর্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥'

'প্রভু, তোমার নিন্দা আর শুনতে পারিনে।' বললে চন্দ্রশেখর। বললে তপন মিশ্র। 'এর একটা কিছু বিহিত করো।'

প্রভু হাসলেন। নিন্দা-অপবাদ গ্রাহ্যই করলেন না। প্রতিবাদও নেই, মনঃক্ষোভও নেই। উদাসীন হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু ভক্তদুঃখের খণ্ডন করবে তো? তোমার নিন্দা শুনে ভক্তদের যে দুঃখ হচ্ছে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কোথায়? ভক্তঃদুঃখ দেখে তোমার করুণচিত্ত বিগলিত হবে না?

মহারাষ্ট্রী বিপ্র শুধু ভাবছে কোনো উপায়ে যদি প্রভুকে একবার সন্ন্যাসীদের সামনে নিয়ে যেতে পারি! যদি ওরা কোনো সুযোগে প্রভুকে একবার দেখত চোখ খুলে! যদি ওদের প্রভুসাক্ষাৎ না হয় তো চিরদিনই ওরা প্রভুর নিন্দে করে বেড়াবে। তা হলে এ কাশীধাম তো আমার কাছে অন্তহীন যন্ত্রণা!

প্রভুর চরণে নিবেদন করল বিপ্র : 'প্রভু, আপনার কাছ থেকে এক বস্তু ভিক্ষে করতে এসেছি।'

'কি?'

'আমি জানি আপনি সন্ন্যাসীসঙ্গ করেন না, তবু আমি প্রার্থনা করছি, আমার বাড়িতে একবার চলুন।'

'তোমার বাড়িতে কী?'

'নিমন্ত্রণ। আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

'সেখানে মায়াবাদীরাও আসবে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাদেরও নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি একবার চলো। কৃপা করে আমার নিমন্ত্রণ রাখো।' বিপ্র মিনতিতে নুয়ে পড়ল : 'একবার তোমাকে ওরা দেখুক। আমাদের, ভক্তদের কৃপা করো, ওরাও তোমার করুণার ভাগী হোক।'

প্রভু বললেন, 'চলো।'

সন্দেহ কী, 'সন্ন্যাসীর কৃপা লাগি এ ভঙ্গি তাঁহার।'

নির্ধারিত দিনে প্রভু গেলেন ব্রাহ্মণের ঘরে, নিমন্ত্রণ রাখতে। দেখলেন গর্বের পর্বত হয়ে বসে আছে সন্ন্যাসীরা, মধ্যস্থলে প্রকাশানন্দ সরস্বতী। দেখেও দেখল না। এই বুঝি সেই ভাবুক জাদুকর! সার্বভৌমকে যে পথে বসিয়েছে। সন্ন্যাসীরা নড়ে চড়ে উঠল। কিন্তু এই কাশীতে তার ভাবকালি বিকোবে না।

না বিকোক, প্রভু দূর থেকে সন্ন্যাসীদের নমস্কার করে, পা ধুয়ে, পা ধোবার জায়গাতেই বসে পড়লেন। যদি গাহেক না পাই, ফিরে যাব। কিন্তু এত ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যাব কী করে? তাই ঠিক করেছি অল্পস্বল্প দাম পেলে এখানেই বেচে দেব।

প্রভু ভাবলেন, আর দৈন্যবিনয় নয়, একটু ঐশ্বর্য প্রকাশ করি। নইলে ওদের গর্ব খর্ব হবে কী করে?

প্রভুর অঙ্গ তেজোময় হয়ে উঠল, আলো হয়ে গেল চার দিক।

এ কে? সন্নাসীরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু,—কোটি সূর্য্যাভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসীগণ ছাড়িয়া আসন॥'

প্রকাশানন্দই এগিয়ে এল। জিগগেস করল, 'শ্রীপাদ, আপনি ঐ অপবিত্র স্থানে, ঐ পা ধোবার জায়গায় বসে আছেন কেন? আপনার অন্তরে কিসের দুঃখ?'

প্রভু বললেন, 'আমি হীন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়েছি, আপনাদের সঙ্গে সভায় বসবার আমার যোগ্যতা নেই।'

প্রকাশানন্দ প্রভুর হাত ধরে সসম্মানে সভায় এসে বসাল। জিগগেস করলে, 'আপনিই কেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই।'

'শত হলেও তুমি তো সন্ন্যাসীই, আছও এই কাশীতে, তবে আমাদের সঙ্গ কর না কেন?' গর্বিত ভঙ্গিতে বললে প্রকাকানন্দ, 'আর সন্ন্যাসী হয়ে নাচগান করছ কী! সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে বেদান্তপাঠ, তা না করে ভাবুকের কর্ম কর কেন? তোমার প্রভাব দেখে মনে হয় তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তবে এই হীনাচার কিসের জন্যে?'

প্রভু নম্র মুখে বললে, 'আমি মূর্খ, আমার গুরুদেব আমাকে

শাসন করলেন, বললেন, তোমার বেদান্তে অধিকার, নেই, তুমি কৃষ্ণমন্ত্র জপ করো। এই কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত বেদান্তের সার।'

'কৃষ্ণমন্ত্র?'

'হ্যাঁ, কৃষ্ণমন্ত্রেই সাংসারমোচন, কৃষ্ণমন্ত্রেই কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি।' বললেন প্রভু, 'কলিকালে এই কৃষ্ণনাম ছাড়া আর ধর্ম নেই। কৃষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার। বলে গুরু আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছেন, সেই শ্লোকটি শুনবে?'

'কী শ্লোক?'

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। কলিকালে অন্য গতি নেই, হরিনামই একমাত্র সাধন।' প্রভু বললেন গাঢ় স্বরে, 'গুরুর আদেশে তাই নিরন্তর নাম নিচ্ছি। নাম নিতে নিতে অন্য বিষয়ে আমার ভ্রান্তি জন্মেছে। পাগলের মত হয়ে গিয়েছি। শুধু হাসি কাঁদি নাচি গাই, আমার সমস্ত জ্ঞান কৃষ্ণনামে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবকে অবস্থার কথা বললে তিনি বললেন, না, তুমি পাগল হও নি, তুমি কৃষ্ণনামের ফল যে প্রেম, সেই প্রেমলাভ করেছ, আর এইই পঞ্চম পুরুষার্থ। আমার উপদেশ সফল হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি অমনি নাচো গাও, ভক্তসঙ্গে কীর্তন করো, উদ্ধার করো সকলকে। গুরুবাক্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আমি অহর্নিশ কীর্তন করে বেড়াই। কৃষ্ণনামের আনন্দসিন্ধুর কাছে ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদতুল্য।'

প্রভুর মধুর কথায় সন্ন্যাসীদের মন প্রসন্ন হল। কিন্তু প্রকাশানন্দ টলল না। বললে, 'কৃষ্ণভক্তি করো তো করো, কিন্তু বেদান্তকে বাদ দাও কেন? নিজে না বোঝো তো আমাদের কাছে এসেও শুনতে পারো। বেদান্ত শুনতে কী দোষ!'

প্রভু হাসলেন, বললেন, 'যদি অপরাধ না নাও, তবে কিছু বলি সবিনয়ে।'

'বলো।' সন্ন্যাসীরা আকুল হয়ে উঠল: 'তোমার কথা শুনে

মনপ্রাণ জুড়োয়, তোমার মাধুরীতে নয়ন সন্তোষ মানে। তোমার কথা অসঙ্গত হবে না।'

প্রভু বললেন, 'বেদান্তসূত্র তো ঈশ্বরেরই বাক্য। নারায়ণই তো বেদব্যাসরূপে এ ব্যক্ত করেছেন। তাই এর পঠনে-শ্রবণে দোষ নেই। আর ঈশ্বরের বাক্যে কোনো ভ্রম-প্রমাদ নেই, নেই বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনা করবার ইচ্ছে। না বা করুণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। শাদাকে হলদে দেখবার দোষদৃষ্টি। মুখ্য অর্থ করুন, বেদান্ত ঠিক আছে, কিন্তু গৌণার্থেই যত অসঙ্গতি।'

'কেন, ব্যাখ্যা করুন।'

'সেব্য-সেবকের ভাবই ভক্তিমার্গের মূল। জীব আর ব্রহ্মে যদি অভেদ হয় তবে কে সেবক কে বা সেব্য, ভক্তি আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। শঙ্করাচার্য তো জীব আর ব্রহ্মের অভেদত্বই প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা হলে ভক্তি আর রইল কোথায়? তবে শঙ্করের দোষ নেই, তিনি ঈশ্বরের আদেশেই মুখ্য অর্থকে গৌণার্থ দিয়ে আচ্ছন্ন করেছেন।'

'ঈশ্বরের আদেশে?'

'ভগবান মহাদেবকে আদেশ করলেন, স্বকল্পিত আগমশাস্ত্র দিয়ে মানুষকে তুমি আমার থেকে বিমুখ করো। আমাকে গোপন করো। সবাই যদি ভগবৎ-উন্মুখ হয় সৃষ্টি লোপ পাবে। শঙ্কর নিজেই তো মহাদেব। মহাদেব তাই মায়াবাদ রচনা করে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব গোপন করলেন। নইলে, ধরুন, ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ কী?'

'আপনিই বলুন।'

'ব্রহ্ম অর্থ যিনি নিজে বড় হন ও যিনি অন্যকেও বড় করেন।' বললেন প্রভু, 'তাই তিনি সর্বশক্তিমান। শক্তি না থাকলে অন্যকে বড় করবেন কী করে? সর্ববৃহত্তম যে তত্ত্ব তাই ব্রহ্ম। তাঁর অসীমত্ব সব দিকে, স্বরূপে, শক্তিতে, প্রকাশবৈচিত্র্যে। আর বৃহত্তমতাকে কী বলবেন? নিশ্চয়ই এটা গুণ। তা হলে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ।

সচ্চিদানন্দময়। এ হেন ব্রহ্মকে শঙ্কর শুধুই নিরাকার বলেন কী করে? ভগবান অর্থই বিগ্রহময় বস্তু। শুধু উপাসনার সুবিধের জন্যেই ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা হয় নি, ব্রহ্মই নিত্যরূপ, সত্যরূপ, আনন্দরূপ।'

'কিন্তু শ্রুতি তো নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছে, তা কি মিথ্যে?' তার্কিকেরা প্রশ্ন করল।

'না, সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য। শক্তির অল্পতম বিকাশেই সাকার, ন্যূনতম বিকাশেই নিরাকার।'

'তা হলে দাঁড়াল কী?'

'দাঁড়াল শঙ্করের গৌণার্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, শক্তিশূন্য। তাঁর ধাম নেই, লীলা নেই, পরিকর নেই, ঐশ্বর্য নেই এক রতি—'

'আর আপনার মতে?'

'মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ, স্বশক্তিমান। তাঁর ধাম আছে, লীলা আছে, পরিকর আছে, ঐশ্বর্যের আনন্ত্য আছে।'

'আর?'

'আর শঙ্কর বলেছেন, সাকার ভগবান প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার। তাঁর মতে ভগবান মায়িক উপাধিবিশিষ্ট। যিনি নিজে মায়াময় তিনি অন্যকে কী করে মায়ামুক্ত করবেন? নিজে শৃঙ্খলিত হয়ে কি অন্যকে শৃঙ্খলমুক্ত করা যায়? যে প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার সে তো সৃষ্ট বস্তু আর সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তা হলে ঈশ্বরও অনিত্য হয়ে দাঁড়ান। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিরোধী। কেননা শ্রুতি বলছে ঈশ্বর নিত্য, অনিত্যের মধ্যে নিত্য, নিত্যোনিত্যানাম্। ভগবানের দেহকে প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার বলে মানা চরমতম বিষ্ণুনিন্দা।' 'বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর। প্রাকৃত বলিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।'

'কিন্তু জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কী বলবেন?'

'ঈশ্বর যদি প্রজ্বলিত অগ্নি, জীব তার স্ফুলিঙ্গের কণা।' বললেন

প্রভু, 'চৈতন্যে বা স্বরূপে দুই অভেদ, কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন, ঈশ্বর বিভু-বস্তু জীব অণু-বস্তু। বিভু অণু হতে পারে কিন্তু অণু কখনো বিভু হতে পারে না। দুইই চিদ্বস্তু বলে এরা আবার বিভুত্বে-অণুত্বে ভিন্ন। ভেদ আর অভেদ একসঙ্গে। আরো আছে—'

'বলুন শুনি।'

'ঈশ্বর শক্তিমান, জীব শক্তি। এখানেও সেই ভেদাভেদ। শক্তিমানের অনুভব ছাড়াও কখনো কখনো শক্তির অনুভব হয়, কস্তুরিকে অনুভব না করেও তার গন্ধকে অনুভব করা সম্ভব। তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক শক্তিমানে আর শক্তিতে বুঝি ভেদ আছে, ভেদ আছে মৃগমদ আর তার গন্ধে। কিন্তু কস্তুরি বা মৃগমদ ছাড়া গন্ধের অস্তিত্ব নেই, তেমনি শক্তিমান ছাড়া কোথায় শক্তির অস্তিত্ব! এখানে দুই আবার অভিন্ন। 'মৃগমদ তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।' তাই দেখতে পাচ্ছি জীবে-ব্রহ্মে অভেদ থেকেও ভেদ আছে। যদি ভেদের কথা ভুলে যাই, তা হলে জীবের মনে হবে শক্তি-সামর্থ্যে আমি ঈশ্বরেরই সমতুল। ঈশ্বর যা করতে পারেন আমিও তা করতে পারি। এই ভাব ঈশ্বরমহত্ত্বকে খর্ব করে। সিন্ধু কি বিন্দুরূপে পরিচিত হবার যোগ্য? সে পরিচয়ে সিন্ধুর গৌরবের হানি হয়। তাই জীব ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম হতে পারে না।'

'আর জগৎ?' তার্কিকেরা প্রশ্ন করল।

'শঙ্কর বলছেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয়। জগৎ ব্রহ্মে ভ্রম মাত্র যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এটা গৌণার্থ। কিন্তু মুখ্যার্থে, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ঘট যেমন মৃত্তিকার তেমনি জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি।'

'পরিণামবাদ যদি স্বীকার করেন তা হলে ব্রহ্মকে বিকার্য বা বিকারশীল বলে মানতে হয়। কিন্তু আসলে ব্রহ্ম অবিকৃত। সুতরাং এ জগৎ' বলল তার্কিকেরা, 'ব্রহ্মে ভ্রম মাত্র। যেমন শুক্তিতে রৌপ্যভ্রম, মরুভূমিতে সূর্যকিরণে মরীচিকাভ্রম। তার মানে ব্রহ্মকেই

আমরা জগৎ বলে ভ্রম করছি। আর এই ভ্রমবাদই আমাদের বিবর্তবাদ।'

'তার অর্থ, বিবর্তবাদে এ জগৎ মিথ্যা, বাস্তবসত্তাহীন। কিন্তু, ভেবে দেখুন, দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যেই এই বিবর্ত। অনাত্মদেহে আত্মভ্রমই বিবর্ত। আসলে ভগবান স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হয়েও আবার অবিকারী। কারু আদেশে-অনুরোধে বা কোনো কর্মবশে ঈশ্বরের কার্য নয়, তাঁর ইচ্ছাই জগৎরূপে পরিস্ফূর্ত, এবং জগৎ হয়েও তিনি যে তিনি সেই তিনিই থেকে যাচ্ছেন। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ? আর একমাত্র মহাবাক্য হচ্ছে প্রণব।'

'প্রণব ?'

'হ্যাঁ, প্রণবই ওঙ্কার, ওঙ্কারই ব্রহ্ম।' বললেন প্রভু, 'দৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার, অদৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার। জগৎস্থিত ও জগদতীত—সমস্ত। ওঙ্কারই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপক। বেদেরও উৎপত্তি এই প্রণব থেকে। সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য আর সমস্ত সাধনের লক্ষ্যও এই প্রণব।'

'আর তত্ত্বমসি ?'

'শঙ্করের মতে তত্ত্বমসি-ই মহাবাক্য। তত্ত্বমসি তো বেদের এক পরিচ্ছেদে একটি বাক্যমাত্র, তা প্রণবের মত সর্ববিশ্বব্যাপী নয়। আর, তত্ত্বমসির অর্থ তো তুমি ব্রহ্ম নও, তুমি ব্রহ্মের। দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে আর উপাসনা করতে চায় না, কিন্তু তুমি যদি ব্রহ্মের হও তবে উপাসনা তোমার অবশ্যকর্তব্য। সহজ অর্থ ছেড়ে গৌণার্থ ব্যাখ্যা করেই যত অনর্থের সূত্রপাত।' প্রভু তাকালেন সকলের দিকে।

সন্ন্যাসীরা বিস্ময় মানল। বললে, 'তুমি যে গৌণার্থ খণ্ডন করলে তাতে প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। শুধু সাম্প্রদায়িকতার খাতিরেই শঙ্করের ব্যাখ্যাকে মর্যাদা দিই।'

কিন্তু প্রকাশানন্দ সহজে হটবার পাত্র নয়। তার মতে নির্বিশেষ

ব্রহ্মই শ্রুতিসম্মত। তার উপলব্ধির জন্যে একমাত্র জ্ঞানযোগই প্রশস্ত। প্রভু দেখালেন সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও ভগবানের উপাসনাও শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত। আর কলিকালে সংসারজয় সন্ন্যাসে নয়, একমাত্র হরিনামে, ভক্তিতে। 'কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি।'

'ভক্তি বিনা মুক্তি নহে—ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥'

কী বলে এই বাঙালি ভাবক সন্ন্যাসী?

শুধু বলে না, বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে বলে। তাই সাধ্য নেই কেউ অতিক্রম করে। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু সন্দেহ নেই, আর এই ব্রহ্মই ভগবান। বহুবিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ। সেই ঈশ্বরকেই বন্দনা করি যিনি কমলনয়ন, মেঘশ্যামল, বৈদ্যুতাম্বর, মৌলিমালাঢ্য বনমালী। আর ভক্তিই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। সর্ববেদের অভিধেয়। আর ভক্তি থেকে প্রেম, প্রেম থেকেই সেবাবাসনা। আর উপাসনা ছাড়া সেবা হয় কী করে? উপাসনার মন্ত্র কী? হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। দৃঢ়তার জন্যে তিন বার হরের্নাম বলা, আবার 'এব' দিয়ে আরো নিশ্চয়াত্মক করা হয়েছে। হ্যাঁ, হরিনামই একমাত্র গতি। আবার 'কেবল' দিয়ে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। যে এর অন্যথা মানে তার নিস্তার নেই। নেই, নেই, কিছুতেই নেই। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' তাই কলিকালে নামই একমাত্র সাধন।

কী ভাবে নাম করবে? তৃণ হতে নীচ হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান কামনা না করে, অন্য সকলকে সম্মান দেখিয়ে।

আর বুঝি ঠেকানো গেল না বক্তাকে। বিগলিত হল প্রকাশানন্দ। বিনয় করে বললে, 'তুমি বেদময় মূর্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। আগে যে নিন্দা করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাই।'

'তা হলে এবার কৃষ্ণধ্বনি তোলো।'

প্রচণ্ড ভিড় জমে গেল। সুরু হল কৃষ্ণকীর্তন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সকলে হাসতে কাঁদতে নাচতে গাইতে লাগল।

মহারাষ্ট্রী বিপ্রের ঘরে সন্ন্যাসীদের মধ্যে বসিয়ে প্রভুকে ভিক্ষা করাল প্রকাশানন্দ। সমস্ত কাশী প্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। যেখানে যান সেখানেই দারুণ জনতা। যেখানেই যান, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেই হোক বা গঙ্গায়ই হোক, হরিধ্বনি করেন প্রভু, আর জনতা প্রতিধ্বনি তোলে।

'বাহু তুলি বোলে প্রভু—বোল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত ভরি॥'

একদিন পঞ্চ-গঙ্গাতে স্নান করে প্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে গেলেন। মাধবের সৌন্দর্য দেখে ব্রজভাবাবিষ্ট হয়ে অঙ্গনে নাচতে লাগলেন প্রভু। চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপন আর সনাতনও কীর্তনে যোগ দিল। এদিক-ওদিক হতে কত যে লোক ছুটে এল তার লেখা-জোখা নেই।

প্রেমোন্মত্ত হয়ে প্রভু গান ধরলেন: 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'

হরি-হরি। স্বর্গ-মর্ত ভরে ধ্বনি উঠল। প্রতিধ্বনি হল হাজার লোকের কণ্ঠে।

প্রকাশানন্দের আশ্রম মন্দির থেকে বেশি দূরে নয়। সে নামধ্বনি শুনে প্রকাশানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। শিষ্যদের বললে, 'চলো দেখে আসি।'

আর বুঝি এ 'ভাবকের ভাবকালি' নয়, এ একেবারে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ। এ যে প্রাণ ধরে টান মারা। 'চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়।'

কিন্তু এ কী দেখছে! প্রভু নৃত্য করছেন। শুধু কীর্তন নয়, নর্তন। অনন্ত সৌন্দর্যের নিকেতন দেহভঙ্গিতে এ কী অসমোর্ধ্ব মাধুরী!

আত্মহারার মত প্রকাশানন্দ বলে উঠল: হরি-হরি। তার শিষ্যদলও উন্মথিত সমুদ্রের মত গর্জন করে উঠল: হরি-হরি।

প্রকাশানন্দ শুধু ধ্বনিত হল না, সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিক ভাব পুলককদম্ব ধারণ করল। শুধু তাই নয়, কাঁদতে লাগল দীনহীনের মত।

কাশীবাসীদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যে সমস্ত ব্যবহারকে চিরকাল সে বিদ্রূপ করেছে শুধু নয়, ধিক্কার দিয়ে বেড়িয়েছে, সে নিজেই কিনা তা প্রকাশ করছে প্রত্যক্ষ। এত বড় পণ্ডিত, গর্বে যে পর্বতায়মান, তার এ কী দৈন্যচাপল্য! কোথায় তার গাম্ভীর্য, কোথায় তার বিরক্তি! অলক্ষিতে সে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে।

সত্যিই বুঝি সে আজ প্রকাশানন্দ। শুষ্ক জ্ঞানের কঠিন আবরণ উন্মোচন করে সে আজ ভক্তিতে প্রকাশিত, আনন্দে প্রকাশিত। সে আজ সার্থকনামা। সে আজ প্রকাশানন্দ।

লোকসংঘট্ট দেখে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফিরে এল। সন্ন্যাসীদের দেখে ভাব সংবরণ করলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ রাধাভাব, তাঁর হৃদয়ের গোপন নিধি—এ সকলের সামনে অনাবৃত করবার নয়।

প্রকাশানন্দকে প্রণাম করলেন প্রভু। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণ-যুগল ধারণ করল।

প্রভু বললেন, 'আপনি জগদ্‌গুরু, পূজ্যশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মসম, মায়াতীত। আর আমি অজ্ঞ, হীন, মায়াবদ্ধ। আপনার শিষ্যের শিষ্য। আমি আপনার প্রণামের যোগ্য নই। আপনি শ্রেষ্ঠ হয়ে আমার মত হীনজনকে যদি প্রণাম করেন, তা হলে আমার সর্বনাশ হবে। আপনি ব্রহ্মতুল্য বলে সমস্ত কিছু ব্রহ্মময় দেখেছেন, তাই বলে লোকশিক্ষার ছলেও সকলকে বন্দনা করা বিধেয় নয়।'

'তোমাকে আমি আগে অনেক নিন্দা করেছি,' বললে প্রকাশানন্দ, 'তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যেই আমি তোমার চরণ স্পর্শ করলাম। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। আর ভগবৎ-চরণস্পর্শেই সমস্ত অপরাধের অবসান।'

যারা জীবন্মুক্ত, তারাও যদি অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের কাছে অপরাধী হয়, পুনরায় সংসারবাসবাসনায় পুড়ে মরে।

কিন্তু ভগবানের পাদস্পর্শে সে সমস্ত অমঙ্গল ক্ষয় হয় তার প্রমাণ সর্পের বিত্থাধর দেহ ধারণ।

দেবযাত্রা উপস্থিত হলে, নন্দ-সুনন্দ প্রভৃতি গোপেরা সরস্বতীতে স্নান করতে গেল। স্নানান্তে পশুপতি ও অম্বিকার পূজা করল। 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাসর্প আমাকে গ্রাস করছে। আমার জীবন বিপন্ন। বৎস, আমাকে উদ্ধার করো।' নন্দ আর্তনাদ করে উঠল। অন্যান্য গোপ-গোপাল বিশ্রাম ছেড়ে উঠে এল, বিভ্রান্ত হয়ে এক মশাল জ্বালাল, আর জ্বলন্ত মশাল দিয়ে দগ্ধ করতে লাগল সর্পকে। প্রজ্বলিত অঙ্গারে দহ্যমান হয়েও ভুজঙ্গ নন্দকে ত্যাগ করল না। অনন্তর ভক্তিপতি ভগবান এসে সর্পকে পদাঘাত করলেন। নন্দ বিমুক্ত হল, আর ভগবানের চরণস্পর্শে অশুভ দূরীভূত হওয়াতে সর্প স্বদেহ পরিত্যাগ করে বিদ্যাধরবন্দিত পরমরমণীয় দীপ্ত দেহ ধারণ করল। কৃষ্ণের পদতলে লুণ্ঠিত হতে লাগল।

হৃষীকেশ জিগগেস করলেন, 'দীপ্ততেজ পুরুষ, তুমি কে? কি জন্যে অবশ হয়ে এমন নিন্দিত গতি প্রাপ্ত হয়েছিলে?'

সর্প বললে, 'আমি এক গন্ধর্ব। কমলার কৃপা আর আমার রূপ এই দুই বৈভবের জন্যে আমার নাম ছিল সুদর্শন। এক দিন বিমানে চড়ে দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করতে-করতে অঙ্গিরাবংশসম্ভূত বিরূপ মুনিদের উপহাস করেছিলাম। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিল, আমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হলাম। এখন দেখছি তাদের সেই শাপ শাপ নয়, কৃপা। দয়ালু মুনিরা কৃপা করেছিল বলেই আজ আমি আপনার ত্রিলোকবন্দিত চরণ স্পর্শ করতে পারলাম। আপনার চরণস্পৃষ্ট হয়ে আমার সকল অশুভ দূর হল। হে দুঃখ-নাশন! ভববন্ধভঞ্জন! আমি প্রপন্ন। আপনাকে দেখামাত্র আমি জন্মদণ্ড থেকে মুক্তি লাভ করলাম। যার নাম কীর্তন করে মানুষ

শ্রোতাকে ও নিজেকে পবিত্র করে তার পদস্পর্শে যে সে পবিত্র হবে তাতে আর বৈচিত্র্য কী।'

প্রভু বললেন, 'আমি ক্ষুদ্র জীব। জীবকে বিষ্ণু মনে করলে অপরাধ হয়। ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্তা আর রুদ্র যে সংহারকর্তা তাদেরকেই নারায়ণের সমান মনে করলে অপরাধ হয়, আর জীব তো সামান্য কথা।'

'তুমি যে সাক্ষাৎ ভগবান তাতে সন্দেহ নেই', বললে প্রকাশানন্দ, 'তবু যদি জীবশিক্ষার জন্যে তুমি নিজেকে কৃষ্ণদাস বা ভগবানের ভক্ত বলে মনে করো, তা হলেও তুমি আমাদের চেয়ে বড়, আমাদের পূজনীয়। তোমাকে নিন্দা করেছি, ভক্তনিন্দাতেও জীবের সর্বনাশ ঘটে। সুতরাং সে অপরাধ সে সর্বনাশ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যেও তোমার চরণস্পর্শের প্রয়োজন।'

কী বলছে ভাগবত?

বলছে কোটি কর্মনিষ্ঠের মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে হয়তো একজন জীবন্মুক্ত হয়। আবার কোটি জীবন্মুক্তের মধ্যে এক কৃষ্ণভক্তই দুর্লভ। অর্থাৎ সিদ্ধ মুক্ত সকলের চেয়ে ভক্তই শ্রেষ্ঠ।

আর যারা মহৎ তাদের অবমাননায় মানুষের আয়ু নষ্ট শ্রী যশ ধর্ম স্বর্গ এমন কি নিজের বাঞ্ছিত বিষয় ও সর্ববিধ কল্যাণ নষ্ট।

'এখন তোমার চরণস্পর্শে আমার নিন্দাপরাধ খণ্ডন হয়েছে বলে চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হবে।' বললে প্রকাশানন্দ, 'তাই তো তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছি।'

'এবে তোমার পদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তার নিমিত্তে করি তোমার চরণে প্রণতি॥'

মহৎ কৃপাছাড়া জীবের সংসারনিবৃত্তি নেই। সজ্জনসঙ্গতিই ভবার্ণবতরণের তরণী।



৬২

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর ভাগবত নিয়ে আরো আলোচনা হল। শ্রুতিবাক্য আর ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে ভাগবতের ঐক্য প্রমাণ করলেন প্রভু। ভাগবত আর বেদান্ত দুইই ব্যাসের রচনা—ভাগবতই বেদান্তের ভাষ্য। সর্ববেদান্তসারই ভাগবত। প্রকাশানন্দের অন্তরে জাগিয়ে দিলেন ভক্তি, শাশ্বত আনন্দ। প্রকাশিত আনন্দের প্রতিমূর্তি বলেই প্রকাশানন্দ।

'এবে শোন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।' বললেন প্রভু, 'ভাগবতের প্রতি শ্লোকেই এই ভক্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে, শুধু ভাগবতই বিচার করো, তা থেকেই বেদোপনিষদের সার রহস্য বুঝতে পারবে।'

'নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সঙ্কীর্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥'

কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা ভাগবতচর্চায় মন দিল। আরম্ভ করল নামকীর্তন। বারাণসী দ্বিতীয় নবদ্বীপ হয়ে গেল।

প্রভু পরিহাস করে বললেন, 'কাশীতে আমি ভাবকালি বেচতে এসেছিলাম, শুনেছিলাম গ্রাহক নেই, বস্তু বিকোবে না এখানে। কিন্তু তাই বলে কি মাল আবার দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়া চলে?' মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আর তপন মিশ্রকে লক্ষ্য করলেন: 'তোমাদের দুঃখ হল যে বোঝা নিয়ে ফিরে যাব, তাই তোমাদের ইচ্ছায় উজাড় করে সব বিনামূল্যে বিলিয়ে দিলাম।'

বারাণসীতে প্রচণ্ড কোলাহল উঠল, স্বয়ং ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। পুব দক্ষিণ পশ্চিম নিস্তার হয়েছে, এক বাকি ছিল কাশী, তাও এবার ত্রাণ পেল। দিগদিগন্তর থেকে লক্ষ-লক্ষ লোক

দেখতে এল প্রভুকে, কিন্তু কোথায়, কোথায় তিনি আত্মগোপন করে আছেন? চলো সবাই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই কাতার দিয়ে। প্রভু যখন স্নানে যাবেন, যাবেন বিশ্বেশ্বরদর্শনে, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখব।

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে প্রভু আছেন, আর চুপি চুপি তপনের বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে নিচ্ছেন। কিন্তু স্নানের সময় লোকসমাবেশ এড়াবেন কী করে? আর যদি একবার জনতার মাঝখানে গিয়ে পড়ছেন, অমনি ধ্বনি তুলছেন, বলো হরি, বলো কৃষ্ণ।

'প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর।
তাহাই সকল লোক আসি হয় ভিড়॥'
'বাহু তুলি প্রভু কহে, 'বোল কৃষ্ণ হরি'।
দণ্ডবৎ পড়ে লোক হরিধ্বনি করি॥'

পাঁচ দিন থাকলেন কাশীতে। সনাতন সনাতন প্রশ্নের উত্তর পেল, আর প্রকাশানন্দ পেল প্রবোধানন্দ। প্রভু বললেন, এবার ফিরব নীলাচল।

তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর রঘুনাথ সবাই সুর তুলল, আমরাও যাব।

প্রভু বললেন, 'না, আমি এখন একা যাব। যাব সেই ঝাড়িখণ্ডের পথে। তোমরা যদি কেউ আসতে চাও পরে এস। আর তুমি,' সনাতনকে লক্ষ্য করলেন: 'তুমি বৃন্দাবনে যাও। তোমার দু ভাই সেখানে আছেন, তুমিও সেখানে গিয়ে সাধন ভজন করো। আর সেখানে যদি আমার দীন দরিদ্র কাঙাল ভক্তরা আসে তাদের প্রতিপালন কোরো। দিয়ো তাদের ভক্তি-উপদেশ।'

'কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন॥'

যে প্রভু পাত্রাপাত্র বিচার, আত্মপরজ্ঞান, দেয়াদেয় বিচার ও

কালাকালের অপেক্ষা না করে শ্রবণ-ঈক্ষণ-ধ্যান-প্রণামে দুর্লভ ভক্তিরস অকাতরে দান করেন সেই ভগবান গৌরই আমার একমাত্র গতি।

'আপনি করি আস্বাদন শিখাইল ভক্তগণ
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার ঐছে দাতা নাহি আর
গুণ কেহো নাহি বর্ণিবারে॥'

যে ভক্তি লক্ষ্মীসমৃদ্ধ তার আর কামনার বস্তু কী থাকতে পারে? আর যে ভক্তি ধনবঞ্চিত তারই বা অন্য প্রার্থনীয় কী আছে?

'প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি।' প্রিয়তম জনই বরণের উপযুক্ত। ভগবানে প্রীতিপাত্র কে? যে ভক্তিতে অবস্থিত সে। আর যাকে ভগবান নিজে থেকে বরণ করেন সেই তো লাভ করে ভগবানকে।

ধ্রুবানুস্মৃতিও ভক্তি। 'স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।' ধ্রুবানুস্মৃতি বা তৈলধারার মত প্রগাঢ় ধ্যান হলে সকল গ্রন্থি বা চিত্তের রাগদ্বেষাদি কষায় নাশ হয়। ভক্তির আরেক নাম প্রজ্ঞা। যে জ্ঞানে ভগবানের স্বরূপশক্তির লীলাবিকাশবৈচিত্রীর অনুভব জাগে তাই ভক্তি। প্রণিধানের অর্থও ভক্তি। 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।' ঈশ্বরকে জানবার ও পাবার সুখসাধ্য উপায়ই ভক্তি। দুঃখলেশস্পর্শশূন্য অনুপম আনন্দ, যা স্বতঃ পুরুষার্থ, পরম পুরুষার্থ, তাই ভক্তি। ভক্তই হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎসার।

কাশীতে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন প্রভু। ঝাড়িখণ্ডের

পথে চললেন নীলাচলের পথে। সঙ্গী শুধু বলভদ্র আর সেবক-ব্রাহ্মণ।

সনাতন চলল বৃন্দাবন।

রূপ মথুরায় এসে সুবুদ্ধি রায়ের দেখা পেল। সুবুদ্ধি রায়ই রূপ-অনুপমের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল আর দেখাল ব্রজমণ্ডল।

কে এ সুবুদ্ধি রায়?

গৌড়ে 'অধিকারী' ছিল, তার অধীনে চাকরি করত হুসেন শা। হুসেন শা-কে দিঘি খনন করবার ভার দিল সুবুদ্ধি, কাজে ত্রুটি পেয়ে সুবুদ্ধি হুসেন শা-কে চাবুক মারল। পিঠের আঘাত এত গভীর হল যে ঘা শুকোলেও দাগ মিলিয়ে গেল না। তা হলে কী হয়, হুসেন শা যখন কালক্রমে নবাব হয়ে বসল তখন প্রথম-প্রথম সুবুদ্ধিকে সে অনেক সম্মান দেখাল, করল অনেক পরিতোষ। কিন্তু একদিন, হুসেন শার স্ত্রী দেখতে পেল সেই খোলা পিঠের কালো দাগ। স্বামীকে জিগগেস করল, এ দাগ কিসের?

'সুবুদ্ধি রায় একবার মেরেছিল।' আর ঢেকে রাখতে পারল না হুসেন শা।

'কী মেরেছিল?'

'চাবুক।'

সব শুনে স্ত্রী মরীয়া হয়ে উঠল। 'তুমিও সুবুদ্ধি রায়কে মারো।'

'প্রহার করব?'

'না, বধ করবে। একেবারে মেরে ফেলবে।'

হুসেন শা বললে, 'তা পারব না। সুবুদ্ধি রায় আমার পূর্ব-মনিব, আমার পালনকর্তা, পিতৃতুল্য। তাকে প্রাণে মারা অধর্ম হবে।'

'তা হলে জাতে মারো।'

'জাতে মারলেও সে প্রাণে বাঁচবে না।'

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নিবৃত্ত হল না। স্বামীকে দিবারাত্র উত্তেজিত, উত্যক্ত করতে লাগল।

সুবুদ্ধি রায়কে ডেকে এনে তার মুখে করোয়ার জল ঢেলে দিল হুসেন শা।

সুবুদ্ধি রায়ের জাত গেল। কাশীতে এসে পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইল। কেউ বললে, তপ্ত ঘি খেয়ে প্রাণত্যাগ করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেউ বললে, নিজের ইচ্ছায় তো আর জল খায় নি, এ অবস্থায় অত বড় শাস্তি অবিধেয়। কী করে, কোথায় যায়, সুবুদ্ধি অস্থিরচিত্তে দিন কাটাতে লাগল।

এমন সময় বৃন্দাবনের পথে কাশীতে মহাপ্রভু এলেন।

সুবুদ্ধি তাঁর কাছে গিয়ে সুবুদ্ধি চাইল।

প্রভু বললেন, 'নিরন্তর হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তুমি বৃন্দাবনে যাও। অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করো। এক নামাভাসেই তোমার পাপদোষ যাবে, আর নাম হতেই পাবে কৃষ্ণচরণ।'

অনন্যগতি, বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যশূন্য, ব্রহ্মচর্যবর্জিত, সর্বধর্মত্যাগী অমানুষও যদি বিষ্ণুনাম জপ করে, তা হলে সেও অনায়াসে ধর্মনিষ্ঠদেরই দুর্লভগতি লাভ করে। হরিনাম পরম পাবন, অশুচিকে শুচি করে, অতীর্থকে তীর্থ করে। হেলায়-অশ্রদ্ধায় এমন কি বাক্য-প্রপূরণে নামোচ্চারণ করলেও ফল হয়। 'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥'

শুধু নামে নয়, নামাভাসেও হবে। রত্ন যেখানেই রাখো, সিন্দুকেই হোক বা ছাইয়ের গাদায়ই হোক, তার সমান মূল্য। নাম তো বটেই, নামে-বদ্ধ নামের অক্ষরগুলোও অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাই নামের মত নামাভাসেও প্রচণ্ড শক্তি। শূকরের দাঁতে আহত হয়ে যবন 'হারাম' 'হারাম' বলে ডেকে মুক্তি পেয়েছিল। বলছে শূকর, ডাকা হচ্ছে রামকে। একেই বলে নামাভাসে মুক্তি। নামাভাসেরই যদি এত শক্তি তা হলে স্পষ্ট নামোচ্চরণ যে প্রত্যক্ষ ফল দেবে তাতে আর কার

সন্দেহ? নামের উচ্চারণ যদি অশুদ্ধ হয়, এমন কি অসম্পূর্ণও হয়, কিছু এসে যাবে না, ঐ ভ্রমে ও ন্যূনতায়ও নামপ্রভাব অম্লান থাকবে। সমস্ত প্রারব্ধ পাপের নাশও এই নামেই। আর নাম ও নামী অভিন্ন বলে নামীর যেমন মহিমা নামেরও তেমনি। আর নামের যদি কৃপা হয় কিছুই আর অপূরণ থাকে না, সমস্তই অফুরন।'

সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করল। প্রয়াগ অযোধ্যা হয়ে পৌঁছুল নৈমিষারণ্যে। সেখান থেকে মথুরায়। মথুরায় এসে শুনল প্রভু ব্রজভূমি দর্শন করে ফিবে গিয়েছেন। আরেকবার দেখা হবে ভেবেছিল, হল না।

কী করে জীবিকানির্বাহ হবে সুবুদ্ধির? জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে বাজারে বিক্রি করতে স্নুরু করল। কাঠ আনে কী করে? দড়ি দিয়ে বেঁধে, কাঁধে বয়ে। বেচে পায় কত? এক বোঝা মাত্র পাঁচ পয়সা, খদ্দের সদয় হলে, ছয়। তার থেকে এক পয়সা দিয়ে চানা কিনে নিজে খায় আর বাকি পয়সা বেনের দোকানে জমিয়ে রাখে। সে পয়সায় গরিব দুঃখী সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করে। আর যদি সে বাঙালি বৈষ্ণব হয় তা হলে তাব জন্যে গায়ে মাখবার তেল কেনে, শুখা রুটির বদলে দই-ভাতের জোগাড় দেখে। নিজের জন্যে কিন্তু শুকনো চানার বেশি নয়, না, কখনো নয়।

যে সুবুদ্ধি একদিন 'অধিকারী' ছিল, কত তার দাসদাসী, কত তার ভোগের উপকরণ, সে আজ কিনা এক পয়সার চানা খেয়ে দিন কাটায়। প্রভুর কৃপায় সে বৈবাগ্যরঙিন হয়েছে। পরাপেক্ষা নেই, নিজেতেই নিজের নির্ভর, নেই বা সংসার ত্যাগ করে পালিয়ে চলে যাওয়া, নেই বা বিন্দুমাত্র অপ্রসাদ। যেটুকু সঞ্চয় সেটুকুও নিজের ভোগের জন্যে নয়, কাঙাল বৈষ্ণবের সেবার জন্যে।

রূপ ও অনুপম মথুরায় এলে সুবুদ্ধি রায় দেখা করতে গেল। দুই ভাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল দ্বাদশবন। কিন্তু মাসখানেকের বেশি তারা থাকতে পারল না, সনাতন কাশীতে আছে খবর পেয়ে চলল

কাশী। গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়ে প্রভু গিয়েছেন শুনে তারা সেই পথ ধরল। আর সনাতন চলল সটান রাজপথ দিয়ে। তাই কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হল না। প্রয়াগে পৌঁছে রূপ ও অনুপম খবর পেল সনাতন মথুরায় গেছে আর সনাতন মথুরায় পৌঁছে জানল যদিও রূপ-অনুপম মথুরায়ই ফিরেছিল, তারা এখন প্রয়াগে।

সনাতনকে পেয়ে সুবুদ্ধির আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু কঠোর তপস্বী মহাবিরক্ত সঁনাতনের দেহসুখে স্পৃহা নেই, তাই সুবুদ্ধির স্নেহ-ব্যবহার তার কাছে রুচিকর নয়। সে তীব্র বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, কী হবে তার দেহস্বাচ্ছন্দ্যে? বৈরাগ্যই তার দেহের বিশ্রাম, প্রাণের শান্তি।

ভগবান বললেন, যে পর্যন্ত বৈরাগ্য সঞ্চয় না হয়, আমার লীলা-কথা শুনতে শুনতে যে পর্যন্ত শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হয় সেই পর্যন্তই কর্মানুষ্ঠান করবে। নরকবাসী ও স্বর্গবাসী দুইই মনুষ্যদেহ আকাঙ্ক্ষা করে কারণ মনুষ্যদেহেই জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভবপর। স্বর্গবাসী বা নরকবাসী কারু দেহই মোক্ষলাভের অনুকূল নয়। কামনা-বাসনা সত্ত্বেও ভক্তিযোগের দ্বারা যে নিরন্তর কৃষ্ণভজনা করে তার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে তার হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা-বাসনা নষ্ট হয়ে যায়। তার পর সর্বাত্মভূত আমি যদি সাক্ষাৎকৃত হই, আমাকে যদি ভক্ত দর্শনও করতে পারে, তার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তার অহং-মম অভিমান থাকে না, তার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় তার কর্ম-সমূহও বিনিঃশেষে ক্ষয় পায়।

রাত্রিদিন কুঞ্জে-কুঞ্জেই ঘোরে সনাতন, মথুরামাহাত্ম্য সংগ্রহ করে। আর উদ্ধার করে লুপ্ত তীর্থ।

এদিকে প্রভু ফিরলেন নীলাচলে, নির্জন বনপথে। সঙ্গে সেই বলভদ্র ভট্টাচার্য আর সেবক-ব্রাহ্মণ। আগের মতই সেই কৃষ্ণনাম নেওয়ালেন পশুদের। আঠারোনালাতে পৌঁছে খবর পাঠালেন ভক্তদের। মৃতদেহে প্রাণ আনলেন। ভক্তের দল এসে মিলল

নরেন্দ্র সরোবরে। এল পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, দুজনেই মাধবেন্দ্রের শিষ্য, প্রভুর গুরুস্থানীয়, প্রভু তাই তাদের প্রণাম করলেন। এল স্বরূপ দামোদর, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর আর গোবিন্দ। এল প্রদ্যুম্ন মিশ্র, কাশী মিশ্র, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত। এল হরিদাস। সকলে এসে প্রভুর চরণে পড়ল, প্রভু সকলকে আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হলেন।

ভক্তসন্নিবেশে সুরু হল নর্তনকীর্তন। গ্রামে কোলাহল উঠল— মহাপ্রভু এসেছেন। ছুটে এল রামানন্দ, বাণীনাথ, সার্বভৌম। চলো যাই জগন্নাথদর্শনে।

মন্দিরে এলেন প্রভু। তুলসী পড়িছা পদমূলে লুটিয়ে পড়ল। জগন্নাথের মালাপ্রসাদ এনে দিল।

'জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে। আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে।' আর সংসারকে জানালেন 'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত'।

ভাগবতই কৃষ্ণের প্রতিনিধি। কৃষ্ণ অপ্রকট হবার পর সমস্ত ধর্ম ভাগবতকেই আশ্রয় করেছে। যেমন কৃষ্ণ বিভু ও সর্বাশ্রয়, তেমনি। কৃষ্ণ যেমন নিত্য সত্য চিন্ময় ও আনন্দময়, ভাগবতও তেমনি। 'প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়।' কৃষ্ণ যেমন সমস্ত অর্থের আধারও, ভাগবতও তেমনি। কৃষ্ণ আর ভাগবতই দুইই সমান বৃহদ্বস্তু, সমান সর্বব্যাপক।

শৌনক প্রশ্ন করল সূতকে : 'হে সূত, যোগেশ্বর ধর্মবর্ম কৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে প্রস্থান করলে ধর্ম কার শরণাগত হল বলো।'

উত্তরে সূত বললে, 'কৃষ্ণ স্বধামে প্রস্থান করলে কলিকালে ধর্মজ্ঞানহীন নষ্টদৃষ্টি নির্বিবেক জীবের জন্যে এই ভাগবতই পুরাতন সূর্যের নবীন আবির্ভাব।'

এই ভাগবতকথাই প্রভু শোনালেন সংসারকে। কখনো নিজমুখে, যেমন সনাতনশিক্ষায়, কখনো বা ভক্তমুখে, যেমন রামানন্দ-

প্রসঙ্গে। 'চৈতন্যসমান আর কৃপালু বদান্য। ভক্তবৎসল নাহি আর ত্রিজগতে অন্য॥'

গৌরলীলায় ডুব দিতে পারলেই কৃষ্ণলীলায় উত্তরণ। 'গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।'

শৌনক প্রশ্ন করল সূতকে: 'সমস্ত শাস্ত্র অনুশীলন করে যা মানুষের নিশ্চয় মঙ্গলসাধন বলে স্থির করেছ তা আমাদের কাছে প্রকাশ করো। এই কলিযুগে সকলেই অল্পায়ু, অলস, হীনবুদ্ধি, রোগক্লিষ্ট, বিঘ্নব্যাকুল। বহুশাস্ত্র শ্রবণ করে তারা যে নিজ নিজ মঙ্গলসাধন করবে তার সম্ভাবনা নেই। আর শুধু বহুশাস্ত্র শ্রবণ করলেই কি আর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? তা ছাড়া শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কর্মও বহুতর, সে সব কর্ম নির্ণয় ও সম্পাদন করা সহজ নয়। তুমি সকল শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। তা হলেই সকলের চিত্ত প্রসন্ন হবে। ভক্তকুলের পালনকর্তা ভগবান হরি মানুষের কোন মঙ্গলসাধন করবার জন্যে দেবকীগর্ভে জন্ম নিলেন? বিঘোর সংসারারণ্যে পথভ্রান্ত মানুষ যাঁর নামোচ্চারণমাত্র মুক্তি লাভ করে, স্বয়ং ভয় যাঁর কাছে ভীত, ত্রিলোকপাবনী সুরধুনী যাঁর চরণ থেকে নিঃসৃত হয়ে সর্বজগৎকে পবিত্র করছে, তাঁর কলিকলুষনাশী যশঃকীর্তন কে না শুনবে? ভগবানের পুণ্যপ্রদ চরিত্রশ্রবণই তেজোবীর্যাপহারী এই দুস্তর কলিরূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হবার উপায়। কিন্তু কৃষ্ণ যখন স্বরূপে বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছেন তখন ধর্ম কার শরণাপন্ন হলেন?'

'শরণাপন্ন হলেন ভাগবতে, যা নিখিল বেদার্থের সারভাগস্বরূপ, যা ঘোর অন্ধকারে অধ্যাত্মপ্রকাশক দীপবর্তি।' বললেন সূত, 'যার আরেক নাম ভক্তিদীপিকা। স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ধর্মের চেয়ে স্বার্থশূন্য ভগবদভক্তি পরতরা। নারায়ণে ভক্তি হলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় আর সে জ্ঞানে শুষ্ক ও নিরর্থক তর্ক প্রবেশ করতে পারে না। যদি হরিকথায় ভক্তিই না জন্মায় তবে ধর্ম

কী। তবে ধর্ম বৃথা শ্রমমাত্র। যাতে হরির তুষ্টি তাই ধর্ম। সুতরাং শ্রবণে কীর্তনে ধ্যানে আরাধনে হরির সেবা করো। সেই সেবা থেকেই ধর্মে শ্রদ্ধা, ধর্মে অভিরুচি জন্মাবে। সেই ভাগবতসেবায় নষ্ট হবে সমস্ত অমঙ্গল। আর যার ভাগবতী কথায় রুচি হয়েছে সেই স্থিত হবে নিশ্চিত ভক্তিতে।'

ব্যাসের কাছেও নারদের সেই আবেদন : ভগবানের যশোবর্ণন ছাড়া কেবল ধর্মানুষ্ঠানে পরিতোষ নেই। শুধু মনোরম পদবিন্যাসে কী হবে যদি অন্তরে ভক্তি না থাকে, রতিরস না থাকে, ভক্তিহীন বাক্য কাকতীর্থের মত। রাজহংসেরা ভক্তির মানসসরোবরেই বিহার করে। ব্যাস, তুমি হরিভক্তি বর্ণনা করো। হরিভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত না হলে অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও নষ্ট হয়ে যায়। এমন গ্রন্থ লেখ যার প্রতি শ্লোকেই অনন্তকীর্তি ভগবানের নামকীর্তন থাকে, এমন গ্রন্থই মানুষের পাপনাশে সমর্থ, এমন গ্রন্থই মানুষের আদরণীয়। ব্যাস, তুমি যথার্থদর্শী, সত্যরত, ব্রতসম্পন্ন, এখন লোকবন্ধনমোচন বাসুদেবের চরিত্র যোগবলে স্মরণ করে বর্ণন করো। অন্যবিষয় বর্ণন করতে গেলে বায়ুবলে ঘূর্ণ্যমান নৌকোর মত তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধি বিব্রত হবে ; কোথাও স্থির থাকতে পারবে না। যে ভক্তিতে অধিষ্ঠিত সংসারে সেই একমাত্র স্থির। হরিকে ভক্তি না করে কেবল স্বধর্ম প্রতিপালন দ্বারা কে উদ্দেশ্যলাভে সক্ষম হয়েছে? সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে কর্মার্পণই তাপত্রয়ের মহৌষধ। তুমি সেই বাসুদেবের যশ কীর্তন করো। এই কীর্তনই দুঃসহদুঃখপীড়িত জীবের নিস্তারের একমাত্র পথ।

সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই আজ গৌরেন্দুরূপে শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন। সামান্য গোপরমণীর সমান তাকে জ্ঞান করছে, কৃষ্ণের উপর এই অভিমান করে রাধিকা রাসস্থলী ত্যাগ করল। কৃষ্ণ দেখল রাসমঞ্চে আর উল্লাস নেই, কী কারণ—খোঁজ নিয়ে দেখল, রাধিকা অনুপস্থিত। যার প্রেমের বলে উল্লাস, উল্লাসের

আতিশয্য, কৃষ্ণের মনে হল সেই প্রেম আস্বাদ করতে হবে। কেমন রাধার প্রণয়মহিমা, কেমনই বা আমারই মাধুর্য যা রাধিকা আস্বাদ করে, আর সেই আস্বাদানুভূতিতে তার কেমন সুখ, কী পরিমাণ সুখ, তা একবার আমাকে জানতে হবে। তারই জন্যে রাধিকার ভাব ও কান্তি নিয়ে এলেন মহাপ্রভু। ভক্তভাব অঙ্গীকার করে ব্রজ-প্রেমনির্যাস আস্বাদন করে জগৎকে তা বিতরণ করলেন। নিজনাম-বিনোদিয়া হয়ে নিজেও আস্বাদ করলেন, অন্যকেও আস্বাদ করালেন। 'আপনি আচরি ধর্ম শিখামু সবায়। আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥'

একমাত্র নাম হতেই সর্বসিদ্ধি। নামেই মঙ্গলবিস্তার। দুঃসঙ্গ-বর্জন। কৈতবপরিহার। একমাত্র নাম হতেই ভগবানে শ্রদ্ধা রতি ভক্তি প্রেম। কৃষ্ণনামই জীবনভূষণ।

'অসাধু সঙ্গে তাই নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ।
ইহা তো জানিবে ভাই কৃষ্ণ ভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গে কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥'

নামী বাচ্যস্বরূপ ভগবানই বাচকস্বরূপ নামরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। নামাশ্রয় ছাড়া নামীস্বরূপকে পাবার উপায়ান্তর নেই। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি॥'

গৌরহরি গোপীভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ। রাধারসবিলাসী, রাধিকারস-বিনোদী, রাধাভাবভাবিতানন্দ। রসরাজরূপে প্রেমের বিষয়, মহাভাববতীরূপে প্রেমের আশ্রয়। স্বমাধুর্যের জন্যেই অবতীর্ণ।

সেই আস্বাদনের উপায় নামসঙ্কীর্তনপ্রধান ভক্তিযোগ। 'মথিয়া সকল তন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র, করে ধরি জীবেরে শিখায়।'

'তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন॥
যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য নাই।
সবে মিলি কৃষ্ণ বলিবার এই ঠাঁই॥
পড়িলাম শুনিলাম এত দিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি॥'

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মূল গ্রন্থ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত তার টীকা

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-প্রণীত অমিয়-নিমাই চরিত